শান্তিনিকেতনের এক যুগ • হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতনের এক যুগ

শান্তিনিকেতনের এক যুগ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শান্তিনিকেতনকে যাঁরা ভালোবাসেন

তাঁদের হাতে

নিবেদন

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এবং বিশ্বভারতীর পরলোকগত কোনো কোনো অধ্যাপক সম্পর্কে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সামান্য দু-চার কথা এক সময়ে আমি লিখেছিলাম— যাঁদের দেখেছি জেনেছি তাঁদের স্মৃতি-চারণ আর যাঁদেরকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি তাঁদের শ্রুতি-চারণ। খুবই সংক্ষিপ্ত, কালি-কলমে আঁকা প্রত্যেকের একটি স্কেচ মাত্র। তথাপি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র কর্মী অধ্যাপক -মহলে সে-সব লেখার কিঞ্চিৎ সমাদর হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। এক কালে যাঁরা শান্তিনিকেতনের কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন, যাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে তাঁরা একে একে প্রায় সকলেই গিয়েছেন চলে। তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই জানবার আগ্রহ ছিল অনেকের মনে কিন্তু নানা জনের অনুরোধ সত্ত্বেও সে কাজে আর আমার হাত দেওয়া হয়ে ওঠে নি। সেটা নিতান্তই আলস্যবশত, নইলে আমার নিজের আগ্রহও কিছু কম ছিল না। বছর-দুই আগে বন্ধুবর পুলিনবিহারী সেন প্রস্তাব করেন যে ঐ লেখাগুলোর সঙ্গে আরো কয়েকজনের কথা যোগ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেলে শান্তিনিকেতনের এক যুগের একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবেও প্রথমটায় খুব একটা গা করি নি। বয়স হয়েছে, কোনো প্রকার শ্রম স্বীকারে মন সহজে রাজী হয় না। কিছুদিন পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ রণজিৎ রায়ও ঐ একই অনুরোধ নিয়ে হাজির হলেন। দুই বন্ধুর যুগ্ম অনুরোধ এড়ানো সহজ ছিল না। অগত্যা রাজী হতে হল। রাজী হওয়া মাত্র পুলিনবাবুর তাগিদের মাত্রাটা এত বেড়ে গেল যে সত্যি বলতে কি একটু উত্ত্যক্তই বোধ করেছিলাম। অবশ্য পুলিনবাবু খুব ভালো করেই জানতেন যে উত্ত্যক্ত না করলে আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না। যা হোক, আজ কাজটা যখন কোনোমতে শেষ করা গিয়েছে তখন কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করব যে বন্ধুবর পুলিন সেন এবং প্রীতিভাজন রণজিৎ রায় সারাক্ষণ লেগে না থাকলে এ বই কখনো লেখা হয়ে উঠত না। মৌখিক উৎসাহ ছাড়াও দুজনেই নানাভাবে আমাকে

সাহায্য করেছেন। তাও কাজটি শেষ করতে বছর খানেক লেগে গেল। কিন্তু শেষ কি হয়েছে? বেশ কিছু অধ্যাপক কর্মীর কথা বলা হয় নি; তাঁরাও দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেবা করে গিয়েছেন। সকলের কথা আমি সবিস্তারে জানি না; তা ছাড়া আমার আলোচনার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর সহযোগী হিসাবে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন আমি শুধু তাঁদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। আর-একটি কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন, আমাদের ভাগ্যগুণে এখনো যাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের কথাও আমি বলি নি। যাঁরা চিরতরে আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন আমি শুধু তাঁদেরই স্মৃতি-চারণ করেছি।

বলে নেওয়া ভালো যে আমি এঁদের কারো জীবন-কাহিনী লিখতে যাই নি। শান্তিনিকেতনকে এঁরা কী দিয়েছেন আর শান্তিনিকেতন এঁদেরকে কী দিয়েছে ঐটুকুই শুধু বলতে চেয়েছি। এঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের জীবন যাপন করেছেন; সেই কথাটি বলতে গিয়ে আমি সাধ্যমত শান্তি-নিকেতনের জীবনটিকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। কারণ শান্তিনিকেতনের জীবনই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা। সেই জীবনটিকে গড়ে তোলবার কাজে এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতন জীবনের স্থাপত্যকর্মে এঁদের সকলেরই কিছু অবদান আছে এবং সেই হেতু শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এঁদের প্রত্যেকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কাজটুকু করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে অনেক রকমে সাহায্য পেয়েছি। অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্ষিতীশ রায় এবং শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার নিত্যদিনের সঙ্গী; তাঁদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। শিল্পীবন্ধু ধীরেন দেববর্মণ, সংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ, বন্ধুবর কালীপদ রায় প্রভৃতির কাছ থেকে পুরোনো দিনের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, জেনেছি। এঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক সুবীর মজুমদার তাঁর পিতা সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে এবং স্নেহভাজন ছাত্র সুকীর্তি কর তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ কর সম্পর্কে নানা তথ্যাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। প্রয়োজনবোধে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠিপত্রের ফাইল, পুরোনো পত্র-পত্রিকা মাঝে মাঝে

ঘটাতে হয়েছে। সে কাজে প্রধান সহায় ছিলেন অবেক্ষক সনৎকুমার বাগচী। এ ছাড়া যখন যা প্রয়োজন তাই হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন দুই তরুণ অধ্যাপক— অনাথনাথ দাস এবং পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে সাহায্য করেছেন পত্নী প্রমীলা দেবী এবং কন্যা পিয়ালী। গ্রন্থনবিভাগের সুযোগ্য কর্মী সুবিমল লাহিড়ী গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইটি পাঠ করে পাঠকবর্গ যদি কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করেন তা হ'লে তার সমস্তটুকু কৃতিত্ব পূর্বোক্ত উৎসাহদাতাদের এবং সাহায্যকারীদেরই প্রাপ্য। আর দোষ ত্রুটি যদি কিছু ঘটে থাকে তার পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই আমার।

শান্তিনিকেতন
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শান্তিনিকেতনের এক যুগ

শান্তিনিকেতন

এককালে লোকে শান্তিনিকেতনকে জানত একটি আশ্রম হিসাবে। আশ্রম বলতে লোকে সাধারণত বোঝে ধর্মসাধনার স্থান। শান্তিনিকেতনের জন্ম খানিকটা সেভাবেই হয়েছিল। এক সময়ে এখানে প্রধানত ধর্মানুরাগীদেরই আনাগোনা ছিল। তবে সেটা শতাব্দীকাল পূর্বের কথা। কালের পরিবর্তনে সকল জিনিসেরই মতিগতি বদলায়, শান্তিনিকেতনেরও বদলেছে। শান্তিনিকেতন এখন আর ঠিক আশ্রম-জাতীয় স্থান নয়। এখন এটি একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অন্তত আমি তাকে সে হিসাবেই দেখি। তা হলেও আশ্রম কথাটি এখনো ওর গায়ে লেগে আছে। এখন যাঁরা এখানকার অধিবাসী তাঁরাও অনেক সময় একে আশ্রম বলেই উল্লেখ করেন; সেটা বোধ করি নিতান্তই অভ্যাসবশত।

বলতে বাধা নেই যে আশ্রম জিনিসটা ঠিক এ যুগের উপযোগী নয়। যুগের সঙ্গেও ঠিক খাপ খায় না; আমাদের মতো দেশের পক্ষেও না। দরিদ্র দেশ, অগণিত মানুষ নিরাশ্রয়। তাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে, আশ্রমের প্রয়োজন নেই। পশ্চিম দেশে বহুকাল আগেই cloistered life-এর মহিমা বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশে আশ্রম বা মঠ -বাসী জীবনের প্রতি ভক্তি এখনো অটুট। আশ্রম-জীবন সুন্দর সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত। পরিপাটী পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত— এ সমস্তই স্বীকার করি কিন্তু সমগ্র দেশের সঙ্গে এর মিল নেই। এরা যেন বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুরম্য মরুদ্যান-বিশেষ। বৈচিত্র্য হিসাবে চমৎকার কিন্তু এর ব্যাবহারিক মূল্য খুব বেশি নয়। নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে যোগ না থাকলে সব জিনিসই অসামাজিক হয়ে দাঁড়ায়। এককালে আশ্রম বা মঠ-বাসী সম্প্রদায় একান্তে অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন থাকতেন বলে সমাজের সঙ্গে তাঁদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। যুগের পরিবর্তনে এখন আশ্রম-জীবনেরও রূপান্তর ঘটেছে। ইদানীং কালের মঠবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরাও তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। এখন আর সামাজিক জীবন থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন।

বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নি। পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপন কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর নানা

লেখায় এবং ভাষণে শান্তিনিকেতনকে আশ্রম বলেই উল্লেখ করেছেন। তা হলেও 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' এবং 'বিশ্বভারতী' নামক দুটি গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যাবে কিভাবে আশ্রমের রূপান্তর ঘটেছে, আশ্রম-বিদ্যালয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং আশ্রম-জীবন ক্রমে সমাজ-জীবনে বিস্তার লাভ করেছে। এ কথা নিশ্চিত যে বিগত দিনের সেই শিশু-আশ্রমকে আজকের শান্তিনিকেতনে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ থেকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে একদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বীরভূমের এক দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের পথে পালকি থেকে নেমে একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষের ছায়ায় দুদণ্ড একান্তে বসেছিলেন। জনহীন প্রান্তরের সীমাহীন বিস্তার, পড়ন্ত বেলায় পশ্চিম আকাশে অপরূপ রঙের খেলা এবং নীরব নিঝুম প্রকৃতির মুখে এক অনির্বচনীয় গভীরের আভাস তাঁর সমস্ত মনকে আবিষ্ট করেছিল; ভাবছিলেন এখানে একটি নীড় বাঁধতে পারলে দিনান্তে পাখি যেমন ক্লান্ত পাখা গুটিয়ে কুলায়ে আশ্রয় নেয় তেমনি সংসারক্লান্ত মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এখানকার সুগভীর প্রশান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ডুব দেওয়া যেত। মন যেখানে বাসা বাঁধে সে-ই যথার্থ বাসগৃহ। মহর্ষি অবিলম্বে কিছু জমি সংগ্রহ করে সেই প্রান্তরের মধ্যেই একটি গৃহ নির্মাণ করলেন; গৃহটির নাম দিলেন শান্তিনিকেতন। মনটাকে ছুটি দেবার জন্যে সুযোগ পেলেই ছুটে আসতেন এখানে। শান্ত নির্জন পরিবেশে গভীর শান্তি লাভ করেছেন এবং যিনি তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' সেই পরম পিতার সান্নিধ্য অনুভব করেছেন। নিজে আনন্দ পেয়েছেন, অপরকেও সে আনন্দের ভাগ নেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বন্ধুজনদের আহ্বান করে বলেছিলেন—এখানে একটি নির্জন আরাধনার আসন রচনা করেছি। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে, নির্মল পরিবেশে অগাধ শান্তির আস্বাদ যদি পেতে চান তা হলে যাঁর যখন ইচ্ছা এসে কিছুদিন এখানে নির্জনবাসে কাটিয়ে যেতে পারেন। এসেছেনও অনেকে, এসেছেন থেকেছেন। ক্রমে ধর্মানুরাগীদের কাছে স্থানটি যথার্থই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। পরে একটি উপাসনা-গৃহও নির্মিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে শান্তিনিকেতন ইতিহাসের প্রথম চল্লিশ বৎসর কাল স্থানটি ছিল ধর্মপিপাসু বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের আবাসস্থল। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে স্থানটি গড়ে উঠেছিল প্রধানত অধ্যাত্মসাধনার একটি কেন্দ্র

হিসাবে। কাজেই শান্তিনিকেতনের 'আশ্রম' আখ্যাটি তখন খুব সহজেই মানিয়ে গিয়েছিল। একে বলা চলে শান্তিনিকেতনের আদি পর্ব।

পরে এক সময়ে মহর্ষির অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে শান্তিনিকেতন ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ঠিক এক জিনিস নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আকৃতি প্রকৃতি সবই ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল। ছিল বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের নিভৃত সাধনার স্থান, এখন সে স্থান কিশোর কণ্ঠের কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকগণও বয়সে তরুণ। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বিদ্যালয়ের সূচনাকালে প্রাচীন তপোবনের আদর্শটি রবীন্দ্রনাথের মনে স্পষ্টত জাগরূক ছিল; সে কথা তিনি নিজ মুখেই বহুবার বলেছেন। প্রাচীনের মধ্যে যা শ্রদ্ধেয় নবীনের সঙ্গে তাকে মেলাতে গেলে প্রাচীনকেও নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতি ক্রমে যেমন নব নব রূপে বিকাশ লাভ করেছে তেমনি তার সঙ্গে তাল রেখে আশ্রম-জীবনেরও ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটেছে। এ কথা নিশ্চিত যে আমাদের চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের যোগ সমধিক—দেশের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। আসল কথা আজকের দিনে আশ্রম কথাটির মর্মার্থ গিয়েছে বদলে; আজকের ভাষায় আমরা একে বলি community life। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি জীবনধারা গড়ে দিয়েছেন, যাঁরা এখানে থাকবেন তাঁরা সকলে ঐ যৌথ জীবনের শরিক হবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদি কথাও একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে উঠেছে, ইস্কুলে পাঠাবার বয়স হয়েছে। তখনকার দিনে স্কুল-শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছে নিজ বাল্যকালে। তার হুলটি তখনো মনে বিঁধে আছে। জেনেশুনে নিজ সন্তানকে সেখানে পাঠাবার উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। গৃহের সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় মানুষ হওয়াটাও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। দশজনের সঙ্গে

মিলে মিশে, দশের জীবনের অংশীদার হয়ে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুখে দুঃখে মানুষ হওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং যথার্থ সিদ্ধি। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই ভেবে আসছিলেন, এখন আপন সন্তানের শিক্ষার প্রশ্নে তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা বিশেষ একটি রূপ পরিগ্রহ করল। আমাদের দেশে তো বটেই, অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এক ধরনের চিকিৎসা-ব্যবস্থা। রুগ্‌ণ মানুষের জন্যে হাসপাতালে যে ব্যবস্থা, অজ্ঞ মানুষের জন্যে ইস্কুল-কলেজে সেই ব্যবস্থা। হাসপাতালে সুস্থদেহীর স্থান নেই, বিদ্যালয়ে সুস্থ মনের শিক্ষার সুযোগ নেই। বলা বাহুল্য, অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র মস্তিষ্কের পরিচর্যা করলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, দেহের এবং মনেরও পরিচর্যা চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই।' বৃক্ষের কাণ্ডটি মজবুত হয়ে উঠলেই বৃক্ষের পরিচর্যা সার্থক হয় না— শাখায় শাখায়, পত্রে পল্লবে, ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠলে তবেই সে সার্থক। শিকড়ের সাহায্যে শুধু মাটির রসটুকু গ্রহণ করলেই হবে না, সূর্যতাপ এবং মুক্তবায়ু পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে পারলে তবেই গাছটি সজীব এবং সতেজ হয়ে উঠবে। পুস্তকের বিদ্যা মস্তকে যেটুকু প্রবেশ করে সেটুকুর দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মনের পুষ্টির জন্যে বহু উপকরণের প্রয়োজন। প্রাণধারণ এবং চিত্তবিনোদনের জন্যে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোমের দান অপরিহার্য, কেননা সৃষ্টির আনন্দ এর মধ্যেই প্রবাহিত। শিক্ষাকে প্রাণবান করতে হলে প্রকৃতির সেই সৃজনশীল আনন্দকে শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করতে হবে। আনন্দের পরিবেশনই শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রকরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি আনন্দময় জীবনধারার প্রবর্তন। ধর্মচর্চা এবং জ্ঞান-চর্চা উভয়ই সাধনার বস্তু— কাজেই শান্তিনিকেতন পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমনি— আশ্রম বলব না কিন্তু সাধনার ক্ষেত্র হয়েই রইল— প্রধানত সুন্দরের এবং আনন্দের সাধনক্ষেত্র এবং সমস্তটা মিলিয়ে জীবনসাধনার ক্ষেত্র।

মহর্ষি বলতেন, পরব্রহ্মকে শাস্ত্রে বলেছে প্রজ্ঞানঘন; আমি অতশত বুঝি না, আমি বলি তিনি সৌন্দর্যঘন। বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যেই

আমি তাঁর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতন মন্দিরে যখন ভাষণ দিতেন তখন চোখ বুজে আরাধনার কথা কখনো বলেন নি। বলেছেন চোখ মেলেই দেখো চতুর্দিকে কী অফুরন্ত সৌন্দর্য তোমাকে ঘিরে আছে। পশ্য দেবস্য কাব্যম্— দেখো দেবতার কাব্য—'যেখানে সূর্যের আলো আকাশ ভরা, যেখানে মাঠ মিলিয়ে গিয়েছে নীলের কোলে, যেখানে ফুল ফুটে ঝরে পড়ছে, যেখানে উদাস হাওয়া খ্যাপার মতো বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেছে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুকে করে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলায়, আকাশ কপালে চুমু খায়।' অজস্র সহস্র গানে এই সৌন্দর্যকেই তিনি আবাহন করেছেন এবং তরুণ বিদ্যার্থীদের মনকে সেই সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনে একবার সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে দিতে পারলে মন আপনি নির্মল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সৃষ্টির অপার রহস্য এবং রোমাঞ্চের অনুভূতির মধ্যেই শিক্ষার প্রথম পাঠ। সৌন্দর্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আনন্দচর্চাকে। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের আয়োজন ছিল প্রচুর। প্রতিদিনের পাঠসূচীর সঙ্গে ছিল সন্ধ্যার বিনোদন পর্ব। গানে গল্পে অভিনয়ে ক্রীড়াকৌতুকে একটি আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের সৃষ্টি হত। বাস্তবিক পক্ষে আনন্দ মানুষের মনকে যতখানি পুষ্টি দেয় এমন আর কিছুতে নয়।

আপাতদৃষ্টিতে মহর্ষির ধর্মসাধনার স্থানকে রবীন্দ্রনাথ জীবনসাধনার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ দু-এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ ধর্মসাধনাও মূলত জীবনেরই সাধনা। তা হলেও বলে নেওয়া ভালো যে শান্তিনিকেতনের আদি পর্ব অর্থাৎ মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমি বলতে বসেছি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কথা। এ কথা মানতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথ যেদিন এখানে তাঁর বিদ্যালয়টি স্থাপন করলেন সেদিন শান্তিনিকেতনের জীবনে এক নতুন পর্বের শুরু হল। এটি একাধারে বিদ্যাচর্চা এবং জীবন-চর্চার পর্ব। রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে এখানে একটি সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ আনন্দোজ্জ্বল জীবন গড়ে দিলেন। সেই জীবনটিই হল শান্তিনিকেতনের শিক্ষার বাহন। বিদ্যা বলতে বহুকাল ধরে আমাদের যে ধারণা ছিল সেটা পরীক্ষা পাস এবং ডিগ্রি ডিপ্লোমা-সমেত এমন একটা পুথিগত ব্যাপার যে

জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন একটি আবাসিক বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্র মাস্টার মিলে একটি যৌথ জীবন—একসঙ্গে থাকা-খাওয়া, পঠন-পাঠন, খেলা-ধুলা, হাসি-গল্প। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে গোড়াতেই গড়ে উঠল ছোটোখাটো একটি সংসার। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা যেমন বাড়ল তেমনি শিক্ষকের সংখ্যাও। পরে একে একে এলেন গুরুপত্নীরা। বিদ্যালয়ের সংসারটি বিস্তার লাভ করে ধীরে ধীরে দেখা দিল ছোটো একটি সমাজ। যেখানে সমাজ সেখানে সামাজিকতা—অতিথি-অভ্যাগত, লোক-লৌকিকতা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব-অনুষ্ঠান। আবার সমাজে কি শুধুই আমোদ-আহ্লাদ? যেখানে মানুষের বাস সেখানে রোগশোকেরও বাস। ছাত্ররা আশ্রম-পরিবারের গৃহস্থালি পরিচালনায়, অতিথি-পরিচর্যায়, উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়, রোগীর শুশ্রূষায়, আকস্মিক বিপদে-আপদে—সকল ব্যাপারে শিক্ষকদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এভাবেই জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসাধন হয়েছে। লেখাপড়ার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ আছে এমন কথা আজ আর কেউ বলবে না। ব্যাপারটা যেমন সহজ তেমনি সংগত, অথচ দেশের লোক সেদিন একে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। এর কারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দেখে অভ্যস্ত সে তুলনায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালের বিশ্বভারতী ভাবে-স্বভাবে, রীতি-পদ্ধতিতে এতই ভিন্ন প্রকৃতির যে তা অনেকের পক্ষে সেদিন মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। গতানুগতিকে অভ্যস্ত মন নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। উচ্চশিক্ষিত মহলেও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কৌতূহল যতখানি ছিল, আস্থা ততখানি ছিল না। শান্তিনিকেতন যদি আর-পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতো হত তা হলে কোনোই চিন্তা ছিল না। কিন্তু একান্তভাবে নিজের মতো বলেই সহজে কারো মন পায় নি। লোকের মনে সংশয় থেকেই গিয়েছে। কোনো কোনো মহলে প্রচুর বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই নিয়ে মনে দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু তাই বলে শান্তিনিকেতন তার স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করুক অর্থাৎ দশের দলে ভিড়ে যাক, এটি তিনি কখনো চান নি।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—শান্তিনিকেতন যে কী সে আমি দেশের মানুষকে বোঝাতে পারলুম না। এ দুঃখটি শেষ পর্যন্ত তাঁর

মনে ছিল; কারণ জীবনের শেষ পর্বেও নানা লেখনে ভাষণে তাঁর এই মনোবেদনাটি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালের বিশ্বভারতী যে কেবলমাত্র পাঠ্যানুক্রম অনুযায়ী পাঠাভ্যাস, পরীক্ষা পাস এবং ডিগ্রি বিতরণের স্থান নয়—এইটুকু বোঝা খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। এ-সব ছাড়িয়ে তিনি আর কী চেয়েছিলেন এবং কেন চেয়েছিলেন তাও সারাজীবন এতবার এত ভাবে বলেছেন যে বুঝবার মন থাকলে তা বোঝা কঠিন হত না। আসল কথা শতাব্দীকাল ধরে এক ধারায় শিক্ষালাভ করে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই অভ্যস্ত ধারার বাইরে নতুন কিছুকে আমল দিতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ অবধি ইংরেজি স্কুল-কলেজের শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল চাকুরির লক্ষ্যসন্ধানে রীতিমত অব্যর্থ। কাজেই এরূপ সুনিশ্চিত সিদ্ধি-দায়িনী শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন নি। এ শতাব্দীর শুরুতে রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা খানিকটা মুখস্থবিদ্যার পালিশ লাগিয়ে একটা নড়বড়ে-গোছের চাকুরে মনুষ্য যদি-বা তৈরি করে দিতে পারে, একটি সুস্থ মনের গোটা জীবন্ত মানুষ তৈরি করা এর পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়, তখন এ-সব কথা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঠিক বুঝতে পারেন নি, বুঝলেও আমল দিতে চান নি। অভ্যাস-জীর্ণ মন স্বভাবতই চিন্তা-বিমুখ। যেটা চলে আসছে তাই নিয়েই সে তুষ্ট, অন্য কিছু ভাবতে চায় না। নতুন সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান।

মানুষের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত—একদিকে আছে জীবন-ধারণ, অপর দিকে জীবন-যাপন। একটা শুধু প্রাণে বেঁচে থাকা, আর-একটা মনে-প্রাণে বেঁচে থাকা। একটির জন্যে চাই পেটের খোরাক, অপরটির জন্যে মনের। দুটিই সমান জরুরি, শিক্ষাকে দুয়েরই দাবি মেটাতে হবে অর্থাৎ জীবিকার কথা যতখানি ভাবতে হবে, জীবনের কথাও ততখানি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ দুটিকে মিলিয়ে দেখা হয় নি। এর ফলে আমাদের ইস্কুল-কলেজে শিক্ষিত মানুষরা প্রধানত আপিস-আদালতের মাপে তৈরি হয়েছে, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মাপে নয়। এ শিক্ষার মধ্যে এমন কোনো উদ্বৃত্ত জিনিস নেই যার দ্বারা মানুষটা তার অবসর সময়টুকু স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দে যাপন করতে পারে কিংবা আত্মীয়বন্ধু-সমাজে একজন গুণীজন হিসাবে

সমাদর লাভ করতে পারে। উদ্‌বৃত্তের মধ্যেই মানুষের নানা গুণপনার বিকাশ এবং প্রকাশ। ঐ উদ্‌বৃত্তের অভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা ছিল সাধারণ কথায় যাকে বলে ন্যাড়া— নিতান্তই পুথিগত বিদ্যার চর্চা। গুণচর্চার কোনো অবকাশ সেখানে ছিল না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিদ্যাও একটা মস্ত বড়ো গুণ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাবিদরা বিদ্যাকে দেখেছেন বড়ো সংকীর্ণ অর্থে। বিদ্যাদায়িনী দেবীকে তাঁরা কেবলমাত্র গ্রন্থবাহিনীরূপে দেখেছেন। তাই যদি হবে তা হলে দেবী সরস্বতী বীণাপাণি হতে গেলেন কেন? বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে বহুগুণধারিণী সে কথাটি তাঁরা ভেবে দেখেন নি। অথচ আমাদের দেশেই এক সময়ে বিদ্যাকে ব্যাপকতম অর্থে দেখা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে— সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে— সেই হচ্ছে বিদ্যা যা আমার মনকে মুক্তি দেবে, আমার জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করবে, চিন্তাশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করবে, আমার অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করবে। সহজ কথায় জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয়কে নিবিড়তর করবে এবং পরিপূর্ণ জীবন-যাপনে আমার সহায় হবে।

এ যুগে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিদ্যার সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে বিদ্যা-চর্চাকে দেখেছেন জীবনচর্চা হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি সাহিত্যিক দার্শনিক সুরকার রূপকার এবং আরো অনেক কিছু, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী। বাস্তবিকপক্ষে এর চাইতে তাঁর সত্য পরিচয় আর-কিছু হতে পারে না। বহু জিনিসের চর্চা করেছেন কিন্তু সব চাইতে বড়ো ছিল তাঁর জীবনচর্চা। নিত্যদিনের জীবনে ক্ষুদ্রতম কাজটিতেও শোভন রুচির ছাপ থাকত। যাঁর নিজের জীবন বলতে গেলে নিরবচ্ছিন্ন সুন্দরের সাধনা তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্বভাবতই সর্বোচ্চ স্থান ছিল রুচি-চর্চার। সে রুচিবোধের পরীক্ষা প্রত্যেকটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। সেজন্যে শিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন জীবন-যাপনের নিপুণ শিল্প। আমাদের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক ছিল অতি ক্ষীণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যা ছিল একটা পোশাকী জিনিস, চোগা-চাপকানের মতো আপিস-আদালতে ব্যবহার হত, নিত্যদিনের আটপৌরে কাজে বড়ো একটা ব্যবহারে লাগত না।

রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যা এক, শিক্ষা আর। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেমন ধর্ম লাভ হয় না, তেমনি

শুধু বিদ্যা অর্জনের দ্বারা মানুষ শিক্ষিত হয় না। বিদ্যাকে স্বভাবগত করতে পারলে তবেই তা শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার সুনিশ্চিত ছাপ পড়বে মানুষের চোখে-মুখে, চলনে-বলনে, ভাবে-ভঙ্গিতে, আচারে-ব্যবহারে। এডমাণ্ড বার্ক সম্পর্কে একজন বলেছিলেন যে বার্কের চোখে-মুখেই এমন বিশিষ্টতার ছাপ ছিল যে হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালেও সকলের চোখ তাঁর উপরে গিয়ে পড়বে। একে অন্যকে জিগ্‌গেস করবে, ইনি কে? সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে American Taxation সম্পর্কে বক্তৃতা করতে হবে না। শুধু আবহাওয়া সম্বন্ধে যদি সামান্য দুটো কথা বলেন তা হলেও লোকে বলবে, ইনি খুব উঁচু দরের মানুষ। প্রকৃত শিক্ষার এমনি অপ্রতি-রোধ্য আকর্ষণ।

যে বিদ্যা মনে মজ্জায় লেগে মানুষের জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন শিক্ষা অর্থাৎ তাঁর মতে বিদ্যাজাত মানসিক উৎকর্ষটুকুর নামই শিক্ষা। বিদ্বান মানুষ দিয়ে বিদ্যা দান করা যায় কিন্তু বিদ্যার যে অংশটুকু অভ্যাসে পরিণত হবে এবং নিত্যদিনের আচরণে প্রকাশ পাবে সেই জীবন্ত শিক্ষা আমাদের স্কুল-কলেজে দেওয়া হয় না, কারণ তেমন শিক্ষক বিরল। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ চালাতে পারেন, পরীক্ষা-পাসের ব্যবস্থা করতে পারেন, এমন অধ্যাপক মেলে যত্রতত্র কিন্তু প্রাণবন্ত মানুষ তৈরি করতে পারেন, সমাজে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এমন যথার্থ শিক্ষক লাখে মেলে না একজন। আমাদের দেশের যিনি শিক্ষক-শিরোমণি সেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আজ কেউ জিগ্‌গেস করে না তিনি সংস্কৃত কলেজে কালিদাসের কাব্য পড়াতেন না পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতেন। চরিত্রের মাহাত্ম্যেই তিনি আজও সর্বজনপূজ্য। তাঁর অধ্যাপনা অর্থাৎ বিদ্যাদানের কাজ ছিল সংস্কৃত কলেজের চতুঃসীমায় আবদ্ধ কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের কাজ ছিল সমস্ত দেশে বিস্তৃত। তিনি সমগ্র দেশের শিক্ষক, সমগ্র বঙ্গসমাজের গুরুস্থানীয়। এখানেই প্রমাণ যে বিদ্যাদান এবং শিক্ষাদান এক জিনিস নয়।

বিদ্যার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষক যিনি হবেন তাঁকে শুধু বিদ্বান হলে চলবে না, তাঁকে গুণবান, প্রাণবান এবং হৃদয়বান হতে হবে। ছেলেমানুষরা বিদ্বান মানুষকে সমীহ করে দূরে থাকে, হৃদয়বান মানুষকে ভালোবেসে কাছে আসে আর যিনি গুণবান তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর

ভক্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যাবত্তা, হৃদয়বত্তা আর বিবিধ গুণগ্রামের মিলন যাঁর মধ্যে ঘটেছে তিনিই আদর্শ শিক্ষক। সোজা কথায় তাঁকে এমন কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে যা দেখে ছাত্রদের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। শিক্ষার আয়োজন যে উৎসবের আয়োজনের ন্যায় বিচিত্র এবং বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন, শান্তিনিকেতনই দেশকে সে কথা শিখিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন তাঁরা কেউ শিল্পী, কেউ লেখক, কেউ গায়ক, কেউ অভিনেতা, কেউ বা ক্রীড়াপারদর্শী। বাদ্যযন্ত্রে নৈপুণ্য ছিল অনেকের। জগদানন্দবাবুর ন্যায় গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষও লক্ষেশ্বর সেজে অপূর্ব অভিনয় করেছেন, ক্ষিতিমোহনবাবু সন্ন্যাসীবেশী রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ, গৌরগোপাল ঘোষ মোহনবাগানের গৌরবে ছেলেদের চোখে 'হীরো'র সমতুল্য। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষকরা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। পুঁথিগত রুটিনগত পরীক্ষাসর্বস্ব একান্ত নীরস শিক্ষাকার্যকে রবীন্দ্রনাথ হাসি গল্পে, নৃত্যে গীতে, রূপে রসে আনন্দমুখর করে তুলেছিলেন। যেখানে মন গড়ার কাজ চলছে সেখানে সর্বপ্রথমে চাই একটি সুনির্মল বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ জীবনচর্চার একটি সুপরিকল্পিত পরিবেশ। পরিবেশ যত সমৃদ্ধ হবে শিক্ষা তত ফলপ্রসূ হবে। সে পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন কবি তাঁর সুযোগ্য সহযোগীদের সাহায্যে। ছেলেরা ক্লাস করেছে, তারই ফাঁকে শুনেছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবির সদ্য-রচিত গানের সুর; সন্ধ্যার বিনোদন পর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছেলেদের নিয়ে গানের আসর জমিয়েছেন। ছাত্র-মাস্টার মিলে মহড়া দিয়েছে কবিকৃত আনকোরা নতুন নাটকের; নন্দলালকে দেখেছে কচ-দেবযানীর কাহিনী কিংবা নটীর পূজার কাহিনীকে দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে। অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে মধ্যযুগীয় সন্তদের ভক্তবাণী শুনেছে মুগ্ধ চিত্তে; দেখেছে বিধুশেখর শাস্ত্রী বৌদ্ধদর্শনের কঠিনতম সূত্রের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত; হরিচরণবাবুকে দেখেছে অনন্যচিত্তে অভিধান রচনায় মগ্ন, জগদানন্দবাবু নক্ষত্র জগতের রহস্যসন্ধানে রত। পিয়ারসন অধ্যাপনার ফাঁকে সাঁওতাল নরনারীর সেবায় রত, কালীমোহন স্বদেশী ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এণ্ড্রুজ আজ আছেন এখানে, কালকে ছেলেরা শুনছে তিনি চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্গত মানুষের সেবার কাজে। বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এই নিভৃত

আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছে। এই-সমস্তর মধ্য দিয়েই এখানকার বিদ্যার্থীরা এক বৃহত্তর জগতের সন্ধান এবং বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সর্বোপরি বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে জ্ঞান-তপস্যায় নিরত প্রাচীন তপোবনের ঋষিমূর্তি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বিদ্যাচর্চার, জীবনচর্চার মহোৎসব আর কাকে বলে! পরে বিশ্বভারতী পর্বে এখানে যে বিরাট বিদ্বজ্জন-সমাগম হয়েছিল বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাকেও তা হার মানিয়েছিল।

এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল বিদ্যালাভ করতে হলে অনন্যমনা হয়ে বিদ্যাচর্চা করতে হবে। আনন্দমাত্রকেই তাঁরা চিত্তবিক্ষেপের কারণ বলে মনে করতেন। কৃচ্ছ্রসাধনকে এখনো যেমন অনেকে ধর্মচর্চার অঙ্গ বলে মনে করেন তেমনি এককালে বিদ্যাচর্চার রীতি ছিল সর্বপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ বর্জন করে একান্তমনে গৃহকোণে বসে পাঠাভ্যাস। এও কৃচ্ছ্রসাধনেরই নামান্তর। পাছে কোনোপ্রকার লঘুচিত্ততা প্রশ্রয় পায় সেজন্য বিদ্যার মন্দির থেকে সর্বপ্রকার আনন্দের আয়োজনকে সযত্নে দূরে রাখা হত। আমরা জানতাম বিদ্যা জিনিসটা কেবলমাত্র গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শেখালেন যে সংগীতকলা, চিত্রকলা, নানাবিধ কারুকলা সমস্তই বিদ্যার অন্তর্গত। বিদ্যার পরিধিকে তিনি অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। বললেন গুণচর্চা মাত্রই বিদ্যাচর্চা। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে— বিদ্যা বৃংহণানাম্— বৃংহণের মধ্যে অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। মনকে যা পুষ্ট করবে তাই যথার্থ বিদ্যা। সংগীত নৃত্য চিত্রকলা ইত্যাদি সৌন্দর্যচর্চাকে মনের পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে এ-সব জিনিসকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া আনন্দকে পরিহার করার দরুন আমাদের বিদ্যাদান শুধু নীরস নয়, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে রস সঞ্চার করে তাকে প্রাণবন্ত করবার চেষ্টা করেছেন। গর্ব করে বলেছিলেন, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে আমি আনন্দের এবং সুন্দরের আসন পেতে দিয়েছি। শান্তিনিকেতনকে তিনি আনন্দনিকেতনে পরিণত করেছিলেন। পরে নানা উৎসবাদির প্রচলনের ফলে সে আনন্দ বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে এ-সব উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন একটি আনন্দলোক এবং সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছেন তেমনি আবার প্রত্যেকটি উৎসবকেই তিনি শিক্ষার বাহন

হিসাবে ব্যবহার করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের চর্চা রবীন্দ্রনাথের মতে অপরিহার্য। একবার যদি সৌন্দর্যবোধ মনে জাগিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই মানুষের মন নীচতা ক্ষুদ্রতা স্থূলতা ইতরতা— সকলপ্রকার কুৎসিত চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যবোধ মূলত পরিমিতিবোধ— কথায়-বার্তায়, আচারে-ব্যবহারে, নিত্যদিনের কর্মে। সুমিতিবোধ আর সুনীতিবোধ এক কথা। সভ্য মানুষের একমাত্র নীতি সৌন্দর্যবোধ যার বাস্তব প্রকাশ ব্যবহারের সৌকুমার্যে। যে কাজ সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করে তাই নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কল্যাণকে এবং সুন্দরকে সে কারণেই আমাদের শাস্ত্রে একাসনে বসানো হয়েছে।

সকলের মূল্যবোধ সমান নয়। রবীন্দ্রনাথ যে-সব জিনিসকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন দেশের শিক্ষিত সমাজ যে আজও তাকে মূল্য দিতে শিখেছে এমন নয়। তেমন তেমন শিক্ষিত ব্যক্তিকে, এমন-কি, যাঁরা শিক্ষাকার্যেই ব্যাপৃত, তাঁদেরও বলতে শুনেছি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়ার চর্চাটা হবে না, ঐ নাচ গান উৎসব পার্বণই এখানে জমবে। দেখা যাচ্ছে পুরোনো ধ্যান-ধারণা কিছুই বদলায় নি। তাঁদের মতে এ-সব জিনিস বিদ্যাচর্চার পরিপন্থী। নাচ গান চারুকলা ইত্যাদি নিয়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁরা একটা শৌখিন ব্যাপার বলে মনে করেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে শখ এবং শৌখিনতা এক জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ সকলের সকল রকম শখকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু নিছক শৌখিনতার প্রশ্রয় কোনো কালেই দেন নি। শিক্ষা-সম্পর্কিত তাঁর মূল ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতই এ-সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা যদি জীবনের প্রয়োজনে হয় তা হলে মানুষের শারীরিক মানসিক সকলপ্রকার প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াসকেই বলব শিক্ষা। সেজন্যে বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যবহার যতখানি প্রয়োজন, দৈহিক পরিশ্রম ততখানি। আদি মানুষের শিক্ষা শুরু হয়েছে এইভাবে। মানুষ তার বাসগৃহ বেশবাস আহার-ব্যবস্থা সমস্তই সমস্যা হিসাবে সমাধান করেছে। শেখার প্রবণতা মানুষের সহজাত। ঐ সহজাত বৃত্তিকে কাজে লাগাবার মধ্যেই তার পূর্ণতা এবং আনন্দ। আজকের সভ্যমানুষ হাতের কাছে সব জিনিস তৈরি পাচ্ছে বলে সেই আনন্দের স্ফুরণ থেকে সে বঞ্চিত— শুধু আনন্দের সম্পূর্ণতা থেকে নয়, শিক্ষার সম্পূর্ণতা থেকেও। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন, 'শিক্ষা শুরু করতে হলে বর্বরতা থেকে শুরু করতে হবে।' ছেলেরা যদি নিজের কুটির নিজে বেঁধে, নিজের কাপড় নিজে বুনে, নিজের কাগজ নিজে তৈরি করে, নিজের বানানো কালিতে লিখে কাজ চালাতে পারত তো ভালো হত। বলেছেন—অতটা করে তোলা কঠিন, তা হলেও ঐ লক্ষ্যের অভিমুখে দৃষ্টি রাখা উচিত। দায়ে ফেললেই মন আপনার শক্তিকে উদ্ভাবিত করে, নইলে কিছুদিন পরে তার ভাণ্ডারের চাবি খুঁজে পায় না। জনহীন দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুসোকে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে বুদ্ধিবলে তার বিকল্প উদ্ভাবন করতে হয়েছে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সব কাজে হাত লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন নিজে মেটানো মস্ত বড়ো শিক্ষা। শিক্ষাকে যিনি এভাবে দেখেছেন তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আরামপ্রিয় শৌখিন মানুষদের স্থান হবে এমন মনে করা নিতান্তই ভুল। চাকরবাকর ছিল না। নিজ নিজ থালাবাসন ধোয়া থেকে শুরু করে সকল কাজ যার যার নিজের হাতেই করতে হত।

আমরা জানি আগে ইস্কুল, পরে ছাত্র মাস্টার। লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ আগে একটা ইস্কুল তৈরি করে নিয়ে পরে ছাত্র মাস্টার জোটাতে যান নি। তিনি প্রথমে গুটিকয়েক ছাত্র এবং জন চার-পাঁচ শিক্ষক জড়ো করে বললেন—এসো আমরা একটা ইস্কুল তৈরি করি। ছাত্র-শিক্ষকের সম্মিলিত চেষ্টায় ইস্কুল দিনে দিনে গড়ে উঠতে লাগল। পড়াশোনা, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-সল্প, গান-বাজনা সবই ছাত্র-মাস্টার মিলে। ইস্কুল নয় তো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটি একান্নবর্তী পরিবার। ঘরদোর পথঘাট ঝাঁট-পাট দিয়ে সাফ রাখা, ফুলের বাগান করা, শাক-সবজি করা, রাস্তার পাশে পাশে গাছ লাগানো ছাত্র-মাস্টার মিলেই করা হয়েছে। নেপাল রায় মশায়ের নেতৃত্বে একটি রাস্তাও তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্র শিক্ষক সকলেরই এই বোধ জন্মেছিল যে বিদ্যালয়টি তাঁদের আপনার জিনিস, তাঁরাই এটিকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন। এই আপন বলে জানাটা একটা মস্ত বড়ো কথা।

আমরা শিক্ষিতরা বেশির ভাগই পুথি-পড়া পরীক্ষা-পাস-করা শিক্ষিত মানুষ। বই পড়া ছাড়া অন্য কোনো গুণের চর্চা করি নি, নিজের হাতে কোনো কাজ করতে শিখি নি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো শিক্ষিতদের

বলতেন 'বোকা হাতের মানুষ'। শুধু বোকা হাতের মানুষ নয়, আমরা বোবা-মনের মানুষ। কোনো বিষয়ে নিজের মতো করে ভাবতে শিখি নি। মুখস্থ বুলি আওড়িয়ে কাজ চালিয়ে নিই। জীবন কাটিয়ে দিই। নিতান্ত চাকুরিগত জীবন বলেই এর অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞান নই। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম কি আর আছে, ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে, কেবল ছুঁস্ নে ছুঁস্ নে। রবীন্দ্রনাথও বলতে চেয়েছেন, শিক্ষা কি আর আছে, শিক্ষা ঢুকেছে পুথির পাতায় আর পরীক্ষার খাতায়, কেবল পরীক্ষা পাস আর ডিগ্রি লাভ! পৈতে-ধারী বামুনের মতো ডিগ্রি-ধারী এক বামুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে— তারা চাকুরির বাজারে বর্ণশ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন এবং বিশ্বাসও করতেন যে কোনো মানুষই নির্গুণ নয়; কোনো-না কোনো দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা এবং কিছু দক্ষতা অবশ্যই আছে। পাঠচর্চায় হয়তো তেমন মাথা খেলে না। কিন্তু বিশেষ-কোনো গুণচর্চায় রীতিমত ওস্তাদ। অঙ্ক ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল নিয়ে যে বালক বিড়ম্বিত, রঙতুলির ব্যবহারে সে দিব্যি সপ্রতিভ। ক্লাসের পড়ায় যার মুখ খোলে নি, গানের গলায় সে মুগ্ধ করেছে। আর-কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই কিন্তু সংস্কৃত পাঠে রস পেয়েছে— এ-সব ছেলেদের মামুলি পাঠ্যক্রমের মধ্যে বেঁধে রাখা হয় নি। অন্যান্যদের সঙ্গে শুধু বাংলা এবং ইংরেজির ক্লাস করেছে, বাকি সময়টা তাদের নিজস্ব বিষয়েরই চর্চা করেছে। পরে দেখা গিয়েছে ছবি আঁকায় ওস্তাদ ছেলেরা শিল্পী হিসাবে দেশ-জোড়া নাম করছেন এবং বিভিন্ন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ-পদ অলংকৃত করেছেন। গাইয়ে ছাত্ররা সংগীতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে কাজ করেছেন, সংস্কৃতজ্ঞ ছেলে পরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। শুধু কাঠের কাজ শিখে দেশ বিদেশে নাম করছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। দেশের শত শত বিদ্যালয়ে কত কত ছেলেমেয়ের শক্তি-সাধ্য গুণের অপচয় হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে সে অপচয়টা তেমন হয় নি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের প্রবণতা বুঝে নিয়ে উৎসাহ প্রেরণা দিয়ে সে অপচয় নিবারণ করেছেন।

শান্তিনিকেতন সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা বহুকাল ধরেই চলে এসেছে, আজও সে-সবের নিরসন হয় নি। এক সময়ে অনেকেই বলতেন যে শহর

বন্দর থেকে দূরে সরে এসে জনহীন এক প্রান্তরের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের খুব একটা সার্থকতা নেই। এ যেন জনসাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা। এখানেও ঘুরে ফিরে সেই শৌখিনতার প্রশ্নটাই দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে এখানে কিছু শৌখিন মানুষের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু এরা সমাজের খুব একটা কাজে লাগবে না। একটু লক্ষ্য করলেই তাঁরা বুঝতে পারতেন যে যেখানে ছেলেরা নিজের হাতে সব কাজ করছে, লেখাপড়ার সঙ্গে ছুতোরের কাজ, কুমোরের কাজ শিখছে, সেখানে আর যাই হোক পোশাকী মানুষ তৈরির চেষ্টা হবে না। ছেলেরা প্রথমাবধিই পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছে; গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে, পড়ানোর ভার নিজেরাই নিয়েছে, সাঁওতাল ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা খেলাধুলা করেছে। পরবর্তী কালের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে সারা পৃথিবীতে এই একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই গ্রাম-সংগঠনের কাজকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলে এসেছেন যে, শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্তরে একটি ভাব-প্রবাহ নিত্য প্রবাহিত রাখতে হবে। এই কেন্দ্রগত ভাবটিকে তিনি বলেছেন লোকহিতব্রত, আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলেছে লোকসংগ্রহ। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি লোকহিতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বারংবার বলেছেন চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বলেছিলেন, 'মাঠের মধ্যে ছেলেদের রেখে শিক্ষা দিচ্ছি কিন্তু লোকালয়ের জন্য ওদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ওরা যদি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মতো বই-পড়া ভালোমানুষ লোক হয়ে ওঠে —ওদের মন যদি সত্যভাবে মানবপ্রেমে অভিষিক্ত না হয়ে ওঠে তা হলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। নদী পাহাড়ের গুহার মধ্যে লালিত ও পুষ্ট হবে কিন্তু লোকালয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার সম্বল তাকে জোগাতে হবে— আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করবার জন্যেই আমাদের বিদ্যালয়ের নির্জনে সত্যের ও ভাবের ধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকবে এই আমার ইচ্ছা।'

এক সময়ে কিছু লোকের ধারণা ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় একটি রিফর্মেটরি স্কুল। দুর্দান্ত ছেলেদের শায়েস্তা করবার জন্যে এখানে পাঠানো

হয়। আসল কথা দুরন্তপনাকে এখানে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় নি। তেমন তেমন দুর্দান্ত ছেলেও অধ্যাপকদের স্নেহ-ভালোবাসার ছোঁয়াচ পেয়ে অল্প দিনেই শুধরে গিয়েছে। এই সূত্রে আর-একটি কথারও উল্লেখ করছি। এক দল লোক বলতেন, বড়োঘরের ছেলেমেয়েরা এসে শান্তিনিকেতন থেকে একটু সাংস্কৃতিক পালিশ নিয়ে যায়। ইঙ্গিতটা হল, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রধানত বড়োলোকের ছেলেমেয়েদের জন্যে। এঁরা একটু খোঁজ করলেই দেখতে পেতেন যে বড়োঘরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা এখানে ঢের বেশি। তবে এটাও একটা মস্ত বড়ো জিনিস যে— রাজারাজড়ার ঘরের ছেলেমেয়ে আর অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে একইভাবে মাটিতে আসন বিছিয়ে বসে ক্লাস করেছে। একই রান্না-ঘরে খেয়েছে, একই সঙ্গে খেলাধুলা করেছে। একে অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে বড়ো-ছোটোর বৈষম্য কখনো লক্ষ করি নি। মনে আছে প্রথম যেদিন শান্তি-নিকেতনের কাজে যোগ দিতে আসি সেদিনই ছাত্রদের আয়োজিত একটি বিতর্ক সভা বসেছিল। আমি গেস্ট হাউসে আছি, তখনো কাজে যোগ দিই নি। বিকেলের দিকে একটি ছেলে এসে আমাকে সে সভায় যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, আমি শিক্ষাভবন (তখনকার কলেজ বিভাগ) ছাত্র সম্মিলনীর সম্পাদক, বি.এ. চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আমার নাম ঘাগু মাঝি। আমি সাঁওতাল ছেলে। কথায়-বার্তায় নম্র, মার্জিত, চমৎকার লাগল ছেলেটিকে। এখনো ভাবতে ভালো লাগে যে ঐ সাঁওতাল ছেলেটির মাধ্যমেই শান্তিনিকেতন ছাত্রসমাজের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে পড়ছে, কথাটি বৈপ্লবিক। বলেছিলেন—গ্রাম্য অশিক্ষিত পরিবার থেকে যে-সব ছেলে আসছে তাদের একটু ভদ্র আর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে যারা আসছে তাদের একটু 'অভদ্র' করে দিতে হবে। আমাদের সমাজে উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র অভদ্রে যে দুলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তার দূরীকরণ পূর্বোক্ত যৌথ জীবনের মধ্য দিয়েই হওয়া সম্ভব। তাঁর গানে তিনি যে কথাটি বলেছেন— আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে / নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে। তাঁর পূর্বোক্ত উক্তিটির মধ্যেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এখানকার জীবন আরম্ভ হয়েছিল খোলা মাঠের মধ্যে খানকয়েক খড়ের চালাঘর নিয়ে। যাঁরা এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যাসে আচরণে অশনে বসনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। একটি সরল অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে একটি ঐশ্বর্যময় জীবনের সম্ভাবনাকে তাঁরা পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। সে ঐশ্বর্য বহিরঙ্গে প্রকাশ না পেয়ে অন্তরঙ্গ জীবনে প্রতিফলিত হবে, এটিই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। জানতেন, বাইরের বৈভব অন্তরের দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। সহজ সরল জীবনের মধ্যে একটি আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সে আভিজাত্যের চর্চা করেছে। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনটিকে নানা কারুকার্যে মণ্ডিত করে শোভন সুন্দর করে গড়ে দিয়েছিলেন। দৈনিক কর্মসূচী হিসাবে না দেখে এর শিক্ষামূলক দিকটির কথা ভাবলে একে একটি শিল্পকর্ম বলে মনে হতে পারত। কারণ ঐ কর্মসূচীর মধ্যে রুচিটাই প্রধান স্থান পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় রুচির স্থান সর্বোপরি। সুষ্ঠু-রুচিবোধ একবার গড়ে দিতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। শোভন পরিচ্ছন্ন রুচি বাহ্যিক জলুসের অপেক্ষা রাখে না।

প্রকৃতপক্ষে শান্তিনিকেতনের দারিদ্র্য শান্তিনিকেতনের অশেষ কল্যাণ করেছে। খাওয়া-দাওয়া ছিল অতি সাধারণ কিন্তু ছাত্র-মাস্টার সকলে এক-সঙ্গে বসে একই খাবার খেতেন বলে ছেলেমেয়েদের মনেও কোনো অসন্তোষ থাকত না। এক সময়ে সকলেই মাটির ঘরে থেকেছে কেউ তাতে আপত্তি করে নি, তথাকথিত বড়োঘরের ছেলেমেয়েরাও না। অবশ্য এ কথা সত্য যে অভাব-অনটনের দরুন রবীন্দ্রনাথকে তো বটেই অধ্যাপকদেরও প্রচুর দুর্ভাবনা সইতে হয়েছে। কিন্তু সে কারণেই আবার বিদ্যালয়ের প্রতি অধ্যাপক কর্মীদের মমতা আরোই বেড়েছে এবং অনেকে স্বেচ্ছায় অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অধ্যাপকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো অধ্যাপকরা নিজেরাই নিজেদের বেতনে কাটছাঁট করে নিয়েছেন। একবার যখন আর্থিক সংকট চরমে পৌঁচেছে তখন অধ্যাপক নগেন আইচ মশায় তাঁর দেশের বাড়িতে গিয়ে নিজের এক ফালি জমি বিক্রি করে কিছু টাকা এনে রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়েছিলেন। একে অভাবের কাহিনী বলব না সমৃদ্ধির কাহিনী বলব? অভাবই শান্তিনিকেতনের ভাবমূর্তিটিকে উজ্জ্বলতর করেছে।

অর্থাভাবে নিরন্তর দুর্ভাবনায় ভুগেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটাকে একটা মস্ত বড়ো দুর্দৈব বলে মনে করেন নি। সন্তোষ মজুমদার মশায়কে বিদেশ থেকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমাদের দারিদ্র্য শিবের অনুচর, অনেক অশিবকে সে দূরে তাড়িয়ে রাখে। আমার দরিদ্র আশ্রমকে এখানকার ধনের দুর্গ-বাতায়ন থেকে কী সুন্দর কী নির্মল দেখাচ্ছে! কী মধুর তার বাণী!' অর্থের সচ্ছলতাকেই ভয়ের চোখে দেখেছেন। সেই কতকাল আগে—বিদ্যালয়ের শৈশবাবস্থাতেই বলেছিলেন, 'টাকা জিনিসটা ছোটো-লোকের মতো ঠেলে ঠুলে সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায় এবং তার খাতিরে তার চেয়ে অনেক বড়ো জিনিসের খাতির রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে।··· ভালো কাজেরও বৈষয়িক দিকটা ভয়ংকর—তার মধ্যেও লোভ মোহ ভ্রষ্টতা এসে পড়ে।··· আমাদের যদি টানাটানি ঘোচে, যদি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠি তবে আত্মবিস্মৃতির দিন আসবে বলে আশঙ্কা হয়।' সেই দুর্দিন এসেছে, এ মুহূর্তে সাবধান না হলে সর্বনাশ ঘটবে।

আর-একটি কথা বলে শেষ করব। বিদ্যাচর্চাকে বলেছি জীবনচর্চা, যদি দেখি জীবন বদলাচ্ছে তবে তার সঙ্গে তাল রেখে বিদ্যাচর্চাকে ঢেলে সাজাতে হবে। জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়াকেই যদি বলি শিক্ষা তা হলে জীবনের উপযোগী করে শিক্ষারীতিকেও বদলে নিতে হবে। কালের সঙ্গে জীবন বদলাবে, জীবনের সঙ্গে সমাজ। শিক্ষাকে তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ধ্যান-ধারণার কত পরিবর্তন হয়েছে, সেইসঙ্গে শান্তিনিকেতনেরও। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনকে কখনো ভয়ের চোখে দেখেন নি। জানতেন যে পরিবর্তন-বিলাসী সময় নিত্য নতুন দাবি নিয়ে হাজির হবে; তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলবে না। তবে সকল দাবিকেই মেনে নিতে হবে এমনও নয়। তখন শান্তিনিকেতনকে তার নিজস্ব ভাবগত রূপটির কথা মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা ক'রে। শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো পরিবর্তনকে আমল দিলে চলবে না। শান্তিনিকেতনের ভাবগত রূপটির প্রতি লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র অধ্যাপক আশ্রমবাসীদের নিয়ে একটি জীবন গড়ে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন তো শুধু একটি স্থানের নাম নয়, শান্তিনিকেতন

বলতে বোঝায় একটি সুসম্পূর্ণ জীবন-দর্শন— Santiniketan is nothing if not a particular way of life— একটি সুসংগত সুসংযত সুশোভন জীবনধারা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও দেখেছি এখানকার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ভাবগত জীবনের তেমন কোনো বিরোধ ঘটে নি। কিন্তু গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে এমন এলোপাতাড়ি সব পরিবর্তন হয়েছে যে সংগতি রক্ষার কথা ভাবাই হয় নি। ফলে শান্তিনিকেতনের সে-জীবনটি গিয়েছে ভেঙে চুরমার হয়ে। জীবনটি নেই বলেই এর মূলগত ভাবাদর্শটিকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেকে ভুলে অপরের অনুকরণ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী তার স্বধর্ম ভুলে গিয়ে পরধর্ম গ্রহণ করেছে এবং সে কারণেই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

কারো উপরেই দোষারোপ করছি না। দোষ কারো একলার নয়, দোষ আমাদের সকলের। চোখের সুমুখেই এমন-সব পরিবর্তন হয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে শান্তিনিকেতনের স্বভাব-বিরোধী। আমরা দেখেও তা দেখি নি। বিড়ম্বনা ঘটেছে প্রত্যয়ের অভাবে। এটা এ যুগের ব্যাধি। কোনো জিনিসের প্রতিই শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, অশ্রদ্ধা এবং বিদ্রূপের ভাব আছে। মৃত্যুর ঠিক একটি বৎসর পূর্বে মন্দিরের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ আর-সব কথা ছেড়ে শুধু শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কথাই বলেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শান্তিনিকেতন মন্দিরে বসে এটিই তাঁর সর্বশেষ ভাষণ। এর পরে আর মন্দিরে এসে বসবার মতো শক্তি তাঁর দেহে ছিল না। সেদিনকার ঐ ভাষণে বলেছিলেন, চল্লিশ বছর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসেন তখন একাগ্রচিত্তে এই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা থেকে একে রক্ষা করবেন। কিন্তু এতকাল যে বিষ থেকে একে মুক্ত রেখেছিলেন তা যে এখন সমগ্র সমাজ-জীবনকেই গ্রাস করতে চলেছে তার আভাস তিনি পাচ্ছিলেন। বর্তমান কালের বিষবাষ্প শান্তিনিকেতনেরও শ্বাসরোধ করবে সে আশঙ্কা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। সেজন্যেই অশক্ত দেহটিকে টেনে এনে মন্দিরে বসেছিলেন, ছাত্র কর্মী অধ্যাপকদের কাছে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন, 'আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।' সেদিনের সব

কথার মধ্যেই একটা হতাশার সুর বেজেছিল। তা হলেও মানুষের শুভ-বুদ্ধির 'পরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম, নাস্তিবাদের অন্ধকারে দৃষ্টি তাঁর পরাহত হয় নি কোনোদিন। সেজন্যে সেদিনের ভাষণেও শেষ বাক্যে আশার বাণীই শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী উদ্ধার-চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়টি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন তখন সর্বপ্রথম যিনি এসে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বৎসর কাল পূর্বেও দুজনের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অবশ্য গুণী ব্যক্তিদের গুণগ্রামই একে অন্যের সঙ্গে পরিচয়ের সেতু নির্মাণ করে। ব্রহ্মবান্ধব যেমন পণ্ডিত তেমনি সাহিত্যরসিক, রবীন্দ্রকাব্যের মস্ত বড়ো সমজদার। ১৯০১ সালের জুলাই সংখ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' নামক পত্রিকায় এরূপ উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবিবন্দনা উচ্চারিত হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এর আগে তাঁর কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ তিনি কোথাও দেখেন নি। ঐ উপলক্ষেই দুজনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত হল। একে অন্যের চিন্তাধারার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত ছিলেন; তা হলেও দু-একবার সাক্ষাতের পরেই খুব চমকপ্রদ-ভাবে প্রকাশ পেল যে সে মুহূর্তে উভয়েরই মন একই চিন্তায় আন্দোলিত। সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে পরিচালিত একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে দুজনেই মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করছেন। উপাধ্যায়মশায় বসে থাকবার লোক নন; অনতিকালমধ্যে গুটিকয়েক বালক এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁর অনুগত এক সিন্ধী যুবক রেবাচাঁদকে নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করে দিলেন। মাস-দুই পরে রবীন্দ্রনাথ এসে জানালেন, পিতৃদেব তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন। শুনে ব্রহ্ম-বান্ধবের উৎসাহ দ্বিগুণিত হল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হল, তাঁরা যে প্রাচীন আদর্শে তপোবন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনই সে বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। তন্মুহূর্তেই স্থির হল তাঁর ছাত্র-ক'টি এবং শিক্ষক রেবাচাঁদকে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। যে কথা সেই কাজ। ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) তারিখে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হল। নাম হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। উপাধ্যায়মশায়ের সঙ্গে আনা গুটিকয়েক বালক এবং কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু। বিদ্যালয় পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ব্রহ্মবান্ধবের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তবে নিয়মিতভাবে অধ্যাপনার

কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁকে প্রায়ই কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে হত। বেশিরভাগ সময় বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকলেও ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাঁর প্রবর্তিত বিধিবিধান অনুযায়ীই চলত। সরল এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় ছাত্ররা যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রেখে বিদ্যালয়ের জীবনধারাটিকে তিনি একটি ছকে বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা, উপাসনান্তে সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ। এইভাবে দিনের কাজ শুরু হত। অতঃপর ছাত্ররা অধ্যাপকদের প্রণাম করে গাছের তলায় পাঠাভ্যাসে বসত। পরনে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা; জুতো-ছাতার বালাই নেই, খালি পায়ে চলাই রীতি; সাত্ত্বিক আহার— আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ। রান্নার কাজ ছাড়া বাকি সমস্ত কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে করতে হত। আজকের দৃষ্টিতে এতখানি বিধিনিষেধ অতি-মাত্রায় কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়-জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় না সে কঠোরতা খুব একটা তাঁদের গায়ে লেগেছে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, তেজে বীর্যে চরিত্রে ব্রহ্মবান্ধবের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব ছেলেদের মনকে নানাভাবে অভিভূত করে রেখেছিল। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অন্যবিধ গুণাবলীর মর্ম বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তা হলেও কথায় কাজে, বলে বিক্রমে তিনি ছিলেন ছেলেদের 'হিরো'। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকেই খানিকটা এর আভাস পাওয়া যাবে। বলেছেন, 'একদিন একটি পাঞ্জাবি পালোয়ান কি করে হঠাৎ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হল। কুস্তি শেখবার জন্য আমরা একটা আখড়া তৈরি করেছিলুম। সেই দেখে পালোয়ানটির মহা উৎসাহ, পোশাক ছেড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগল। তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, কারও সাহসে কুলোলো না তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যায়। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি উপাধ্যায় মহাশয় কৌপীন পরে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তাল-ঠুকে পালোয়ানকে লড়াই করতে আহ্বান করলেন। বাঙালি সন্ন্যাসীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবি পালোয়ানকে হার মানতে হল। আমাদের তখন কী আনন্দ!'

সন্ন্যাসী হলে কি হবে, এমন প্রাণবন্ত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। কোনো কাজে পিছ-পা নন, সকল কাজে সমান আগ্রহ। দেহচর্চায়, বিদ্যাচর্চায়, চরিত্রমহিমায় একেই বলে জাত-শিক্ষক। এমন মানুষকে কেউ মান্য না করে পারে না। শান্তিনিকেতনে যতদিন ছিলেন ছেলেরা তাঁকে দেখেছে একাধারে তাদের রথী এবং সারথি-রূপে। পরে একদিন ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রহ্মবান্ধব হয়েছেন বলতে গেলে সমগ্র বাংলাদেশের অধিনায়ক। সেদিন দেশবাসী তাঁকে মান্য করেছে রাজচক্রবর্তীরূপে।

ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতনে ছিলেন অতি অল্পদিন— সবসুদ্ধ ছ-সাত মাসের বেশি নয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে যিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা, ক'মাস না যেতেই তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এই নিয়ে নানা জন নানা কথা বলেছেন, লিখেছেনও। ব্রহ্মবান্ধব এবং রেবাচাঁদ দুজনেই ছিলেন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। কারো কারো মতে বিদ্যালয়ের ভার খ্রীস্টান পরিচালকের হাতে থাকে, সেটা মহর্ষির মনঃপূত ছিল না। তিনি আপত্তি প্রকাশ করাতেই ব্রহ্মবান্ধবকে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, এ কথা সত্য নয়। কথাটা মহর্ষির কানে অবশ্যই তোলা হয়েছিল কিন্তু তিনি তাতে কোনো-প্রকার উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নি। খ্রীস্টান হলেও ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান। তথাপি কোনো কোনো মহলে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে মহর্ষির শান্তিনিকেতন একটি খ্রীস্টানী আড্ডায় পরিণত হতে চলেছে। এরূপ অবস্থায় এ কথা মনে করাই যুক্তিযুক্ত যে পাছে তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় সেই ভেবেই ব্রহ্মবান্ধব স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এ নিয়ে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনোই অভিযোগ বা অভিমান ছিল না। কথায় কাজে কখনো তা প্রকাশ পায় নি। চলে যাবার পরেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষ অবধি একে অন্যের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শিক্ষাকার্যে দুজনের সহযোগিতা অতি অল্পদিনের হলেও রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি তাঁর অপরিশোধ্য ঋণের

কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে যখন যেমন ভেবেছেন বিদ্যালয়কে সেভাবে আবার নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে তিনি ধীরে ধীরে জীবনচর্যার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হয়েছে জীবনচর্যাশ্রম। তা হলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে বিদ্যালয়ের সূচনাকালে কবি ব্রহ্মবান্ধবের দ্বারা গভীর-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এদিক থেকে দেখলে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে ব্রহ্মবান্ধবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ব্রহ্মবান্ধবের সুদৃঢ় চরিত্র এবং সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, ‘তিনি (ব্রহ্মবান্ধব) ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক— তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকর্ষণ করে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।’

ব্রহ্মবান্ধবও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমপরিমাণে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব আখ্যাটি ব্রহ্মবান্ধবই দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত সেটি চলে আসছে। প্রাচীন যুগের আশ্রমগুরুদের কথা স্মরণ করেই ঐ আখ্যাটি দিয়ে থাকবেন; কিন্তু বলতে বাধা নেই যে এ যুগে এ-সব জিনিস ঠিক চলে না। কবি মানুষের পক্ষে কবি আখ্যার চাইতে বড়ো পরিচয় আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর বেশ কিছুদিন আগে (কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়েরও আগে) ‘সোফিয়া’ নামক ইংরেজি মাসিকপত্রের একটি প্রবন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে world poet বা বিশ্বকবি আখ্যা দিয়েছিলেন। এ আখ্যাটিও আমাদের দেবার কথা নয়, বিশ্ববাসী যদি দেয় তবেই তা সার্থক হবে, নতুবা নয়।

এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটির জীবনকে বলা চলে এক বিচিত্র-বীর্য কাহিনী। এ মানুষকে এক স্থানে এক কাজে ধরে রাখা কঠিন। এজন্যে আমার

বিশ্বাস, ধর্মমতের প্রশ্নটি উত্থাপিত না হলেও উপাধ্যায়মশায়ের পক্ষে বেশি দিন শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হত না। ধর্মমতের চাইতেও বড়ো কথা মানুষের স্বভাবধর্ম। নিজ নিজ স্বভাবধর্মই প্রতিটি মানুষের সকল চিন্তা সকল কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্রহ্মবান্ধবের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি এবং অদম্য কর্মপ্রেরণা ক্ষণে ক্ষণেই তাঁর মনে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে কোথাও বেশিদিন তাঁকে তিষ্ঠাতে দেয় নি; স্থান থেকে স্থানান্তরে, কর্ম থেকে কর্মান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। পথিক-স্বভাবের মানুষ; পথ কোন্ দিকে যে হঠাৎ বাঁক ঘুরবে, কোথায় তাঁকে নিয়ে যাবে তিনি নিজেই তা জানতেন না। বিদ্যালয় ত্যাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বোধকরি শান্তিনিকেতন থেকেই ফিরছিলেন কলকাতায়; হাওড়া স্টেশনে নেমেই সংবাদ পেলেন বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেছেন। শুনে প্রথম চিন্তাই হল, বিবেকানন্দের কাজ এখন কী করে চলবে। নিজেই লিখেছেন, 'মনে একটা প্রেরণা এল —তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও। বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সে মুহূর্তে স্থির করিলাম যে বিলাতে যাইব।··· বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব।' উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপাধ্যায়মশায় কলেজে বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন।

অধীর অস্থির স্বভাবের মানুষ, কিন্তু একবার যদি মন স্থির করে নিলেন তো তার আর নড়চড় হত না। ঠিক তিনমাস পরে বিলেত রওনা হয়ে গেলেন। অর্থাভাবে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় নি, পুরো এক বছরও নয়। কিন্তু ঐ সংকীর্ণ সময়ের মধ্যেই অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, লণ্ডন শহরে তো করেছেনই। ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জন সমাজে রীতিমত শোরগোলের সৃষ্টি করে-ছিলেন। বিদেশে থাকা কালেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি চিঠিপত্রে যোগা-যোগ রক্ষা করেছেন। তিনি যে ওখানে এতখানি সাড়া জাগাতে পেরেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ উল্লসিত। তিনি এই ভেবে আনন্দিত যে একজন অতি সুযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষ যথার্থভাবে তার নিজস্ব পরিচয় দেবার সুযোগ পেল।

ব্রহ্মবান্ধব যখন দেশে ফিরে এলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে আলমোড়ায়। সেখান থেকে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখছেন, 'উপাধ্যায়-

মশায় কি ফিরেছেন? একবার আলমোড়ায় যদি আসেন তাহলে তাঁর দিগ্বিজয় কাহিনী একটু ভালো করে শুনে নি।'

আপাতদৃষ্টিতে মনে নাও হতে পারে কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে শিক্ষায় দীক্ষায়, মননে চিন্তনে ব্রহ্মবান্ধব এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ খানিকটা মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ইস্কুল-কলেজের গতানুগতিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। দুজনের একজনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন; কিন্তু উভয়েই অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আপন রুচি এবং স্পৃহা অনুযায়ী বিদ্যাচর্চার দ্বারাই তাঁরা এতখানি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং সে কারণেই অর্জিত বিদ্যা তাঁদের মনে মজ্জায় লেগে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন আজীবন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্বপ্ন দেখেছেন এবং সে উদ্দেশ্যে কাজও করেছেন, ঠিক যে কথাটি ব্রহ্মবান্ধবও কতকাল আগে ভেবেছিলেন। ১৯০৩ সালে বলেছেন, 'ভারতে এক বিশ্বজনীন সরস্বতীর পীঠস্থান কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার স্বপ্ন সদাই দেখি। স্বপ্ন যাহাতে সফল হয় তাহার অল্পস্বল্প আয়োজনও করিতেছি। তবে তাহা বীজবপন মাত্র।'

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর স্বপ্ন একদা ব্রহ্মবান্ধবের মনেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যে প্রাণচাঞ্চল্য তাঁকে নিরন্তর এক লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে স্বদেশী যুগের প্রত্যূষে, সেই অধীর চাঞ্চল্য অকস্মাৎ তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সরস্বতীর পীঠস্থান থেকে দেশজননীর বেদীমূলে চরম আত্মত্যাগের আহ্বানে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে প্রথমাবধিই একটি তপোবন বিদ্যালয় হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ততদিনে শাল তাল আমলকী এবং আম্রবন-ছায়ায় একটি তপোবনের আকার ধারণ করেছিল। কাজেই বিদ্যালয়টি যখন স্থাপিত হল তখন তাকে তপোবন বিদ্যালয় বলতে কোনো বাধা ছিল না। তা হলেও একটি জিনিসের তখনো অভাব ছিল। তপোবনের কথা ভাবতে গেলেই তপস্যারত কোনো ঋষিকল্প মানুষের কথা আপনা থেকেই আমাদের মনে এসে যায়। সে মানুষটি তখনো সেখানে এসে আসন গ্রহণ করেন নি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছর পাঁচেক পরে জ্ঞানতপস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের-উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে এলেন তখনই তপোবন বিদ্যালয়ের মূর্তিটি পূর্ণতা লাভ করল।

আশ্রম-সংলগ্ন 'নিচু বাংলা' নামক গৃহটিতে তিনি বাস করতেন। এখন তাঁর নামেই গৃহটির নামকরণ হয়েছে : দ্বিজবিরাম। নানা ফুলফলের বৃক্ষে শোভিত এ স্থানটি ছিল তপোবনের অন্তর্গত একটি যেন উপবন। এক সময়ে মহর্ষি এ গৃহটিতে কিছুকাল বাস করেছিলেন। মহর্ষির এই পুত্রটিকে কেউ ঋষি আখ্যা দেন নি ; দিলে যোগ্য পাত্রেই দেওয়া হত কারণ তিনি যথার্থই ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য তিনি এমন শিশুসুলভ সরলচিত্ত মানুষ ছিলেন যে এরূপ কোনো আখ্যা দিলেও তিনি সেটাকে মস্ত বড়ো একটা কৌতুকের ব্যাপার বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথকে যে গুরুদেব আখ্যা দেওয়া হয়েছিল মনে হয় তাতেও তিনি যথেষ্ট কৌতুকবোধ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সাদাসিধে মাটির মানুষ, আশ্রমবাসীরা তাই সাদামাঠা ভাষায় তাঁকে বলতেন বড়োবাবু। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা, আর সকলের বড়োবাবু। বড়োবাবু বাস্তবিক পক্ষে ছিলেন আশ্রমের বরপুত্র— বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, সকলের নমস্য। সরস্বতীর বরপুত্র তো বটেই— অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দেশে বিদেশে বহু বিদ্বান পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু তাঁর বড়দাদার মতো পণ্ডিত খুব বেশি দেখেন নি।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না; তিনি অধ্যয়নে নিরত থাকতেন, অধ্যাপনা কোনো কালে করেন নি। কিন্তু ঐ যে বিদ্যালয়ের এক প্রান্তে একজন জ্ঞানতপস্বী নিয়ত বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত আছেন এ দৃশ্যটিই আশ্রমবাসী বিদ্বান এবং বিদ্যার্থীদের কাছে একটি প্রেরণার উৎস ছিল। বিদ্যালয় বলতে শুধু তো বিদ্যার আলয় বা গৃহটুকু নয়, গৃহ-সংলগ্ন ভূমিটুকুও নয়। ভূমির চাইতে বড়ো কথা ভূমিকা; কোনো জিনিসের মুখ্য অংশটাকে যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট করতে হলে তার একটা গৌণ বা পরোক্ষ পটভূমিকা চাই। যথার্থ বিদ্যায়তন যেখানে স্থাপিত হবে সেখানে গোড়া থেকে ঐ পশ্চাদ্‌ভূমিকাটি রচনা করে নিতে হয়। ঐ ভূমিকাটি ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো বিদ্যালয় জীবনের তাল মান সংগতি রক্ষায় সাহায্য করে। সেজন্যে সেখানে নিরলস বিদ্যাচর্চার, জ্ঞানালোচনার এবং সর্বোপরি আদর্শ জীবন সাধনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারেই বিদ্যালয়ের পরোক্ষ সেবায় ঐ মহৎ কর্তব্যটি সম্পাদন করেছেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানের দ্বারাই তিনি বিদ্যালয়ের সেবা করেছেন, অধ্যাপনার প্রয়োজন হয় নি। তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারাটিই শান্তিনিকেতনের জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

পাণ্ডিত্য জিনিসটা বড়ো বেশি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভালোবাসে। রাশি রাশি তথ্য আর তত্ত্বের ভিড়ে মনটা আর ঠিক তার সহজ সরল ভাবটি রক্ষা করতে পারে না, পাণ্ডিত্যের চাপে পড়ে কেমন যেন তেড়াবাঁকা হয়ে যায়। সেটাতে মনের স্বাভাবিক শ্রী সৌন্দর্য বেশ খানিকটা নষ্ট হয়। সেজন্যে উপনিষদের উপদেশ হল— পাণ্ডিত্য লাভের পরে বালকের মতো থাকবে। ঐ উপদেশটি মনে রাখেন না বলে বেশির ভাগ পণ্ডিতের বেলাতেই বিপত্তি ঘটে অর্থাৎ তাঁরা অকালে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম— প্রচুর পাণ্ডিত্যও তাঁর মনে এতটুকু ভাঙচুর ঘটাতে পারে নি। তিনি ছিলেন চিরকিশোর।

জিজ্ঞাসার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত, তা হলেও প্রধান অনুসন্ধিৎসা ছিল দর্শনশাস্ত্রে। দার্শনিক প্রবন্ধাদি লিখে কখনো অধ্যাপক মজলিসে পাঠ করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। শাস্ত্রানুশীলনে কখনো কোনো সংশয় উপস্থিত হলে বিধুশেখর শাস্ত্রী কিংবা ক্ষিতিমোহন

সেন মশায়দের ডেকে পাঠাতেন। তাঁরা যথাসাধ্য তাঁর সংশয় নিরসনের চেষ্টা করতেন। এ নিয়ে কখনো কখনো কৌতুকেরও সৃষ্টি হত। জটিল প্রশ্নাদির জট ছাড়ানো দুরূহ হলে তাঁরা হয়তো প্রস্তাব করতেন, এ বিষয়ে গুরুদেবের সঙ্গে একবার আলোচনা করলে হত। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতিশয় বিস্মিত হয়ে বলতেন— গুরুদেব? রবি? না, না, রবি ছেলেমানুষ, সে এ-সব বুঝবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চোখে কোনোকালেই সাবালক হন নি। তাঁর খেয়াল থাকত না যে যাঁদের সঙ্গে তিনি তত্ত্বকথার আলোচনা করছেন, তাঁরা বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাইতে প্রায় কুড়ি বছরের ছোটো।

এক সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথই ছিলেন কবি, রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্ত বালক। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর কত কত পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তি বাড়িময় ছড়াছড়ি যেত, বাতাসে উড়ে বেড়াত। সংগ্রহ করে রাখলে বাংলাকাব্যের একটি 'সাজি' ভরতি হতে পারত; জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করেছেন। মাইকেল তাঁকেই আগামী দিনের কবি বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বিলিতি কায়দায় বলেছিলেন, একমাত্র এঁর কাছেই মাথার টুপিটা খুলতে রাজি আছি। কোনো বিষয়েই তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। আত্মভোলা মানুষ, কবে কখন কবিত্ব ছেড়ে অন্য কোন্ বিষয় নিয়ে তিনি মশগুল হয়েছেন, নিজেরই সে খেয়াল নেই। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবির আসনটি দখল ক'রে নিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী না হলেও দেশব্যাপী তো বটেই। ততদিনে কবির আসন কনিষ্ঠকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যরচনার পরিবর্তে দর্শন আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। কিন্তু পদ্য রচনায় অনায়াসপটুত্ব শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। সামান্য ব্যাপারে কাউকে কিছু লিখে পাঠাবেন তো গদ্য ছেড়ে পদ্য-পত্র পাঠাতেন। তাতে যথেষ্ট কৌতুকরসের উপাদান থাকত। একসময়ে ঐ-সব ছড়া আশ্রমবাসীদের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পদ্মপত্রে জলের মতো ক্ষণস্থায়ী পদ্য-পত্রের রসটুকুও টলমল করে পড়ে গিয়ে অকালে লুপ্ত হয়েছে। সযত্নে সংগ্রহ করে রাখলে উপভোগ্য বেশ-কিছু রসবস্তু অদ্যাবধি সঞ্চিত থাকত এবং তখনকার শান্তিনিকেতন-জীবনের টুকরোটাকরা নানা ছবি

আমাদের চোখের সুমুখে ফুটে উঠত। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—

দখিনে, উত্তরে, উদয়ে, অস্তে
গতি তোমার সরবত্র।
তোমাদের গুরুদেবের হস্তে
সঁপিয়া দিবে এই পত্র॥
বলিবে "নমো রবয়ে!
বড়দাদার তব এ
বিচিত্র হাতের লেখন।
পড়িয়া দেখি সত্বর,
দিবেন এর উত্তর,
বিদায় হই এখন॥"

পত্ত তাঁর নিত্য সহচর ছিল। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালীর তিনি ছিলেন উদ্‌ভাবক। শর্টহ্যাণ্ড সম্পর্কে বই লিখেছিলেন, নাম 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'। তাও লিখেছেন পত্তে— কৌতুকে হাস্তে সমুজ্জল, অতিশয় সুখপাঠ্য। আর-এক ব্যসন ছিল কাগজ কেটে কেটে নানা রকমের, নানা আকারের বাক্স তৈরি করা। তাতে আবার জিওমেট্রির মাপজোকের প্রয়োজন হত— নাম দিয়েছিলেন বক্সোমেট্রি। নিজেকে বলতেন— কাগজ-বিত্তা-দিগ্‌গজ। ছড়া বেঁধেছিলেন—

ভিতর বাহির আর চৌদিক পরখি
বলিবে 'ক্যাবাত! এ যে অপূর্ব নিরখি।'
ভার হবে সে তোমায় সামলিয়া রাখা
বাকস পেয়ে পেলে যেন লাখশখানি টাকা॥

পুরানো দিনের 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সকল কর্মী অধ্যাপকের নামে একটি করে চৌপদী স্তবক লিখে দিয়েছিলেন। অল্প ক'টি কথার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের গুণ-কর্ম-স্বভাবের পরিচয়টি অতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে আমি সে-সব চৌপদীর উল্লেখ করেছি।

হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। যেমন প্রাণখোলা সদানন্দ পুরুষ, তেমনি প্রাণমাতানো তাঁর হাসি। গৃহে যখনই বন্ধুসমাগম হত তখনই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসিতে সমগ্র পাড়া উচ্চকিত হয়ে উঠত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু— এ দুই ঋষি-প্রতিম ব্যক্তির উচ্চকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হাসি বলতে গেলে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে আছে। সে যুগের খ্যাতনামা বহুজনের স্মৃতিকথা এই দুজনের হাস্যধ্বনিতে মুখরিত। সে হাসি তাঁদের চির-কিশোর মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সংসার-অনভিজ্ঞ, উদাসীন, একান্ত সরল প্রাণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের কথায় এবং কাজে অনেক সময় নানা কৌতুকের সৃষ্টি হত। সে-সব কাহিনী শান্তিনিকেতনের রসভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। কথনো বন্ধুবান্ধবদের আহারে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে বলতে ভুলে যেতেন। তাই নিয়ে পুত্রবধূ হেমলতা দেবীকে প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়তে হত। কখনো আবার এমনও হয়েছে আমন্ত্রিতেরা এসে দার্শনিক আলোচনাদি শুনে, অনাহারেই ফিরে গিয়েছেন, কারণ আমন্ত্রিতদের দেখেও নিমন্ত্রণের কথা নিমন্ত্রণকর্তার মনে পড়ে নি। উদাসীন প্রকৃতির হলেও রসবোধ ছিল প্রচুর। পৌত্র দিনেন্দ্রনাথের মুখে দাদামশায় সম্পর্কে নানা গল্প শোনা যেত। একদিন নাত-বউ কমলাদেবীকে ডেকে বললেন— একটু কালো রঙের সুতো দিতে পার? কমলাদেবী ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলেন কিন্তু হাতের কাছে কালো সুতো পেলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন— অত খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন কি? তোমার মাথার একগাছা চুল দিলেই তো হয়। কমলাদেবী হেসে তাই দিলেন। সে মুহূর্তেই ঘরে দিনেন্দ্রনাথের প্রবেশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন— এই দেখ, একেবারে Rape of the Lock— বলেই সেই উচ্চকণ্ঠ প্রাণমাতানো হাসি।

দুর্লভ চরিত্রের মানুষ, আশ্রমবাসী সকলে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। পরম ভক্তদের মধ্যে একজন অ্যাণ্ড্রুজ, অপরজন স্বয়ং গান্ধীজি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেই প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন থেকেই একে অন্যের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সে অনুরাগ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। গান্ধীজি এবং অ্যাণ্ড্রুজ দুজনেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁকে বড়দাদা বলে ডাকতেন।

প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সখ্য প্রথমাবধি। বিদ্যালয়ের কাজেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে করেছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী।

ওদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে যেন একাত্ম হয়ে বাস করেছেন। আশ্রম-বালিকা শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রমমৃগ এবং আশ্রমের প্রতিটি বৃক্ষলতার যেমন একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ তেমনি এখানকার প্রতিটি গাছপালা পশুপক্ষীকে একান্ত আপনার জন হিসাবে দেখেছেন। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে ঘর করেছেন। তাঁর ঘরে এবং খাবার টেবিলে কাঠবিড়ালীর অবাধ আনাগোনা। প্রতিদিন প্রাতরাশের সময়ে কাক চড়ুই শালিকের দল এসে ঘিরে বসত, তাদের প্রাপ্য বরাদ্দ ছিল। পাখিদের সঙ্গে চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল। কোনোদিন একটি যদি অনুপস্থিত থাকত তা হলে ভৃত্য মুনীশ্বরকে পাঠাতেন তাকে খুঁজে বের করবার জন্যে। যখন অধ্যয়নে নিরত থাকতেন তখন শালিক পাখি নিঃশঙ্ক চিত্তে এসে তাঁর কাঁধে বসত। এ যুগে এ দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত।

জীবনের শেষ কুড়ি বছর শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন এবং এখানেই দেহরক্ষা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন ততদিন শান্তিনিকেতন তার আশ্রম-বিদ্যালয় বা তপোবন-বিদ্যালয় নামের সার্থকতা অনেকখানি বজায় রেখেছিল বলা চলে। মুনিঋষিদের কথা আমরা প্রাচীন দিনের গল্পে গাথায় পড়েছি, আজকের দিনেও যে এমন মানুষ সংসারে থাকতে পারেন শান্তিনিকেতন তা প্রমাণ করে দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্র-উপাখ্যান শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এক অতি গৌরবময় অধ্যায়। 'কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ'— দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত এ গানটি ৭ই পৌষের উৎসবে প্রতি বৎসর এখানে গাওয়া হয়; আর গানটি শুনলেই আমার মনে হয়, এ গান যিনি রচনা করেছেন তাঁর নামগান করলেও আমাদের মতো মানুষের পুণ্যলাভ হয়।

সতীশচন্দ্র রায়

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদিপর্বে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন এ কাজে এসে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় বয়সে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠায় বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ। বয়স মাত্র উনিশ, বালক বললেই চলে। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ, রবীন্দ্রকাব্যের মুগ্ধ ভক্ত, নিজেও কবিতা লেখেন। কবি সত্যেন দত্ত এবং সাহিত্যরসিক অজিত চক্রবর্তীর বন্ধু। মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলায় প্রবাসী' পত্রিকায় তিন বন্ধুর একটি ছবি দেখেছিলাম—সতীশ রায়, সত্যেন দত্ত এবং অজিত চক্রবর্তী একটিমাত্র ছাতার তলায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। ছবিটির তলায় যতদূর মনে পড়ছে লেখা ছিল 'ত্রয়ী'। তিন প্রতিভাবানের মিলন। আবার খুব আশ্চর্যের বিষয় যে তিনজনই নিতান্ত অকালে গত, সতীশচন্দ্র সর্বাগ্রে।

কবিতার খাতা হাতে করে সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে আনাগোনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কবিতা পড়ে দেখেছেন, কবিযশঃপ্রার্থীকে আশ্বাস দিয়েছেন, প্রয়োজনবোধে কখনো কবিতার এক-আধটু মেরামতিও করেছেন। এভাবেই যোগাযোগের শুরু। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সবে স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মন তখন বিদ্যালয়ের চিন্তায় মগ্ন। সারাক্ষণ ঐ এক কথাই ভাবছেন, বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের একটা ভবিষ্যৎ ছবি সতীশের সামনে বেশ একটু উজ্জ্বল করেই ধরেছিলেন। শুনে সতীশের চোখেমুখে উৎসাহের দীপ্তি দেখা দিয়েছিল। অবশ্য কবি তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজে আহ্বান করেন নি। তিনি জানতেন যে অভিভাবকবর্গের অভিপ্রায় অনুযায়ী বি. এ. পাসের পরে সতীশকে আইন অধ্যয়নে লিপ্ত হতে হবে।

পরীক্ষা আসন্ন। একদিন সতীশ এসে বললেন, আমাকে যদি গ্রহণ করেন তো এখনই যোগ দিতে চাই বিদ্যালয়ের কাজে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এত ব্যস্ত কেন? পরীক্ষাটা হয়ে যাক, কাজের কথা পরে ভাবা যাবে। সতীশ বললেন, তিনি পরীক্ষা দেবেন না। মেধাবী ছাত্র—পরীক্ষাভীতি থাকবার কথা নয়, ভয়টা অন্যবিধ। বললেন, পরীক্ষা পাস করলেই আত্মীয়-স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে কেবলই তাঁকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

ঐ বয়সী ছেলের মুখে এ এক অত্যাশ্চর্য কথা। সংকল্পে দৃঢ়, কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ।'

প্রথম দিনটি থেকেই সতীশচন্দ্র কায়মনোবাক্যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক। আত্মভোলা মানুষ, আশ্রমে তিনি মনের মতো আশ্রয়টি পেয়েছিলেন। স্বভাবটি কবির, শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ। ছেলেদের সঙ্গে যেমন, তেমনি প্রতিটি গাছপালার সঙ্গে তাঁর সখ্য। পথে পথে, মাঠে প্রান্তরে তাঁর বিচরণ। ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসত। তেমন শিক্ষকের সঙ্গ শিক্ষার একটা মস্ত বড়ো অঙ্গ। ক্লাসের পাঠেও তিনি যা দিতেন তা অত্যাবশ্যকের চাইতে ঢের বেশি। সাহিত্যরসে ভরপুর তাঁর মন। সে রসসম্ভোগের আস্বাদন পেত ছেলেরাও— যেমন ক্লাসের অধ্যাপনায় তেমনি আম্রকুঞ্জে, শালবীথিতে পদচারণায়। সতীশচন্দ্রের অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারো মধ্যে পাই নি।' পুত্র রথীন্দ্রনাথের পাঠচর্চার ভার সতীশচন্দ্রের উপরে ছেড়ে দিয়ে কবি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন গ্রীষ্মের এক ছুটিতে সতীশবাবু তাঁকে কালিদাসের কিছু কাব্য এবং শেক্‌স্‌পীয়ারের বেশ ক'খানা নাটক পড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছেন, সে দু'মাসের ছুটিতে তিনি যে কতখানি সাহিত্যরসের খোরাক দিয়েছিলেন, মনকে কতখানি জাগিয়ে তুলেছিলেন সে কথা ভাবলে মন অভিভূত হয়। 'অল্প বয়সের এই একটি কবি ও ভাবুক স্বল্প দিনের সংস্পর্শে আমাকে চিরজীবন তাঁর কাছে ঋণী করে দিয়ে গেছেন।' এই প্রসঙ্গে একটি দিনের এক অতি রোমাঞ্চকর কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন। সারাদিন উৎকট গরমের পরে বিকেলের দিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। ঈশানকোণে বিপুল উদ্যোগের লক্ষণ। দেখতে দেখতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের মতো ধুলো উড়িয়ে কালবৈশাখীর ঝড় ছুটে এল যেন পৃথিবীকে গ্রাস করতে। রথীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখছি তার সেই ভয়ংকর

মূর্তি ও দ্রুত গতি, এমন সময় কানে এল সতীশ রায়ের উচ্চকণ্ঠে—

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা-বন্ধ-হারা…

ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে চলল তাঁর আবৃত্তি। সে কী গলা, কী সে ভঙ্গি! ভাবে মাতোয়ারা হয়ে কী অদ্ভুত কবিতা পাঠ!… আবৃত্তি যেই শেষ হল, বিদ্যুতের চমকানি ও বাজ-পড়ার প্রচণ্ড এক ডাকে মুহূর্তের জন্য আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, পর মুহূর্তেই দেখি সতীশ রায় আর নেই, ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁকে কোথাও আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক অনুসন্ধানের পর দূরে এক গাছতলা থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল।'

এই ঘটনাটির মধ্যেই প্রকৃতি-প্রেমিক এবং কাব্য-প্রেমিক সতীশচন্দ্রের পরিচয়টি নিঃসংশয়রূপে ফুটে উঠেছে। কাব্যপাঠ তাঁর কাছে শুধু পুঁথিগত ব্যাপার ছিল না। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।'

একজন আদর্শ শিক্ষকের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা যায় তার প্রায় সমস্তই তিনি এই যুবকটির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। জীবনকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত চতুষ্পার্শ্বকে তিনি প্রাণময় করে তুলতে পারতেন, সকল মানুষের মনকে স্পর্শ করতেন, ছেলেদের মনকে অতি সহজে জয় করে নিতেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিভা শুধু পুঁথির ভাণ্ডার থেকে পাওয়া নয়, সে শক্তি তিনি আহরণ করেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্র থেকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল যেভাবে ঋতুর দানকে গ্রহণ করে সতীশ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সেভাবেই ঋতুসম্ভারকে গ্রহণ করতেন। বাতাসের মৃদুতম শিহরন এবং আলোর ক্ষীণতম কম্পনটুকু যেমন তৃণটিকেও রোমাঞ্চিত করে সতীশ তাঁর সর্ব দেহেমনে সেই রোমাঞ্চ অনুভব করতেন।

প্রকৃতি-প্রেমিক এই কিশোরকে কবি চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন 'বনবাণী'র "শাল" নামক কবিতাটিতে। কবিতাটির মুখবন্ধেই বলে নিয়েছেন, 'প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার

এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই।' কিশোর বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথাটি রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অন্তরে বহন করেছেন।

সতীশচন্দ্র শুধু প্রকৃতি-প্রেমিক এবং সাহিত্য-প্রেমিক ছিলেন না, সাহিত্যিক প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প দিনের জীবন ব'লেই প্রতিভা স্ফুরণের পূর্ণ সুযোগ মেলে নি। জীবদ্দশায় কিছু কবিতা এবং রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পৌরাণিক উতঙ্কের কাহিনী নিয়ে ছোটোদের জন্যে একখানা বই লিখেছিলেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'গুরুদক্ষিণা' নামে সেটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু তারই মধ্যে প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। পরে পিয়ারসন সাহেব গুরুদক্ষিণার কাহিনীটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদি ইতিহাস বহু কর্মীর ত্যাগ এবং নিষ্ঠার মহিমায় সমুজ্জ্বল। সতীশ রায় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মাত্র একটি বৎসর শান্তিনিকেতন এই সর্বত্যাগী মানুষটির সেবা লাভের সুযোগ পেয়েছিল। ১৯০৩ সালের গোড়ায় আশ্রমে আগমন, ১৯০৪ সালের শুরুতেই জীবন অবসান। বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে জীবনান্ত ঘটল। কিন্তু ঐ অতি স্বল্পকালমধ্যে তিনি শান্তিনিকেতনকে যা দিয়ে গিয়েছেন সে দানের ঐশ্বর্য বহুদিন বিদ্যালয়ের সকল কর্মে এবং উদ্যমে প্রাণসঞ্চার করেছে। আশ্রমের রূপ এবং বিকাশের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বারংবার সতীশচন্দ্রের অতুলনীয় সেবা এবং চরিত্রমহিমার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'সতীশের জীবনটুকু আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সে আমাদের বিদ্যালয়কে শক্তিও দিয়েছে, সৌন্দর্যও দিয়েছে।··· তার সেই জীবনের দামটি ক্রমেই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে থাকবে।' ঐ সাধক-জীবনের কথা মনে রেখেই অন্যত্র বলেছেন, 'বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ

পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোন উত্তেজনার বিষয় ছিল না। লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আত্মনাম ঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল তা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়— তাহা তাহার মহান আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।' এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে কথাগুলি একান্তভাবে সতীশচন্দ্র সম্পর্কে বলা হলেও প্রথম যুগে যাঁরা শান্তিনিকেতনের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলের প্রতিই তা প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ কথনো কার্পণ্য করেন নি। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামক নিবন্ধে এবং নানা সূত্রে নানা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের সকল নিষ্ঠাবান কর্মীকেই তিনি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কত সুহৃদের 'অযাচিত আনুকূল্যে, অভাবনীয় আত্মনিবেদনে' শান্তিনিকেতন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সেই তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গটিতে তিনি বারে বারেই ফিরে ফিরে এসেছেন এবং সে-সব অন্তরঙ্গ সুহৃদদের প্রতি মুক্তকণ্ঠে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। তা হলেও বলতে বাধা নেই যে সতীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। একটি কিশোরবয়স্ককে উদ্দেশ করে এমন অকুণ্ঠ স্তুতিবাদ তাঁর মুখে আর কথনো শোনা যায় নি। আশ্রমের রূপ ও বিকাশের আলোচনায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন সতীশচন্দ্র এবং ঘুরে ফিরে আবার তাঁর কথাতে এসেই সে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। বলেছেন, 'এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর-বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।' এ প্রসঙ্গে একটি কথা অনেক সময় আমার মনে হয়েছে— সাহিত্যের সঙ্গী হিসাবে নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর কথা যেমন আজীবন একটি গানের ধুয়ার মতো ঘুরে ঘুরেই তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে তেমনি বিদ্যালয়ের সহযোগী হিসাবে গানের ধুয়াটির মতোই সতীশচন্দ্রের গুণগান তাঁর মুখে নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে।

মোহিতচন্দ্র সেন

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রথমাবধিই দুর্গম পথের যাত্রী। প্রতি পদে বাধা ঠেলে ঠেলে তাকে [illegible]সর হতে হয়েছে। যাত্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে পেয়েছিলেন প্রধান সহযাত্রীরূপে— বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে যিনি ছিলেন অমিত শক্তির আধার— সেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় চলে গেলেন অন্যবিধ কাজের আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন নানা পারিবারিক দুর্যোগে বিপন্ন। পত্নী মৃণালিনী দেবী এবং দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা পর পর কঠিন রোগে আক্রান্ত; বৎসর কালের ব্যবধানে উভয়ের মৃত্যু। দুজনেরই সেবা-শুশ্রূষা কবি নিজ হাতে করেছেন। বিদ্যালয়ের পরিচর্যা করা তাঁর পক্ষে তখন সম্ভবই ছিল না। বিপদ তো একলা আসে না, এরই অব্যবহিত পরে বসন্ত রোগের আক্রমণে সতীশ রায়ের মৃত্যু। রোগের সংক্রমণ থেকে ছেলেদের নিরাপদ রাখবার জন্যে বিদ্যালয় সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহে স্থানান্তরিত করতে হল। ছাত্র, অধ্যাপক সকলে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতেই থাকতেন, ইস্কুল সেখানেই বসত। কয়েকমাস পরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আবার যথাস্থানে ফিরে আসেন।

সেই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথের শরীর মন যখন অবসন্ন তখন যাঁকে তিনি প্রধান অবলম্বনরূপে পেয়েছিলেন তিনি মোহিতচন্দ্র সেন। মোহিতচন্দ্র জ্ঞাতি-সূত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র— ইংরেজি সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমান পারদর্শী। দুই বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রথমে কিছুদিন বেসরকারী কলেজে, পরে সরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সময়ে 'এলিমেন্ট্স অফ মরাল ফিলসফি' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তরুণ অধ্যাপক -রচিত ঐ গ্রন্থ দেশী বিদেশী বহু পণ্ডিতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মোহিতচন্দ্রকে যেমন অতিশয় স্নেহ করতেন তেমনি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি

তাঁর নামকরণ করেছিলেন— Platonic Idea অর্থাৎ কিনা তাঁর মতে মোহিতচন্দ্র ছিলেন প্লেটো দর্শনের মূর্ত প্রতীক। দর্শনশাস্ত্রে, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য এতই গভীর ছিল যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে একটি অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন ঐ পদের জন্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং মোহিতচন্দ্র সেনের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হতে পারে নি।

অসামান্য ব্যক্তি, বলাই বাহুল্য। সারাক্ষণ যে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন এমন নয়; কাব্যে সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ। সে অনুরাগই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে টেনে এনেছিল। রবীন্দ্রকাব্যে তিনি যে গভীর জীবনবোধের পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর দার্শনিক মন তাতেই কবির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশুদ্ধ আদর্শবাদী মানুষটিকে চিনে নিতে রবীন্দ্রনাথেরও কিছুমাত্র লগ্ন হয় নি। প্রথম সাক্ষাতেই একে অন্যকে অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলে জেনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে তখন বিদ্যালয়ের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না। প্রথম সাক্ষাতের দিনে প্রধানত শিক্ষা সম্বন্ধেই দুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। সেদিনটির কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন, 'প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল।'

এর পর থেকে মোহিতবাবু তাঁর অবকাশমত কিংবা কোনো উৎসব উপলক্ষে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন। ক্রমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং দিনে দিনে স্থানটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়তে লাগল। সে-সব দিনে এ মানুষটির সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি আনন্দলাভ করেছেন সে কথা মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দূর দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে একাকী বসিয়া কী ধ্যান করিয়াছে, কী কথা বলিয়াছে, কী ব্যবস্থা করিয়াছে, কী পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সম্মুখে কী সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এই কথা লইয়া কতদিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্তবর্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া আমরা

দুইজনে পদচারণ করিয়াছি।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি এই সকল নানা কথা ভাবের দিক দিয়াই ভাবিয়াছি।' বলা বাহুল্য, এ-সব কথা একমাত্র ভাবুক চিত্তের কাছেই বলা চলে। সেদিক থেকে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তিটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ পাণ্ডিত্যের কঠিন বেষ্টনে মোহিতচন্দ্রের মন সংকীর্ণ ছিল না। 'কল্পনাযোগে সর্বত্র তাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য এমন মানুষের সন্ধান করছিলেন যাঁরা স্বভাবত ভাবুক-প্রকৃতির মানুষ— বৃহৎ এবং মহতের কল্পনাকে যাঁরা আপন মনে লালন করতে জানেন। মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের অল্পদিন পরেই মোহিতবাবুর বন্ধু বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশে ভাবুকশ্রেণী বিরল— জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার মানস-প্রকৃতি যেন ক্ষুধিত হইয়া থাকে।' এ-জাতীয় মানুষকে কর্মকাণ্ডের সহযোগী হিসাবে পেলে তো কথাই নেই, অভাবে এরূপ আত্মীয়ভাবাপন্ন হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারলেও তিনি তাঁর কর্মে উদ্দীপনা লাভ করবেন, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

প্রথম পরিচয়েই মোহিতচন্দ্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'মোহিতবাবুকে আমি অল্পদিনমাত্র দেখেছি কিন্তু আমার চিত্ত তাকে চিহ্নিত করে নিয়েছে।' বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ উভয়ত। মোহিতচন্দ্র বলেছেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব তাঁর কাছে 'বিধাতার আশীর্বাদ'। রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি অনুরাগে আকর্ষণে তাঁর সরকারী কলেজে অধ্যাপনার মোহ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন, এরূপ একটি সংকল্প কবির সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই মনে মনে পোষণ করে আসছিলেন। গোড়ার দিকে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে সবিনয়ে সসংকোচে বলেছিলেন, 'যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থবোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম।' এই বলে কবির হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখা গেল মোড়কটির মধ্যে হাজার টাকার একখানা

নোট। প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথই বহন করতেন—ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য বাবদ কিছুই নেওয়া হত না। সেই আর্থিক দায়িত্ব যখন রবীন্দ্রনাথের একলার পক্ষে বহন করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠছিল সে সংকট-মুহূর্তে ঐ হাজার টাকার মূল্য অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'এই হাজার টাকার মতো দুর্লভ দুর্মূল্য হাজার টাকা ইহার পূর্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই।' বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সেখানেই সমাপ্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পরে যখন বিদ্যালয়ের কার্যে যোগদান করেন তখন প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতনরূপে।' বলা বাহুল্য, প্রথম দিকে যাঁরা এসে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী বেতন পান নি, পাবার আকাঙ্ক্ষাও রাখেন নি। কাজেই 'অনুপযুক্ত বেতনরূপে' সাধ্যানুযায়ী অর্ঘ্য তাঁরাও নিবেদন করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বহিরঙ্গে শান্তিনিকেতনের জীবন ছিল অতিশয় দরিদ্র কিন্তু সে দারিদ্র্যে কিছুমাত্র দীনতা-বোধ ছিল না। একটি আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমন কিছু মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল যার ফলে সংসারযাত্রার অভাব-বোধ কারো মনেই খুব একটা তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। বড়ো জিনিসকে যদি মূল্য দেওয়া যায় তা হলে সে মূল্য একদিন চতুর্গুণ হয়ে ফিরে আসে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দারিদ্র্য বরণ করে যাঁরা দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের সেবায় জীবন কাটিয়েছেন দেখা গিয়েছে তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় হয় পাণ্ডিত্যচর্চায় না-হয় তো কোনো শিল্পচর্চায় এরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন যে শেষ পর্যন্ত যশ-প্রতিপত্তিতে তো বটেই, আর্থিক দিক থেকেও তাঁরা প্রভূত পরিমাণে লাভবান হয়েছেন।

সতীশচন্দ্র রায় এবং মোহিতচন্দ্র সেন দুজনেরই অতি স্বল্পকালের জীবন, শান্তিনিকেতনে থেকেছেনও অতি অল্পকাল। কিন্তু সেই অল্পদিনেই গুণে কর্মে ত্যাগে নিষ্ঠায় এমন-কিছু তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন যার ফলে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার ইতিহাসেও মোহিতচন্দ্র সেনের একটি স্মরণীয় ভূমিকা আছে। এটি

হল মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ'। কাব্যগ্রন্থের ঐ সংস্করণটি আজ দুষ্প্রাপ্য, তা হলেও রবীন্দ্রকাব্যানুরাগীদের কাছে এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। কাব্যগ্রন্থাদির সম্পাদনায় রচনাসমূহকে কালানুক্রমে সাজানোই সাধারণ নিয়ম। মোহিতচন্দ্র প্রচলিত পথে না গিয়ে সমস্ত কবিতাকে বিষয়ানুক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে সাজিয়েছিলেন। প্রণালীটি কিছু অভিনব নয়। নামজাদা কোনো কোনো ইংরেজ কবির কাব্যগ্রন্থও বিষয়ানুক্রমে সাজানো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গান বিষয়-বিন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছেন। মনে হয় মোহিতচন্দ্রের পরিকল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুমোদন লাভ করেছিল, যদিচ তখনকার দু-একজন সমালোচক এরূপ বিষয়-বিভাগে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কবিতা এবং সংগীতের ন্যায় রসাত্মক জিনিসের নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে তার জাতি ধর্ম নির্ণয় করা বড়ো সহজ কাজ নয়। তবে এ কথাও সত্য যে মোহিতচন্দ্র ঐ সুকঠিন কাজটিতেও অতিশয় সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতার নামকরণও তিনিই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, 'নাম সব সময় বাপে দেয় না, পিতৃবন্ধুও দিয়ে থাকে। অতএব আপনার উপর নামকরণের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম।' কাব্যানুরাগী মোহিতচন্দ্রের রসবোধের উপরে কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কবি এবং সম্পাদকের মধ্যে ঐ সময়ে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পরম নির্ভরতায় মোহিতচন্দ্রের উপরে কাজটির ভার অর্পণ করেছিলেন। মোহিত-বাবু অবশ্য প্রতি পদেই কবির কাছ থেকে উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে মোহিতচন্দ্রের রচিত রবীন্দ্রকাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিও খুবই মূল্যবান।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১০ (১৯০৩) সালে অর্থাৎ মোহিতচন্দ্র এ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার আগে। সরকারী কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিলেন ১৯০৪ সালে। সতীশ রায়ের পরে আবার একজন মনের মতো মানুষ পেয়ে কবি খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। তাঁকে অধ্যক্ষ-

পদে বসিয়ে বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। মোহিতচন্দ্রও পরম উৎসাহে সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ-নির্দেশ তো নিতেনই; তা ছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ ক'রে তিনি নতুন নতুন শিক্ষাপ্রণালী উদ্‌ভাবনে লেগে গেলেন। নিজে প্রচুর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থা একটু অতিমাত্রায় ambitious ধরনের ছিল। ছাত্র শিক্ষক উভয়ের কাছেই তাঁর দাবিটা ছিল অত্যধিক উঁচু। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি মোহিতবাবুর অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। অনেকদিন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, কলেজে যতদিন পড়িয়াছি ততদিন কিছুই শিখি নাই, কলেজ হইতে বাহির হইবার পরে বিদ্যামন্দিরের মধ্যে একটু প্রবেশ লাভ করিয়াছি।...তিনি যে পাঠ্যসূচী তৈরি করিয়াছিলেন তাহা যদি আজ থাকিত তবে দেখিতে পাইতেন যে, সেরূপভাবে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকের কি পরিমাণ বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক।' অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়াও ছেলেদের সকল কর্মকাণ্ডেরই তিনি শরিক ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে বসে গল্প বলতেন।

মোহিতচন্দ্র ভাবুক-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কোনো জিনিসকে খুব বড়ো করে তিনি দেখতে জানতেন। দেশের প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে এবং ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনে শান্তিনিকেতনের একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করতেন। কাজটাকে এত বড়ো ক'রে দেখতে পেরেছিলেন ব'লেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও 'সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল।'

অধ্যাপনা ব্যবস্থাপনা উদ্‌ভাবনা— সমস্তটা মিলিয়ে কাজটা তাঁর পক্ষে একটু গুরুভার হয়ে পড়েছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুন তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হল। কিন্তু সেই যে গেলেন আর তাঁর শান্তিনিকেতনে ফেরা হল না। কয়েক মাস রোগভোগের পর মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর

জীবনান্ত হল। সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মোহিতচন্দ্র সেনের মৃত্যু শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আর-এক নিদারুণ আঘাত। শান্তিনিকেতন হারিয়েছে একজন একনিষ্ঠ সেবক, রবীন্দ্রনাথ হারিয়েছেন একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধের সংখ্যা অগণিত কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মোহিতচন্দ্র ছিলেন সেই বিরল-সংখ্যকের অন্যতম। প্রতিটি পত্রে তাঁকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। আশ্রমের রূপ ও বিকাশের আলোচনায় তাঁকে বলেছেন 'আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু'। মোহিতবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেই দুর্লভ বন্ধুত্বের কথাটাই সব চাইতে বড়ো করে, বেশি করে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চল্লিশ এবং মোহিতচন্দ্রের ত্রিশ অতিক্রান্ত তখন দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে বয়সে আমাদের পুরাতন অনেক জিনিস ঝরিয়া যাইতে থাকে এবং নতুন কোনো জিনিসকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি না, সেই বয়সে কেমন করিয়া হঠাৎ একদা এক রাত্রির অতিথি দেখিতে দেখিতে চিরদিনের আত্মীয় হইয়া উঠে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। মনে হয় আমাদের অন্তরলক্ষ্মী— যিনি আমাদের জীবন-যজ্ঞ নির্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন এই যজ্ঞে কাহাকে তাঁহার কী প্রয়োজন, কে না আসিলে তাঁহার উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না।' অন্যত্র বলেছেন— একদা যাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে তাঁরাই তাঁর প্রকৃত বন্ধু। সে অর্থে মোহিতচন্দ্র তাঁর পরম সুহৃদ। বলেছেন, 'আমার নূতন-স্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্বলতা বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তখন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর-কিছুই হইতে পারিত না। যাহা আমার প্রয়াসের মধ্যে আছে তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগকর্তার পক্ষে এমন বল— এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না।...বিশেষত তখন নানা বিঘ্নে আমার এই কর্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।'

জগদানন্দ রায়

মানুষের জীবনে যেমন প্রতিষ্ঠানের জীবনেও তেমনি দুঃখ আঘাত থাকবেই। শান্তিনিকেতন অনেক দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু দুঃখ-আঘাতেরও মস্ত বড়ো মূল্য আছে। এই যাঁদের কথা বলছিলাম তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান ব্যক্তি কিন্তু প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেবার আগেই তাঁরা চলে গেলেন। তা হলেও তাঁদের জীবনের পুণ্যফলটুকু শান্তিনিকেতন পুরোপুরিই পেয়েছে। ত্যাগে নিষ্ঠায় চরিত্রমহিমায় এঁরা যা দিয়ে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনের জীবনে তা সঞ্চিত হয়ে আছে এবং তাতেই শান্তিনিকেতনের মহিমা অনেকখানি বেড়েছে। এঁদের প্রত্যেককে উদ্দেশ করেই শান্তিনিকেতন বলতে পারে, 'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।'

তবে এ কথাও মানতে হবে যে জীবনবিধাতা কৃপণ নন। এক হাতে নেন আর-এক হাতে দেন। এক দিকে যেমন ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, অপর দিকে তেমনি আবার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও থাকে। এই যখন মৃত্যুদূত একের পর এক আঘাত হানছিল ঠিক তখনই সকলের অলক্ষ্যে এমন একজন মানুষ তৈরি হয়ে উঠছিলেন যাঁকে সর্বতোভাবে আদর্শ শিক্ষক বলা চলে। প্রথম থেকেই তিনি এক হাতে অনেক দিক সামলিয়েছেন। পরে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ পরম নির্ভরতায় এঁর হাতে বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। এই মানুষটি জগদানন্দ রায়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস থেকেই যে-ক'জনার উপরে অধ্যাপনাভার অর্পিত হয়েছিল জগদানন্দ তাঁদের অন্যতম। বাস্তবিক-পক্ষে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে এসে এ দিনটির প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন।

জগদানন্দ রায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আবিষ্কার। তিনি যখন জমিদারি পরিচালনায় নিযুক্ত তখন 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার ভারও তাঁর উপরে ন্যস্ত। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু কিছু লেখা মাঝে মাঝেই তাঁর হাতে আসত; রচয়িতা জনৈকা মহিলা। অতিশয় স্বচ্ছ সরল সুখপাঠ্য ভাষায় লেখা। তখনকার দিনে কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ে এমন সুন্দর আলোচনা সম্ভব ছিল বলে তিনি ভাবতেই পারেন নি। পরে অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলেন যে এগুলোর প্রকৃত লেখক জগদানন্দ রায়। তিনি

তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে লেখা পাঠাতেন। ঐ সূত্রেই জগদানন্দর সঙ্গে পরিচয়। তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা; কবি তাঁকে জমিদারি সেরেস্তার কাজে ডেকে নিলেন। জানতেন এটা তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়। সেজন্যে শিলাইদহে পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্যে তিনি যে একটি গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেরেস্তার কাজের সঙ্গে জগদানন্দকে ঐ বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজেও খানিকটা লাগিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে স্থির হল তখন রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—সেরেস্তার কাজেই থাকবে না কি আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজে যাবে? জগদানন্দবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বলে উঠলেন, জমিদারের নায়েব হবার ইচ্ছে আমার নেই, আপনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই যাব। নিজেই বলেছেন, ঐ দিনটি তাঁর জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় দিন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনটি থেকে ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি একাগ্রচিত্তে বিদ্যালয়ের সেবা করে গিয়েছেন। সেবাই বলতে হবে কারণ তিনি যে কাজ করেছেন তা কেবল মামুলি শিক্ষকতা নয়। শুধু কর্তব্যের খাতিরে এ কাজ হয় না; অন্তরের তাগিদ থাকলে তবেই তা সম্ভব। জগদানন্দ তাঁর কাজে সমস্ত হৃদয়টি ঢেলে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের দেখেছেন আপন সন্তানের ন্যায়, সন্তানজ্ঞানে তাদের ভালোবেসেছেন, সেবা করেছেন। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সঙ্গে থেকেছেন, রান্নাঘরে তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করেছেন, সন্ধ্যাবেলায় বসে ছেলেদের গল্প শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক বলতে ঠিক এমনটিই চেয়েছিলেন। বলেছেন, 'আমার প্রয়োজন ছিল এমন সব লোক যাঁরা সেবাধর্ম গ্রহণ করে এই কাজে নামতে পারবেন, ছাত্রদেরকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মানুষ সহজে মেলে না। জগদানন্দ ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক।'

জগদানন্দবাবু ইস্কুলে ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতেন, তাই বলে তিনি অঙ্কের মাস্টার নন। শিক্ষাব্যবস্থায় এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষকের পরিচয় যদি হয়— ইনি বাংলা বা ইংরেজি, অঙ্ক বা সংস্কৃত কিংবা দর্শন বিজ্ঞানের অধ্যাপক তা হলেই বুঝতে হবে, শিক্ষক হিসাবে তাঁর দৌড় খুব বেশি নয়, দরও খুব উঁচু নয়। যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি

কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন— গোটা মানুষটিই শিক্ষক অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসিখেলা, রুচি-মরজি, তাঁর গুণগ্রাম, তাঁর মুদ্রাদোষ, সমস্ত মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বটি সেটিই তাঁর শিক্ষক চরিত্র। বাংলাদেশে শিক্ষক চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর— সে কি শুধু তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্বগুণে? তিনি সংস্কৃত কলেজে মেঘদূত, কুমারসম্ভব পড়াতেন, না পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতেন সে খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে কর্মে চিন্তায় তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর শিক্ষকজীবনের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষককে নানা গুণে গুণান্বিত হতে হয় নতুবা ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের চোখে তাঁর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। প্রথম যুগে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা সকলেই একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন। কেউ সুলেখক, কেউ সুগায়ক, কেউ কুশলী অভিনেতা, কেউ ওস্তাদ খেলোয়াড়। কেউ ছবি আঁকছেন, কেউ বা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতে আছেন। কথায় বার্তায় সকলেই সুরসিক। কোনো-না-কোনো গুণে প্রত্যেকেই ছেলেদের চোখে 'হিরো' হয়ে বসেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ক্লাসে অঙ্ক পড়িয়েই জগদানন্দ-বাবুর শিক্ষকতার কর্তব্য শেষ হয় নি। ক্লাসের বাইরে ছেলেদের কাছে বিজ্ঞানের গল্প বলেছেন; ইস্কুলে একটা টেলিস্কোপ ছিল, কোনো কোনো দিন রাত্তিরবেলায় সেই টেলিস্কোপের সাহায্যে ছেলেদের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিয়েছেন, অবসর সময়ে ঘরে বসে বিজ্ঞানের বই লিখেছেন, ক্লান্তি বোধ করলে আপন মনে বেহালা বাজিয়েছেন, আবার নাটকের সময় অত্যাশ্চর্য অভিনয় করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শারদোৎসব-এ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয় শান্তিনিকেতনে আজও অভিনয়নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। শিক্ষককে নানান ভূমিকায় দেখলে তবেই তাঁর সহজ 'মানুষী' রূপটি ছাত্রদের চোখে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যে ছাত্ররা ক্লাসে অঙ্কের ভয়ে নির্বাক থাকত তারাই নাট্যমঞ্চে 'লক্ষ্মীপ্যাঁচা বেরিয়েছে রে' বলে চেঁচিয়েছে। যৌথ জীবনের যৌগিক মিশ্রণে শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবধান অনায়াসে ঘুচে যেত। সাধারণ কথাবার্তায়ও জগদানন্দবাবু অতিশয় সুরসিক ছিলেন। তাঁর মুখের অনেক উক্তি শান্তিনিকেতনে এখনো প্রবাদবাক্যের ন্যায় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।

তাঁর সেই আদর্শ শিক্ষকজীবনকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে রীতিমত একটি 'লিজেণ্ড' গড়ে উঠেছে। এ লিজেণ্ড উপকথা বা রূপকথার অলীক কাহিনী নয়; সত্য কাহিনী দিয়ে গড়া। আমি যে লিজেণ্ডের কথা বলছি তার জন্ম সত্যিকারের ভালোবাসা থেকে। যে মানুষকে আমরা যথার্থই ভালোবাসি তাঁর কথাবার্তা, ধরন-ধারণ, নানা দিনের খুঁটিনাটি ঘটনা সবই আমাদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। তাই থেকেই নানা গল্প কাহিনী মুখে মুখে চলতে থাকে। তখনকার দিনের ছাত্রদের কাছে জগদানন্দবাবুর সম্বন্ধে বহু গল্প আমরা শুনেছি। ছেলেরা জগদানন্দবাবুকে খুবই ভয় করত কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার অত্যাচার করতেও ছাড়ত না। মনটি সরস ছিল বলে সে-সব অত্যাচারের কৌতুকটি তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতেন। বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এরূপ একটি অত্যাচার-কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'একবার দোলের দিন রঙ-খেলা শেষ হলেও আমাদের আশ মিটল না, আর কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় নজরে পড়ল মাস্টারমশায় পরিষ্কার কাপড় পরে স্নান সেরে একটা খাটের উপর বারান্দায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। কথাবার্তা নেই, আমরা কয়েকজন বড়ো ছেলে খাটসুদ্ধ তুলে নিয়ে হরিবোল দিতে দিতে একেবারে বাঁধের জলে নিয়ে ফেললুম। তিনি উঠে বসে উত্তম-মধ্যম ধমক দিতে লাগলেন, আমরা সেটা তেমন খেয়াল করলুম না, তাঁর ঠোঁটের এক কোণে একটুখানি হাসির রেখা দেখে মনে হল আমাদের এই ছেলেমানুষিতে তিনিও যেন মজা অনুভব করছেন। শেষে আমরা তাঁকে সেই অবস্থায় রেখে ফিরে যাচ্ছি দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন, "ওটি হবে না, যেমন করে এনেছিস ঠিক তেমনি করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, খাট তোল বলছি!" আমরা আবার খাটখানা কাঁধে করে তাঁকে আশ্রমে যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।'

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'জগদানন্দ ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসতে জানতেন। তাঁর তর্জনের মধ্যেও লুকানো থাকত হাসি।··· আশ্রমের বালকদের প্রতি তাঁর শাসন ছিল বাহ্যিক, স্নেহ ছিল আন্তরিক।' বাইরেটা যেমন রুক্ষ ভেতরটা তেমনি কোমল। যে ছেলেকে কঠিন বাক্যে জর্জরিত করেছেন, যাকে কিলটা চড়টা মেরেছেন তাকেই আবার ডেকে নিয়ে বিস্কুট বা লজেন্স খাইয়েছেন। জগদানন্দবাবুর হাতে মার খাওয়া ছেলেরা একটা

সৌভাগ্য বলে মনে করত। আমাদের সময়ে তনয়বাবুর মধ্যে এর খানিকটা আমরা আবার দেখতে পেয়েছি। বাইরে থেকে দেখে জগদানন্দবাবুকে অনেকে রসকষহীন কাটখোট্টা মানুষ বলে ভুল করতেন। আসলে তিনি মানুষটি ছিলেন সকল রসের রসিক। একবার বসন্তোৎসবে ছেলেরা যখন 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার' গানটির সঙ্গে প্রাণের আনন্দে নাচছিল তখন জগদানন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'আহা, এদের সঙ্গে আমারই যে নাচতে ইচ্ছে করছে।' একি আর রসকষহীন মানুষের কথা!

জগদানন্দবাবু ছেলেদের কাছে বিজ্ঞানের গল্প বলতেন সে কথাই শুধু বলেছি, তিনি যে ছেলেদের জন্যে সতেরো-আঠারোখানা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন সে কথা বলা হয় নি। প্রত্যেকটি বই অতি মনোরম ভঙ্গিতে লেখা। ঠিক যেন গল্প বলে যাচ্ছেন। পড়বার সময় মনে হবে ছাপার অক্ষরগুলো কথা বলছে। এমনিতেও শুনেছি গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সন্ধেবেলায় ছেলেদের নিয়ে যখন গল্প বলতে বসতেন তখন ছেলেরা মাঝে মাঝে বলত, ভূতের গল্প বলুন। বলতেন, বেশ তাই হবে। আগে তবে আলোটা নিবু-নিবু করে দাও। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে, ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকারে তিনি ভূতের গল্প জুড়ে দিতেন, ছেলেদের গায়ে কাঁটা দিত। অদ্ভুত বলবার ভঙ্গি। বিজ্ঞানের কথা যখন আলোচনা করেছেন তখনো এমনি করে গল্পই বলেছেন। তবে এখানে ভঙ্গিটা একটু আলাদা। ওখানে যেমন আলোটা নিবু-নিবু করতে বলেছেন এখানে বলছেন, ভালো করে চোখ মেলে দেখো— শালিখ দুটো ঝগড়া করছে কেন? চড়ুই পাখিটা ব্যস্ত হয়ে কী বলছে? ফিঙেটা কী দেখে অত নাচানাচি করছে? কিংবা এই দেখো পোকা-খেগো গাছ কেমন পোকা ধরে খাচ্ছে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে বলা আবশ্যক যে ঐ গল্প বলার রীতি তাঁর লেখার স্টাইলকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। একে বলা যায়, বলার ঢঙে লেখা। এ সম্পর্কে আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগদানন্দবাবু বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে যে বিজ্ঞানের গল্প বলতেন, তাঁর লেখা বইয়ের মারফত সারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদেরই তিনি সে গল্প শুনিয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি শুধু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন, সমস্ত বাংলাদেশেরই বিজ্ঞান শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সে কাজের মাহাত্ম্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। বলেছেন,

'জ্ঞানের ভোজে এ দেশে তিনিই সব প্রথমে কাঁচা বয়সের পিপাসুদের কাছে বিজ্ঞানের সহজ পথ্য পরিবেশন করেছিলেন।'

শান্তিনিকেতনের ছাত্র না হয়েও পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে বসে আমি তাঁর পরিবেশনের প্রসাদ পেয়েছি। ছেলেবেলায় তাঁর বই পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, অনেক শিখেছি। এ ছাড়া একবার আরো অন্তরঙ্গভাবেই তাঁকে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই সুযোগে সে কথাটাও বলে নিই। আমি যখন খুব ছোটো— এখানকার শিশুবিভাগের ছেলেদের মতো বয়েস— তখন আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। আমার সে বয়সে এমন অত্যাশ্চর্য জিনিস আমি আর দেখি নি। ধূমকেতু ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে খুব একটা কৌতূহল হয়েছিল। আমার পিতা সাধ্যমত ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, ভালো করে জানতে চাও তো শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায় মশায়কে লেখো, তিনি সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আমি অনেক ভেবেচিন্তে আমার আঁকা-বাঁকা অক্ষরে তাঁকে এক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। খুব আশ্চর্যের কথা যে দুদিন যেতে-না-যেতেই চিঠির জবাব এসে গেল। দু পাতা জোড়া লম্বা এক চিঠি। তাতে কী সুন্দর করে যে ধূমকেতুর ইতিবৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন সে কী বলব। চিঠি নয় তো, মনে হয়েছে আমার পাশে বসে ধূমকেতুর গল্প বলে যাচ্ছেন। আমি যে নিতান্তই নাবালক সে তিনি আমার হাতের লেখা দেখেই বুঝেছিলেন কিন্তু তাই বলে আমাকে এতটুকু উপেক্ষা করেন নি। যাঁরা জাত-শিক্ষক তাঁরা ছোটোদের শুধু ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধাও করেন।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি কথা আজ অনেকেই ভুলে বসে আছেন। শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র দেশের জন্য শিক্ষার একটি বিকিরণ-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ঐ উদ্দেশ্যেই বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়কে পালি ভাষার চর্চায় এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত করেছিলেন, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণীসন্ধানে এবং ব্যাখ্যানে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন এবং হরিচরণবাবুকে বাংলাভাষার সুবৃহৎ অভিধান রচনায় নিযুক্ত করেছিলেন। জগদানন্দবাবুর বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞান প্রচারের মূলেও ঐ একই উদ্দেশ্য।

শান্তিনিকেতনে জগদানন্দবাবু শুধু অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা নিয়েই কাটান নি। বিদ্যালয়ের অনেকখানি দায়-দায়িত্ব তাঁকে বরাবর বহন করতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের তখন অনটনের সংসার; শূন্য তহবিলের ঘাটতি পূরণে রবীন্দ্রনাথ যখন বিব্রত, জগদানন্দ তখন ব্যয় সংকোচের উপায় উদ্‌ভাবনে ব্যাপৃত। আশ্রম-পরিবারটিকে একান্তভাবে আপনার মনে করতেন বলে অধ্যাপকরা সকলেই নানাভাবে এর দায়মোচনের চেষ্টা করতেন। তবে তেমন তেমন সংকট-মুহূর্তে জগদানন্দবাবুই ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। জগদানন্দবাবু এককালে বিদ্যালয়ের এবং আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষরূপে কাজ করেছেন। সে কাজ কী অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে। শান্তিনিকেতনে তখন নির্বাচনের দ্বারা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন তার প্রমাণ ঐ চিঠিতে। লিখেছেন, 'আগামী ৭ই পৌষে পুনরায় তোমার রাজ্যাভিষেক হয়, এইটি আমার ইচ্ছা।' শুধু গুরুদেব নন, আশ্রমবাসী সকলের মুখে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যেত। সেই জয়ধ্বনি আজও তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মুখে মুখে প্রচারিত।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। দু-একজন অবশ্যই অসাধারণ ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তির অভাব দেশে তখনো ছিল না, এখনো নেই। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা স্বেচ্ছায় এমন-সব কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাকে হঠকারিতা বলে মনে করবেন। মনে হবে আপন সাধ্যসীমা ভুলে গিয়ে তাঁরা সাধ্যাতীতের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা যেভাবে কাজ করেছেন তাকে একমাত্র সাধনা নামেই অভিহিত করা যায়, মাস-মাহিনার চাকুরে দ্বারা এ-জাতীয় কাজ কখনোই সম্ভব নয়। যে কাজে বহুজনের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্তা অকিঞ্চন, কীর্তি সুমহান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তার তুলনায় কীর্তি বহুগুণে বৃহৎ। বস্তুত তা নয়, কীর্তি কখনো কর্তাকে ছাড়িয়ে যায় না। বাহ্যত যা দৃষ্টিগোচর ছিল না সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। সুবৃহৎ কার্যে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং অভিনিবেশ। বিদ্যাবুদ্ধি তো ছিলই, তদুপরি উক্ত দুই গুণসন্নিপাতে সাধারণ মানুষের দ্বারাও অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য, কারণ এরূপ মানুষ শান্তিনিকেতন নিজ হাতে তৈরি করেছে। আমাদের দেশে স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে; সেটা কেবলমাত্র স্থান-বিশেষের মাটি-জল-হাওয়ার গুণ নয়। সে স্থানই মহৎ যে স্থান মানুষের কাছ থেকে বড়ো কিছু দাবি করতে জানে। দাবি করবার অধিকার সব স্থানের থাকে না। সে অধিকার অর্জন করতে হয়— অর্জন করতে হয় নিজের দান-শক্তির দ্বারা। যে দিতে জানে সেই দাবি করতে জানে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে

শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। শান্তিনিকেতনই দেশকে প্রথম শিখিয়েছে যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাদানের স্থান নয়, বিদ্যাচর্চার স্থান; শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যা-বিকিরণের স্থান। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া বিদ্যা-কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যে সময়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহও এ-সব কথা ভাবে নি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার শৈশবেই সে-সব কথা ভেবেছে এবং সেজন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। শান্তিনিকেতনের স্থান-মাহাত্ম্য বলতে এই অর্থেই বলেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। সেই জোরে তিনি যাঁদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে নিঃসংকোচে সর্বশক্তি নিয়োগের দাবি করতে পেরেছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অপ্রবীণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পর্যন্ত নেই, প্রামাণিক কোনো গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি। এরূপ সুবৃহৎ কাজের জন্যে তাঁর প্রস্তুতি কতখানি সে বিষয়ে সাধারণের মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না; থাকলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এই বিশাল কার্যভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি কথা অনেক সময় আমার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচন অনেকটা যেন শেক্সপীয়ারের প্লট-নির্বাচনের মতো। হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা গল্প পেলেই হল, শেক্সপীয়ার চোখ বুজে তাকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিভাবানের হাতে ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়। অত্যন্ত শীর্ণ বিবর্ণ কাহিনীও রক্তমাংস-অস্থিমজ্জার সংযোগে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, রঙে রসে পূর্ণতা লাভ করেছে, নিষ্প্রাণ কাহিনী প্রাণের স্পন্দনে অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে মূল কাহিনীতে শেক্সপীরীয় ঐশ্বর্যের আভাস মাত্র ছিল না। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একমাত্র শেক্সপীয়ারের কবিদৃষ্টিতেই সেই-সব শীর্ণ কাহিনীর অনুচ্চারিত সম্ভাবনাটুকু ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীকে অধ্যাপনার কাজে ডেকে এনে একজনকে দিয়ে লিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা, আর-একজনকে দিয়ে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিত, সেই মানুষ কালক্রমে বহুভাষাবিদ পণ্ডিতে পরিণত হলেন— ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। ক্ষিতিমোহন সেনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরও জিজ্ঞাসা নতুন পথে প্রবাহিত হল— মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবন সাধনার বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। তিনি দাবি করেছেন, এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করতে গিয়ে এঁদের শক্তি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন, গুরুদেব নিজ হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন, নইলে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলাম, তাও ঠিকমত ব্যবহার করা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না।

রবীন্দ্রনাথ যে চোখ বুজে এঁদের গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চোখ মেলেই করেছিলেন। মানুষ যাচাই করবার বিশেষ একটি রীতি তাঁর ছিল। প্রথমেই দেখে নিতেন দৈনন্দিনের দাবি মিটিয়ে মানুষটির মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা উদ্‌বৃত্তের সাধনা। সংসারের পনেরো-আনা মানুষই আটপৌরে, তাদের দিয়ে নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজটুকু শুধু চলে, বাড়তি কিছু দেবার মতো সম্বল এদের নেই। জমিদারি মহল্লা পরিদর্শন করতে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—দিনে সেরেস্তায় কাজ কর, রাত্রিতে কী কর? হরিচরণ সসংকোচে বলেছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটু সংস্কৃতের চর্চা করেন। একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত আছে। পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে দেখে নিলেন। মানুষ কিভাবে অবসর যাপন করে তাই দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়। যার মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু নেই তার অবসর কাটে না। ঐ সামান্য বাক্যালাপ থেকেই হরিচরণবাবুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারণেই অত্যল্পকালমধ্যে ম্যানেজারের নিকট নির্দেশ এল—তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। কবি

তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' নামে একটি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সহজ প্রণালী উদ্ভাবনই ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল। হরিচরণবাবু আসবার পরে কবি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। অধ্যাপনা-কার্যের অবসরে তিনি কবির নির্দেশমত ঐ পুস্তকরচনা সমাপ্ত করেন।

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেবার পর দু বৎসর অতিক্রান্ত হতে-না-হতেই ৩৭।৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপরপক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাসের শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চায় যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে-কথা আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হল ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুন শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছুকালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় এবং অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান-রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান-সংকলনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসরকাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলা-দেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান-রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটে নি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। মুদ্রণকার্য শুরু

হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায় অভিধান রচনা সম্ভব হল তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেন নি, এই দুঃখটি শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। হরিচরণ-বাবুর করুণ উক্তি, 'যিনি প্রেরণাদাতা, যাঁর অভীষ্ট এই গ্রন্থ তিনি স্বর্গত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি।' কিন্তু হরিচরণবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। বলেছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবননাশের শঙ্কা নাই।' কবিবাক্য মিথ্যা হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয় নি।

পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও প্রায় দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে— অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি। এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে ১৩৩৯ সালে মুদ্রণকার্য শুরু হয়। তিনি নিজেই তার যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্রমশ প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রণব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তিনিকেতনের অনুরাগী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ এক মহাযোগীর জীবন। বাঙালি চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এদিক থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালিজাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয়, লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ষোড়শোপচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে— বিশেষ করে একক চেষ্টায়— কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সাহিত্য অকাদেমীর উদ্যোগে অভিধানের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে; পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একবার পুনর্মার্জনার ব্যবস্থা করে নিলে বোধ করি ভালোই হত। অন্যান্য দেশে এরূপ কার্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিদ্বৎ পরিষৎ অর্থাৎ পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, একক চেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য— বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রত্যেক শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ। এই কার্যে যে শ্রম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই, তাদের কাছে অভিধানের এই অঙ্গটি মহামূল্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি এর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখনো অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ হয় নি। লাইব্রেরিগৃহের একটি অনতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম যুগের কর্মীদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি করে চৌপদী লিখে দিয়েছিলেন। একান্ত মনে কাজে মগ্ন হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত—

কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ! কোন্ গরতে?
বুঝেছি! শব্‌দ-অব্‌ধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে!

কোথায় কোন্ গর্তে বসে হরিচরণ শব্দবারিধি থেকে মুঠো মুঠো 'অর্থ' কুড়োচ্ছেন— বর্ণনার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত আভিধানিকের মূর্তিটি দিব্যি মিলে যেত।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, বয়স পঁচাত্তর উত্তীর্ণ। তখনকার দিনে কে কবে অবসর গ্রহণ করতেন জানবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ অবসর গ্রহণের পরেও তাঁরা পূর্ববৎ নিজ আসনে নিজ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকতেন। কাজের

সঙ্গে মাস-মাহিনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পরেও তাঁকে নিত্য দেখেছি। প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ নিত্যকর্ম ছিল। পথে দেখা হলে ক্ষীণদৃষ্টিবশত সব সময় লোকজন চিনতে পারতেন না। কখনো চিনতে পারলে সস্নেহে কুশলবার্তা জিগ্‌গেস করতেন। বিরানব্বুই বৎসর বয়সে (১৯৫৯ সালে) তিনি দেহরক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ছিল। শেষ বয়সে তাঁকে দেখলে একটি কথা প্রায়ই মনে হত। ইংরেজ ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গিবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করে বলেছিলেন, হঠাৎ মনে হল জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর করবার নেই। মনে খুব একটা অবসাদের ভাব এসেছিল। গিবন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল একান্ত মনে নিযুক্ত ছিলেন, আর হরিচরণবাবু জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অনন্যমনা হয়ে এক কাজে মগ্ন ছিলেন। কর্মাবসানে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে কৌতূহল হত। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও চোদ্দ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। যখনই দেখেছি তাঁকে প্রসন্নচিত্ত বলেই মনে হত। এরূপ সাধক মানুষের মনে কোথাও একটি প্রশান্তি বিরাজ করে। এজন্য সুখে-দুঃখে কখনো তাঁরা বিচলিত হন না।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

অজিতকুমার চক্রবর্তীর নামটি শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে সতীশচন্দ্র রায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। অজিতকুমার অতি অল্প বয়সেই— সতীশচন্দ্রেরও আগে— রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত অজিতবাবুই করে দিয়েছিলেন। কবিতার খাতাসমেত কবি-বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের সুমুখে এনে হাজির করেছিলেন। দুজনেই বালকবয়সী— দুজনের মধ্যে আবার অজিতকুমারই বয়ঃকনিষ্ঠ। এঁদের সম্বন্ধে একটি কথা অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে। দুজনেই অতি অল্পবয়সে গত হয়েছেন কিন্তু কথায় কাজে লেখায় চিন্তায় এঁরা যে পরিণত মনের পরিচয় দিয়েছেন তা ঐ বয়সের পক্ষে রীতিমত বিস্ময়কর। প্রতিভার ছোঁয়াচ না থাকলে শুধু বিদ্যায় বুদ্ধিতে এতখানি হয় না। এ-কথা নিশ্চিত যে এঁরা কোনো দিক থেকেই অন্য দশজনের মতো নন, একেবারেই অনন্য।

সতীশচন্দ্রের ন্যায় অজিতকুমারও বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন বলতে গেলে বালক বয়সে। অতিশয় মেধাবী ছাত্র, অতি অল্প বয়সে— শুনেছি মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন বি. এ. পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রের পরীক্ষক। অজিতকুমারের উত্তরপত্র পরীক্ষা করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সে কথা বলেছিলেন। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে অজিতকুমারও একই সময়ে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের নির্দেশে বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পরীক্ষান্তে সে বাধা দূর হল, অজিতকুমার শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার এবং রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে বাস করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হল। বলা বাহুল্য, তিনি যতখানি লাভবান হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনও ততখানি। ইতিমধ্যে বন্ধু সতীশচন্দ্র গত হয়েছেন। সতীশের অভাবে রবীন্দ্রনাথের মনে এবং শান্তিনিকেতন-জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল অজিতকুমার এসে উৎসাহে উদ্দীপনায়, বিদ্যায় নিষ্ঠায় সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করে

দিলেন। সেই অবসাদগ্রস্ত মুহূর্তে এরূপ একটি প্রাণবন্ত মানুষের যথার্থই প্রয়োজন হয়েছিল।

শিক্ষক মানুষকে শুধু বিদ্বান হলে হয় না তাঁকে গুণবান হতে হয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী নানা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। চমৎকার গান করতেন। উৎসবে ব্যসনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান গাইয়ে। প্রথম দিকের আশ্রম-জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী এবং কাণ্ডারী হিসাবে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে অজিতকুমারও খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারতেন। অভিনেতা হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। তখনকার সকল অভিনয়েই তিনি কোনো-না-কোনো ভূমিকায় নেমেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং 'শারদোৎসব'-এ ঠাকুরদার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা পুরোনো আশ্রমিকদের মুখে এক সময়ে খুব শোনা যেত। 'ফাল্গুনী'র অভিনয়েও তাঁর অংশ ছিল। তখন মেয়েরা নাটকে অংশ নিতেন না; স্ত্রী-ভূমিকায় ছেলেদেরই নামতে হত। 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনার ভূমিকায় অজিতবাবু অতি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

শিক্ষক হিসাবেও অজিতবাবু ছিলেন আদর্শ শিক্ষক— বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের ভাবাদর্শ-মতে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রথমাবধিই 'বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন'। আকারে প্রকারে, আচারে আচরণে কোথাও গতানুগতিকের ছাপ ছিল না। বিদ্যালয়টি তো জন্মাবধি ঘরছাড়া। শিক্ষাদানের কাজটা ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে কোনোদিনই আবদ্ধ ছিল না— ছেলেদের এনে ঘরের মধ্যে ক্লাসের খাঁচায় পোরা হয় নি। ক্লাস বসেছে গাছের তলায়, পথের ধারে। ফলে শিক্ষাদানের কাজটা নিতান্ত পুঁথির পাঁচালি হয় নি, হয়েছে পথের পাঁচালি এবং সেজন্যেই ঢের বেশি জীবন্ত। বিদ্যালয় যেমন গৃহপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, পাঠ-চর্চাও তেমনি নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রমের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। বিশেষ করে অজিতবাবু সব সময়েই বেড়া ডিঙিয়ে চলতেন। পাঠ্যবহির্ভূত বহু জিনিস তিনি ছেলেদের পড়িয়ে দিতেন। এইভাবে ছেলেদের মধ্যে তিনি একটা পড়ার নেশা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। শিখবার জানবার আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়াটা শিক্ষার একটা মস্ত বড়ো অঙ্গ। অজিতবাবুর এই গুণটির কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর

বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত।... তিনি নির্বিচারে ছাত্রদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।' ছেলেদের সাধ্যে না কুলোলেও তিনি তাঁদের সাধ মেটাবার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে বলতেন ছেলেমেয়েরা বুঝবে না বলে কোনো-কিছু থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। যেটুকু বোঝে তাতেই লাভ। সতীশ রায় এবং অজিত চক্রবর্তী দুজনেই এ উপদেশটি মনে রেখেছেন এবং কাজে লাগিয়েছেন।

অজিত চক্রবর্তী ছিলেন মূলত সাহিত্য-প্রেমিক মানুষ। সাহিত্যের প্রতিই তাঁর সর্বাধিক আসক্তি। অধ্যয়ন ছিল অতি বিস্তীর্ণ; দেশ-বিদেশের সাহিত্যে অবাধ সঞ্চরণ। সাহিত্যের রসাস্বাদনে তিনি নিজে যে আনন্দ উপভোগ করতেন তা অপরের মনেও সঞ্চারিত করতে পারতেন। এর ফলে সহকর্মী অধ্যাপকদের মধ্যেও প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের নিয়ে তিনি 'প্রবন্ধপাঠ-সভা' নামে একটি আলোচনাচক্র স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সাহিত্য এবং দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ হত। সাহিত্যের ন্যায় দর্শনেও অজিতবাবুর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে অজিত চক্রবর্তীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আয়ুতে কুলোয় নি বলে খুব বেশি তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি, তথাপি স্বীকার করতে হবে যে বাংলা ভাষায় সু-সম্বদ্ধভাবে রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার সূত্রপাত অজিতকুমারই করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যের অভিনবত্ব প্রথম দিকে বহু পাঠককেই বিভ্রান্ত করেছে, অনেকেই এর রসগ্রহণে সক্ষম হন নি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় এবং ভারতীয় সাধনার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকার দরুন অজিতকুমারের পক্ষে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্র-জীবনদর্শন যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কাব্যপরিক্রমা' নামক ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ দুটিকেই রবীন্দ্র-ভাবনা-লোকে প্রবেশের প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে। আজকের দিনে তাঁর সকল মতামত সকলের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে তা হলেও এ ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বলে স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। এ সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে তাঁর অপর একখানি গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনকে বোঝবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক।

অপর একটি বিষয়েও অজিত চক্রবর্তীর নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ যখন

নিজ কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদের কথা তেমনভাবে ভাবেন নি তখনই অজিতবাবু রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন। এর পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে; মাঝে অজিতকুমার একটি বৃত্তি লাভ করে অধ্যয়নের জন্যে বিলাতে গিয়েছিলেন। বিলাতে থাকতে তিনি বিদেশী বন্ধুদের কাছে সর্বদাই রবীন্দ্রকাব্যের গুণকীর্তন করতেন। তাঁরা যাতে সে কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন এবং তার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হন সে উদ্দেশ্যেই তিনি তর্জমার কাজ শুরু করেছিলেন। অক্সফোর্ডের এক সাহিত্য-মজলিসে কিছু তর্জমা তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যহানির দরুন অবশ্য বেশিদিন তিনি বিলাতে থাকতে পারেন নি; অধ্যয়ন শেষ না করেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। দেশে ফিরে এসেও কিছু কবিতা তর্জমা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন অনুবাদের কাজে হাত দেন তখন অজিতবাবু ঐ কাজ ছেড়ে দেন। তবে তাঁর তর্জমাগুলিও যে বেশ উঁচু দরেরই হয়েছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই অজিতবাবুর কিছু অনুবাদ প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করে রোটেনস্টাইনের হাতে দিয়েছিলেন। রোটেনস্টাইনও উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু ইংরেজ প্রকাশক তখন কবিকৃত অনুবাদ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্যবিধ অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। কবিতা ছাড়াও অজিতবাবু 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার কিছু কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে অনুবাদের কতক কতক অংশ তাঁর *Sadhana* গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথার উল্লেখ করেছেন।

এ-সব ছাড়াও অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজি বাংলায় বেশ কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সে-সব প্রবন্ধ, বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী', 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে বিদেশী কোনো কোনো কবি-দার্শনিক সম্বন্ধেও তাঁর কিছু প্রবন্ধ তখন নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের অন্যতম শেষ কাজ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত প্রণয়ন। এ কাজটি একান্তমনে করবার উদ্দেশ্যে তিনি এক বৎসরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটি সুসম্পন্ন হবার পরেও নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার দরুন তাঁর আর শান্তিনিকেতনের কাজে ফিরে আসা হয় নি।

জীবনের শেষ চারটি বছর তাঁকে শান্তিনিকেতনের বাইরেই কাটাতে হয়েছে যদিচ রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। মহর্ষি-চরিতের কাজ শেষ হবার পরে রামমোহন-জীবনী রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেজন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অজিত-কুমার-রচিত মহর্ষির জীবনী পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ অকপটে বলেছিলেন তিনি 'গভীর শান্তি এবং শক্তি' লাভ করেছেন। সেজন্যে তাঁর রামমোহন-জীবনী রচনার প্রস্তাবেও তিনি উল্লসিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত কাজটি উদ্যোগপর্ব ছাড়িয়ে আর অগ্রসর হতে পারে নি। অকস্মাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে অজিতকুমারের মৃত্যু হয়।

সতীশ রায় এবং মোহিত সেনের পরে অজিতকুমারের অকাল-বিয়োগ রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের পক্ষে আর-এক নিদারুণ আঘাত। মোহিত সেন, সতীশ রায় এবং অজিত চক্রবর্তী অনেক দিক থেকেই সমধর্মী মানুষ ছিলেন। সাহিত্যরসিক হিসাবে তিন জনেই অল্পবিস্তর কবি-কল্পনার অধিকারী ছিলেন। কল্পনাপ্রবণ মন থাকলে তবেই অতি ক্ষুদ্র আরম্ভের মধ্যেও সুবৃহৎ পরিণতির আভাসকে দেখা সম্ভব হয়। সেজন্যেই বিদ্যালয়ের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাবুক-প্রকৃতির মানুষের সন্ধানে ছিলেন। তিনি দেখে খুশি হয়েছিলেন যে এঁরা তাঁর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে তাঁদের ভাবনার মধ্যে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। সতীশ রায় এবং মোহিত সেনকে কবি অতি অল্পদিনই কাছে পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার বৎসরকাল পরেই দুজনের মৃত্যু। অজিত চক্রবর্তীও এঁদের মতোই স্বল্পায়ু, অতি অল্প বয়সেই চিরবিদায় নিয়েছেন। তা হলেও আদর্শ-বাদী এই যুবকটিকে অন্তত কয়েকটি বছর রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে কাছে পেয়েছিলেন। আলাপে আলোচনায়, চিঠিপত্রে এঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে; বিদ্যালয়ের রূপায়ণে অজিতকুমারের কাছ থেকে মূল্যবান সহযোগিতা লাভ করেছেন। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে 'আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে একজন নিপুণ স্থপতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যে বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিটিকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গ্রন্থটিতে। শিশু প্রতিষ্ঠানটির

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সেদিন (১৯১১ সালে) যে-সব কথা বলেছিলেন আজকের দিনে তা অত্যন্ত চমকপ্রদ বলে মনে হবে, 'এই আশ্রমে আজ আমাদের কতটুকু জ্ঞানানুশীলন প্রকাশ পাইল! কিছুই নয়। কিন্তু এক-দিন এমন হইবে যে, এখানে দেশবিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে—যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্য লাভ করিবে। সাহিত্য চিত্র সংগীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানেই ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এদেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত, এইখানেই সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।... এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্যসকল উদ্ধার করিবেন, উদ্ভাবনীশক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্ভাবন করিবেন।'

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদি যুগে যখন এটিকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং তপোবন-বিদ্যালয় হিসাবে দেখা হত তখন যাঁরা শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি সব চাইতে নিষ্ঠাবান ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। বিদ্যালয়ের আদি পরিকল্পনাটি যদিচ রবীন্দ্রনাথের এবং ব্রহ্মবান্ধবের মিলিত প্রয়াসে উদ্‌ভূত, তা হলেও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনের সেই যাত্রাপথ থেকে ক্রমাগতই সরে সরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি; কবির সৃজনশীল মন কখনো নাক-বরাবর বাঁধা পথে চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাচীন ভারতের যে আদর্শকে মূলমন্ত্র করে ব্রহ্মবান্ধব কাজ শুরু করেছিলেন, সতীশ রায় বা অজিত চক্রবর্তী তাঁদের সাহিত্যরসিক মন নিয়ে, জগদানন্দ রায় তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং মোহিত সেন তাঁর আধুনিক মন নিয়ে সেটিকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিদ্যালয়ের সাত্ত্বিক চরিত্রের চাইতে সাংস্কৃতিক চরিত্রের প্রতিই তাঁদের লক্ষ্য থাকত বেশি। এ কথা ঠিক যে গোড়ার দিকের শিক্ষকদের মধ্যে ভাবগত আদর্শের দিক থেকে যাঁকে ব্রহ্মবান্ধবের সব চাইতে কাছের মানুষ বলা যায় তিনি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, যদিচ সান্যাল-মশায় আসবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রহ্মবান্ধবের ন্যায় ভূপেন্দ্রনাথও স্বদেশবৎসল মানুষ ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসবার আগে তিনি ভাগলপুরে একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান করেছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে তখনো স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লাগে নি, বিদেশী বর্জনের প্রশ্ন ওঠে নি। ব্রহ্মবান্ধবের মতো তিনি যে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি, তার কারণ তাঁর টান নীতিধর্মের প্রতি যতখানি ছিল, রাজনীতির প্রতি ততখানি ছিল না।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একবার তিনি জোড়াসাঁকো গৃহে মহর্ষি সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথকে সেখানে দেখেছেন কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের

সুযোগ হয় নি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই তাঁকে একবার শান্তিনিকেতনে যেতে হয়েছিল। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশ্রম-বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে চলে যায় এবং পরে আর তার ফিরে আসা হয় নি। সান্যালমশায় এসেছিলেন তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। শালবীথিতে একা পায়চারি করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের আগ্রহ আগে থেকেই ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী পাঠক, কবির সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল প্রচুর। এখন তাঁকে চোখের সুমুখে দেখে গভীর আগ্রহে এগিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিতেই দেখা গেল আগেই শ্রীশবাবুর মুখে রবীন্দ্রনাথ একজন আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে ভূপেনবাবুর সুখ্যাতি শুনেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদ্যালয়ের জন্য সর্বক্ষণ আদর্শনিষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তির সন্ধানে থাকতেন। প্রথম দর্শনেই মানুষটিকে খাঁটি বলে মনে হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের কথাবার্তা হল। রবীন্দ্রনাথ ভূপেনবাবুকে বললেন— আপনি এসে আমাদের বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিন-না। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে তিনি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, তেমনি পুলকিতও হলেন। কারণ এরূপ একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প তাঁর নিজের মনেও ছিল। ভাবলেন, মন্দ কি, এ আশ্রম-বিদ্যালয় যখন একই উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত তখন আমার কাজের হাতে-খড়ি এখানেই হোক। কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানিয়ে স্বগৃহে চলে গেলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এসে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন। মনের মতো কাজ পেয়ে খুব খুশি। স্থানটিও তাঁর কাছে অতিশয় মনোরম মনে হল। যথার্থই তপোবন-সদৃশ। ছেলেরা হলুদ রঙের আলখাল্লা পরে খালি পায়ে চলা-ফেরা করছে, গাছের তলায় বসে পাঠ অভ্যাস করছে দেখে তাঁর চোখ জুড়িয়েছে। ছেলেদের প্রাত্যহিক কার্যক্রমটিও যেন তপোবন-জীবনের সঙ্গে তাল রেখে রচিত। ভূপেনবাবু নিজেই বলেছেন, 'আমার অনেকদিনের আশা যেন ফলবতী হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। বালকদিগের স্নান উপাসনা প্রাতরাশ, আপন আপন বিছানাগুলিকে রৌদ্রে দেওয়া, নিজ নিজ স্থানটি পরিষ্কার করিয়া রাখা, শিক্ষকের নিকট তরুতলে বসিয়া পাঠ গ্রহণ করা, মধ্যাহ্নভোজন, খেলা এবং এক-একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড লইয়া তাহাতে বৃক্ষাদি

রোপণ, জল সিঞ্চন, রাত্রে সংগীতাদি সমস্তই ঘড়ি-ধরা নিয়মে চলিত। সকল সময়েই শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।’

ভূপেন্দ্রনাথ অতিশয় স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন; ছেলেদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। পুরোনো দিনের ছাত্ররাই বলেছেন, অসুখে-বিসুখে তিনি মায়ের মতো তাঁদের যত্ন করতেন। খোস-পাঁচড়া হলে নিজের হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিমপাতা এবং নারকেল তেল গরম করে লাগিয়ে দিতেন।

দুরন্ত ছেলেরাও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হত না, বরং স্নেহের ভাগটা তারাই একটু বেশি পরিমাণে পেত। পুরোনোদের মুখে শুনেছি যে একটি অতিমাত্রায় দুরন্ত ছেলে সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাকে সামলানোই দায় হয়ে উঠেছিল। তাকে এখানে রেখে কোনো লাভ হবে না, কাজেই বাড়িতে বাপ-মায়ের কাছে ফেরত পাঠাবার কথা ভাবা হচ্ছিল। ভূপেনবাবু বললেন— ছেলেটিকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাই করা হল। শুধু স্নেহ-ভালোবাসার দ্বারা তিনি সেই দুরন্ত ছেলেকে সম্পূর্ণ বশে এনেছিলেন। দু-তিন মাসের মধ্যেই তার স্বভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হল। শুনেছি পরে ঐ বালকটি বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। দুরন্তপনার জন্য কোনো ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথও পছন্দ করতেন না। বরাবরই বলেছেন— ছেলে মানুষ করতে হলে অসীম ধৈর্য এবং স্নেহ-মমতার প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষকজনোচিত ঐ-সব গুণের দরুন ভূপেনবাবু অল্পদিনেই রবীন্দ্রনাথের আস্থা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

মোহিত সেন যখন অসুস্থ হয়ে চলে যান তখন বিদ্যালয় পরিচালনার প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন। ভূপেনবাবুকে জরুরি তাগিদ দিয়ে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। বললেন— আপনাকেই এখন বিদ্যালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ভূপেন্দ্রনাথ এরূপ অনুরোধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না; বিনীতভাবে বললেন— তিনি নিজেকে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য বলে মনে করেন না। বিশেষ করে তখনো তিনি এ কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন— কাজ করতে করতেই কাজ সহজ হয়ে আসে। এই সূত্রে আর-একটি কথাও বলেছিলেন; বলেছিলেন, ‘আমার এখন প্রয়োজন একজন খাঁটি মানুষের।

বিদ্যা কেনা যায় কিন্তু মানুষ তো কেনা যায় না।' ভূপেন্দ্রনাথের উপরে তাঁর কতখানি আস্থা ছিল ঐ একটি কথাতেই তার প্রমাণ।

ভূপেনবাবু হিসাব-কিতাবের ব্যাপারে বড়ো পটু ছিলেন না, প্রায়ই ভুলচুক হত। একবার বেশ একটি কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছিল। ইস্কুলের টাকা-পয়সা ভূপেনবাবুর তত্ত্বাবধানে একটি লোহার সিন্দুকে থাকত। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব টাকাপয়সাও সেখানেই রাখা হত। একবার একখানা হাজার টাকার নোট ঐ সিন্দুকে রাখতে দিয়েছিলেন। একদিন প্রয়োজন হওয়াতে শ-খানেক টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ভূপেনবাবু ভুল করে একশো টাকার নোটের পরিবর্তে হাজার টাকার নোটখানাই পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে এসে হাজার টাকার নোটখানা চেয়ে বসলেন। ভূপেনবাবু সিন্দুক খুলে নোটটি আর খুঁজে পান না। মাথায় বজ্রাঘাত; তাঁর হতভম্ব অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে নোটখানা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন— আর-একটু সাবধান হতে হবে নইলে কোন্‌দিন আবার বিপদে পড়বেন।

ভূপেনবাবু বিদ্যালয় পরিচালনা খুব যোগ্যতার সঙ্গেই করেছিলেন। দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে কোনোপ্রকারে বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। ঐ সংকটকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হত। তিনিও আর পেরে উঠছিলেন না। ভূপেনবাবুকে বলেছিলেন— আপনার হাতে প্রতি মাসে পাঁচশোটি করে টাকা দেব। ঐ টাকাতেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল না। ছাত্র শিক্ষক ঠাকুর চাকর সব মিলিয়ে সাতাশ-আঠাশ জন হবে। অধ্যাপকদের বেতনসমেত বিদ্যালয়ের সমস্ত সংসারটি ঐ টাকার মধ্যেই চালিয়ে নিতেন। নিজেরা অভাবে থেকেছেন কিন্তু ছাত্রদের কোনো অযত্ন হয় নি। বিদ্যালয় সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রাদি অতিশয় মূল্যবান। মূল্যবান এই কারণে যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি এবং শিল্পী বলেই জানি কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারটি নিয়েও কতখানি ভাবতেন, কত সময় ব্যয় করতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি: 'তীব্র শীতের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময় ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষ সতর্ক হইবেন। স্নানের সময় আপনারা কেউ উপস্থিত থাকিয়া দেখিবেন যে স্নানের সময় তেল মাখিতে জল

ঢালিতে কেহ অনাবশ্যক বিলম্ব না করে। তেলটা খোলা হাওয়ায় না মাখিয়া ঘরে মাখিলেই ভালো হয়— সেই সময় ভালো করিয়া যেন গা ঘষে। এমন করিয়া গা ঘষা আবশ্যক যাহাতে কিছু পরিশ্রম ও শরীরে উত্তাপ সঞ্চার হয়। তাহার পরে দ্রুত আসিয়া জল ঢালিয়া খসখসে তোয়ালে দিয়া যেন গা বেশ করিয়া ঘষিয়া ফেলে। স্নানের পর ঠাণ্ডা লাগানো কোনোমতেই হিতকর নহে।… ছেলেদের সর্দি হইলেই রাত্রে পায়ের তেলোয় গরম সর্ষের তেল মালিশ করানো উচিত।' এই রবীন্দ্রনাথকে বুঝলে তবে শান্তিনিকেতনকে বোঝা যাবে; আবার শান্তিনিকেতনকে বুঝলে তবে রবীন্দ্রনাথকে।

ভূপেনবাবু যখন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক দুর্যোগে বিব্রত, বিদ্যালয় অর্থাভাবে বিপন্ন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে শান্তিনিকেতনে থাকতে পারতেন না কিন্তু ভূপেনবাবু বলেছেন, যেখানেই থাকতেন মনটি পড়ে থাকত শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টিতে এবং ভূপেন্দ্রনাথের শ্রমে যত্নে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। ছাত্রসংখ্যা বাড়ল, নতুন কয়েকজন অধ্যাপকও এলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ভূপেনবাবুই এখানে আনিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ক্ষিতিমোহন সেন এসে কাজে যোগ দিলেন। এক সময়ে ভূপেনবাবু কাশীতে ছিলেন। এঁদের দুজনের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে বোধ করি একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল।

ভূপেনবাবুর জীবনটি ছিল অতিশয় সরল, সংযত। নিরামিষভোজী ছিলেন, তাও স্বপাক। একে কঠিন পরিশ্রম, শরীরটিও খুব মজবুত ছিল না, মাঝে মাঝে কঠিন পীড়ায় ভুগেছেন কিন্তু স্বপাক থেকে তাঁকে নিরস্ত করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন— স্বপাকের দরুনই আপনাকে আবার বিপাকে পড়তে হবে। কিন্তু উপদেশে কোনো ফল হয় নি বরং উলটোটি হয়েছে; নিজের হাতে পরিপাটি রান্না করে রবীন্দ্রনাথকে খাইয়েছেন।

দুজনের মধ্যে খুব একটি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভূপেনবাবুর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কিছুদিন শিলাইদহে তাঁর বোটে নিয়ে রেখেছিলেন। আর-একবার তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছিলেন বর্ধমানে। রবীন্দ্রনাথ বর্ধমানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন। চিকিৎসার যাতে ত্রুটি না হয় সেজন্যে ভূপেনবাবুর মায়ের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে এসেছিলেন।

নিজের বিপদে আপদে রবীন্দ্রনাথও ভূপেনবাবুকে প্রধান সহায় বলে মনে করতেন। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ যখন মুঙ্গেরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ ভূপেনবাবুকে শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন— আমি মুঙ্গেরে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আপনিও অবিলম্বে সেখানে চলে আসুন। ভূপেনবাবু তারবার্তা পেয়েই রওনা হয়ে গেলেন। দুজনেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। শেষকৃত্যাদির ব্যবস্থাও ভূপেনবাবুই সব করেছিলেন। সব সাঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভূপেনবাবু সমস্ত ঘটনাটির একটি বিবরণ দিয়েছেন। নিদারুণ দুঃখের মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথের অবিচলিত স্থৈর্য এবং ধৈর্যের বর্ণনাটি যথার্থই বিস্ময়কর।

ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় সাত বৎসর কাল বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে এবং অধ্যক্ষ হিসাবে খুবই যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। নিজে একটি আশ্রম স্থাপন করবেন, সে সংকল্প তিনি ত্যাগ করেন নি। বোধ করি সে তাগিদেই তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তা ছাড়া বলতে বাধা নেই, তিনি নানা দিক থেকেই একটু প্রাচীনপন্থী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত যে-সব পরিবর্তন সাধন করেছেন তার সঙ্গে তিনি নিজেকে কোনো-মতেই খাপ খাওয়াতে পারতেন না। ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। পরে তো আরো কত রকম পরিবর্তনই হয়েছে। তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সে-সবকে মেলানো কঠিন হত। কাজেই চলে গিয়ে ভালোই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ বা মনোমালিন্যের কোনো কারণ ঘটে নি। চলে যাবার পরেও দুজনের মধ্যে পত্রালাপ, যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে। দুজনেই একে অন্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর সংকল্প অনুযায়ী ভাগলপুরের নিকটে মন্দার নামক স্থানে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যোগসাধনা করেছেন এবং যোগাচার্য হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী

আমরা শান্তিনিকেতনে এসেছি পড়ন্ত বেলায়। তখন রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন। কিন্তু অস্তরবির শেষ আভায় শান্তিনিকেতনের জীবন তখনো স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। শান্তিনিকেতনের সেই ঝলমলে রূপটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

আদিপর্বে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই তখন গত। যে-ক'জন তখনো আছেন তাঁদের মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নন্দলাল বসু প্রধান। শাস্ত্রীমশায়ও মাঝে চলে গিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ নিয়ে। সেখানকার কর্মকাল শেষ করে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

কাশীর টোলে শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রচুর পাণ্ডিত্য নিয়ে অল্প বয়সেই বিধুশেখর ভট্টাচার্য এসেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে। এখানে আসবার আগেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় একাধিক কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত শ্লোক রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। প্রথম যেদিন শান্তিনিকেতনে এলেন সেদিন চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে শান্তিনিকেতনের মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে স্বরচিত শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। বহুকাল পরেও সেদিনকার কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো সকৌতুকে সে কাহিনী অন্যদের কাছে বলতেন।

বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ে যখনই যিনি এখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর মনের প্রবণতাটি বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। এ সেই উদ্‌বৃত্তের সন্ধান। মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। কার মধ্যে কতখানি সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে তার খানিকটা আঁচ করে নিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী নিত্যকার অধ্যাপনাকার্যের বাইরে কোনো-না-কোনো কাজে লিপ্ত করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রতি ক্ষেত্রেই আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছেন।

এদিকে শান্তিনিকেতনে আসবার পরে শাস্ত্রীমশায়ের মনে হল তিনি শুধু সংস্কৃত বিদ্যারই চর্চা করেছেন ; এ যুগের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ না করলে দেশকালের সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারবেন না। এই ভেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু

পরীক্ষায় ফেল করে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। বললেন— খুব ভাগ্যি যে ফেল করেছেন, আপনার একটা মস্ত বড়ো ফাঁড়া কেটে গেল। পাস করলেই আপনি এফ. এ., বি. এ., এম. এ. পাস করবার চেষ্টায় গতানুগতিক পথে চলতে গিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ করে ফেলতেন। আপনি যে মানুষটি সাধারণ নন, সে কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। পরীক্ষা পাসের চাইতে ঢের বড়ো কাজ আপনার মুখ চেয়ে বসে আছে। রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনেই বুঝে নিয়েছিলেন যে বিধুশেখর শুধুই পুরোনো ধাঁচের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন, তিনি অতিশয় জিজ্ঞাসু প্রকৃতির মানুষ এবং বহু বিষয়ে তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসা। তাঁর ঐ গুণটিকে কিভাবে সার্থক উদ্যোগে, সফল অনুশীলনে নিয়োগ করা যায় তাই নিয়ে আগে থেকেই ভাবছিলেন। এবারে বললেন— আপনার কাজের অন্ত কি ? আমাদের দেশে বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি একটা মস্ত বড়ো জিনিস। এর মূল গ্রন্থাদি এবং বুদ্ধের বাণী বহুলাংশে লেখা পালি ভাষায়। দেশে আজ পালি ভাষার চর্চা নেই। আপনি পালি ভাষা শিখে নিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির লুপ্তরত্নাদি উদ্ধার করে দিন। শুরু হল বিধুশেখরের পালি শিক্ষা ; সে ভাষায় এতখানি অধিকার লাভ করলেন যে পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করে দিয়ে দেশে পালি-চর্চার পথ সুগম করে দিলেন। সেইসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের চর্চাও চলতে লাগল।

এক সময়ে শাস্ত্রীমশায়ের মনে হল পুরোনো দিনের টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা আজকের দিনে আর চলবে না, আবার বর্তমানে যে ইংরেজি শিক্ষার চল হয়েছে সেটাও পশ্চিমের নকলনবিশির দরুন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে। এ দুয়ের মিলনে যদি একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তা হলে তার মধ্যে কিছু সারবস্তু হয়তো দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্থির করলেন তিনি তাঁর দেশ মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে চলে যাবেন এবং সেখানে একটি মডার্ন চতুষ্পাঠী স্থাপন করবেন। চলে গিয়েছিলেনও, কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির দরুন সেটি তিনি করে উঠতে পারেন নি এবং সে কারণে অত্যন্ত মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন— আপনি এখানেই চলে আসুন। আপনি যা করতে চাইছেন তা এখানেই হবে।

কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। এর

অনতিকাল পরেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল। বিধুশেখর অতি ক্ষুদ্রাকারে আপন সাধ্য-সীমার মধ্যে যা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই ব্যাপকতর উদ্দেশ্যে বৃহত্তর ভূমিকায় স্থাপন করলেন। / বিশ্বভারতীর উচ্চতম শিক্ষা এবং গবেষণা বিভাগ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হলেন শাস্ত্রীমশায়। / বৌদ্ধ দর্শন এবং সংস্কৃতি চর্চা তখনো অব্যাহত। তিনি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন যে বৌদ্ধ দর্শনের কিছু কিছু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে কিন্তু চীনা এবং তিব্বতী ভাষায় সে-সব গ্রন্থের অনুবাদ বর্তমান। শাস্ত্রীমশায় প্রস্তাব করেন যে বিশ্বভারতীতে তিব্বতী এবং চীনা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দিত হন এবং দারুণ অর্থাভাব সত্ত্বেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হলেন। অচিরে চার হাজার টাকা ব্যয়ে প্রাচীন তিব্বতী সাহিত্যের কিছু মূল্যবান পুঁথি কেনা হল। শুরু হল বিধুশেখরের তিব্বতী-চর্চা। চীনা ভাষা ও চীন সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে চীনভবনও পরে স্থাপিত হল। শান্তিনিকেতনে অবস্থানের শেষ ক'টি বছর তিনি চীনভবনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা সূত্রে জরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর ঔৎসুক্য জন্মে। বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাচীন পারসীক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শাস্ত্রীমশায় নিজের আগ্রহে জেন্দ্ ভাষা শিখে নিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্-আবেস্তা পাঠ করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এসে জরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে সময়ে শাস্ত্রী-মশায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আবেস্তা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা অতিশয় বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে তিনি ইংরেজি সমেত কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন এবং বহু ভাষাবিদ রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। শুধু ভাষা শিক্ষা করেই নিবৃত্ত হন নি; এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশবিদেশের কত জ্ঞানীগুণী এসে শান্তিনিকেতনে জড়ো হলেন। এলেন সিলভাঁ লেভি, কর্মিকি, তুচ্চি; এলেন উইনটারনিজ, লেজনি, স্টেন কোনো; এলেন কলিন্স, বেনোয়া,

যোগদানও। এ ছাড়া পল্লী-সংগঠনের কাজে সবে এসে যোগ দিয়েছেন এল্‌মহার্স্ট। আর তো ঘরেই ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু। অ্যাণ্ড্রুজের নামও এঁদের সঙ্গেই করা উচিত কারণ তিনিও আমাদের ঘরের লোক। জ্ঞানে গুণে এঁরাও কেউ কম নন, বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে চলেছেন। এমন বিদ্বজ্জন সমাবেশ ইতিপূর্বে এদেশীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় নি; বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাকেও হার মানিয়েছিল বলতে হবে। সেই গিয়েছে বিশ্বভারতীর এক যুগ। বিদ্যাচর্চার উৎসাহে উদ্দীপনায় যেন এক মহোৎসব লেগে গিয়েছিল। বিদ্যাভবনের অল্প-সংখ্যক ছাত্রসমেত এখানকার অধ্যাপকরা সকলেই নিজ নিজ অবকাশ-মতো বিশ্বভারতীর ক্লাসসমূহে উপস্থিত থাকতেন; অর্থাৎ বিদ্যাদানে যাঁরা রত তাঁরাও ছিলেন বিদ্যার্থী। তখনকার দিনের তোলা ছবিতে দেখা যায় অন্যান্যদের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অধ্যাপক লেভির ক্লাসে বসে তাঁর লেকচার শুনছেন, অপর এক ছবিতে আবার লেভিসাহেব রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখছেন।

সেদিনের সেই সুবৃহৎ আয়োজনে এখানকার সকলে তো লাভবান হয়েছেনই. তা ছাড়া কলকাতা থেকেও কিছু বিদ্যোৎসাহী যুবক এসে এ-সব ক্লাসে যোগ দিতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁদের অন্যতম। পরে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে বৃত হয়েছিলেন। সেদিনকার বিদ্বৎমহোৎসবে সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী নিজে। মানুষটি যেন শতদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠলেন। বিদেশী পণ্ডিতবর্গের সাহচর্যে এবং তাঁদের সঙ্গে নিত্য আলোচনায় নানাবিধ ভাষায় এবং বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বিদেশী পণ্ডিতরা একে একে চলে যাবার পরেও শাস্ত্রীমশায় তাঁর জ্ঞানানুশীলনে পূর্ববৎ নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন— অধিকাংশ বৌদ্ধদর্শন-সম্পর্কিত। পূর্বোল্লিখিত তিব্বতী গ্রন্থাদি থেকে বহু লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আর্যদেব-কৃত 'চতুঃশতক' নামক লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থটি তিনি তিব্বতী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। পরে এ দেশেই উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থের কতক অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। শাস্ত্রীমশায়ের সংস্কৃত অনুবাদের সঙ্গে মূল গ্রন্থের ভাষার আশ্চর্য মিল লক্ষ করে দেশের পণ্ডিত সমাজ অতিশয় বিস্মিত হয়েছিলেন। নাগার্জুন-কৃত 'মহাযান-বিংশক' গ্রন্থটিও তিনি এভাবে তিব্বতী থেকে সংস্কৃতে

রূপান্তরিত করেছিলেন। এর সঙ্গে নিজকৃত একটি ইংরেজি অনুবাদও দিয়েছেন। এ ছাড়া উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা এবং ভাষ্য রচনা করেছেন। এ-সব টীকা-ভাষ্য কোনো ক্ষেত্রে বাংলায়, কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় রচিত।

ততদিনে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রচারিত হয়েছে এবং তিনি ইংরেজ সরকার -কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। শান্তি-নিকেতন উপাধি-ব্যাধিতে বিশ্বাস করে না। এখানে তাঁর নামের সঙ্গে মহা-মহোপাধ্যায় কথাটির ব্যবহার কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলেছিলেন— আমরা আপনাকে পোশাকী নামে না ডেকে আটপৌরে শাস্ত্রী-মশাই বলেই ডাকব।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা প্রদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল— 'The Basic Concepts of Buddhism'। এই বক্তৃতামালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তিনি কিছুকালের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেছিলেন।

বিধুশেখর নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ প্রতিভার বিকাশ যে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এবং নির্দেশনা -গুণেই সম্ভব হয়েছে এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শান্তিনিকেতনে এসেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন, সেজন্যে শান্তিনিকেতনের প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ ছিলেন। বলেছেন— শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রাজার হালে। টাকাকড়ি কম ছিল কিন্তু অভাব ছিল না কোনো। আসল কথা অভাব থাকলেও তাঁরা তাকে অভাব ব'লে গণ্য করেন নি, আর, সব চাইতে যা বড়ো কথা, বলেছেন— একদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ— এই হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী আর্যভূমিতে বাস করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে ঐ দুই মহাপুরুষেরই অকৃত্রিম প্রীতি এবং শ্রদ্ধা লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু শাস্ত্রাদি বিষয়ে মনে কোনো প্রশ্নের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রীমশায়কে ডেকে পাঠাতেন। এমনিতেও নানা তত্ত্বের আলোচনায় একে অন্যের সান্নিধ্যে অতিশয় আনন্দ পেতেন যদিচ

বয়সের ব্যবধান ছিল দুরতিক্রম্য। বিধুশেখরের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল যে প্রকৃতপক্ষে নাতির বয়সী হলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে সমবয়স্কের মতোই দেখতেন। তাঁর লেখায় এক স্থানে বিধুশেখর নামের পূর্বে বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, 'নিখিল শাস্ত্র পারাবারের অগস্ত্য-মুনি'— অর্থাৎ কিনা অগস্ত্যমুনি যেমন এক চুমুকে সমুদ্র পান করেছিলেন ইনিও তেমনি শাস্ত্র-বারিধি নিঃশেষে পান করেছেন এবং সমস্ত শাস্ত্রের উপরে তাঁর পূর্ণ অধিকার জন্মেছে। পূর্বে যে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত চৌপদীর কথা বলেছি তাতে বিধুশেখরকে তিনি প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ে বসিয়েছেন। বলেছেন, বিধু এবং রবি শান্তিনিকেতনের চন্দ্র আর সূর্য। দিবারাত্রির অতন্দ্রপ্রহরী। নিজেরা জেগে আছেন, সকলের মনকে জাগিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক অংশটুকু— প্রথমে বেদগান, পরে বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যান— সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্নাতকদের উদ্দেশ করে মাতৃদেবঃ ভব পিতৃদেবঃ ভব ইত্যাদি যে উপদেশবাক্য উচ্চারিত হয় তাও শাস্ত্রীমশায়-কর্তৃক উপনিষদ থেকে সংগৃহীত। বিশ্বভারতীর আদর্শ-পরিচিতি-সূচক 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাক্যটিও শাস্ত্রীমশায়ের সংগ্রহ। আদর্শ ব্যাখ্যানের বাকি অংশটুকু তাঁর স্বরচিত। এক কথায় সমস্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতিটিই শাস্ত্রীমশায়ের দ্বারা পরিকল্পিত। সমাবর্তন উৎসব ছাড়াও শান্তিনিকেতনের অন্যান্য উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনায় শাস্ত্রীমশায় হাত মিলিয়েছেন ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে।

বহুকাল পরে আমরা তাঁকে শেষবারের মতো দেখেছিলাম এই সমাবর্তন উৎসবেই। বয়স তখন প্রায় আশি। বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। সেদিনকার উৎসব-প্রাঙ্গণে বসে তাঁর নিজ-পরিকল্পিত উৎসবের রাজসিক মূর্তি দেখে বোধ করি তিনি একটু বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন— নিজ বাসভূমে নিজেকে হয়তো পরবাসী বলেই মনে হয়েছিল। কারণ পরে এক সময়ে বলেছিলেন, 'টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে, বিশ্বভারতী হয় না। ওখানে বিপদ দেখা দিয়েছে সম্পদের আকারে।'

ক্ষিতিমোহন সেন

ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী দুজনেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বেদ উপনিষদ শাস্ত্রাদিতে দুজনেরই সমান অধিকার। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেরও উভয়েই ছিলেন রসজ্ঞ সমজদার। শান্তিনিকেতনে আগমনের পরে উভয়েরই অনুসন্ধিৎসা নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে; পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছে।

শাস্ত্রীমশায়ের ন্যায় ক্ষিতিমোহনবাবুরও শিক্ষা কাশীতে। সেখানে তাঁরা দুজন ছিলেন সহপাঠী, শান্তিনিকেতনে এসে হলেন সহকর্মী, বিদ্যালয়ের কাজে দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী, আলাপে আলোচনায় তাঁর নিত্যসহচর, বিশ্বভারতীর গুণীজনসভায় প্রধান সভাসদ। শান্তিনিকেতনের জীবনে এই দুই প্রতিভাবানের দান অপরিমেয়। অবশ্য বিনয় করে দুজনেই বলতেন— আমরা কিছুই নয়, সামান্য যেটুকু করেছি তা গুরুদেবের উপদেশ-নির্দেশের বলেই করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষিতিমোহনবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ, আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের হাতে ধ'রে গড়ে পিটে তৈরি করে নিয়েছেন।' তিনি যে যথার্থই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এই বিনয় ভাষণই তার প্রমাণ। ক্ষিতিমোহনবাবু মাটির তাল নন, সোনার তাল। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহ্নিস্পর্শে সে স্বর্ণাভা উজ্জ্বলতর হয়েছে; এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কারণ প্রতিভাবান মানুষরাও যে সকলেই প্রতিভার দিক নির্ণয় এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সক্ষম হন এমন নয়। সেই দিক নির্ণয়ের কাজটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা তিনিই আবিষ্কার করেছেন এবং প্রতিভাকে উদ্দীপিত করবার জন্য যে উৎসাহ ও প্রেরণা আবশ্যক তাও তিনি জুগিয়েছেন। তা হলেও বলব ক্ষিতিমোহনবাবু শুধু পাণ্ডিত্য নয় অন্যান্য যে-সব অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ যে-কোনো স্থানে যে-কোনো অবস্থাতেই হতে পারত।

ক্ষিতিমোহন যেমন রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ক্ষিতিমোহনের কাছে দেখা দিয়েছিলেন অকস্মাৎ এক অজ্ঞাতপূর্ব মহাদেশ আবিষ্কারের বিস্ময়রূপে। ছিলেন কাশীতে, শিক্ষা প্রধানত সংস্কৃতাশ্রয়ী যদিচ ইতিমধ্যে তিনি কাশীর কুইনস্ কলেজ থেকে এম. এ. পাস করেছেন। তা

হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে খুব একটা পরিচয় ছিল না ; রবীন্দ্রনাথের নাম কখনো শোনেন নি। পূর্ববঙ্গ থেকে এক ভদ্রলোক কাশীতে এসেছেন বেড়াতে। তাঁর মুখেই প্রথম শুনলেন রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তি। ক্ষিতিমোহন বিস্ময়ে স্তব্ধ। অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত, বেদ-বেদান্তে গভীর জ্ঞান, প্রাচীন ভারতীয় সাধনার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান। কিন্তু প্রাচীনকে যতখানি জানতেন, নবীনকে ততখানি নয়। নব ভারতের বাণী এই প্রথম শুনলেন, শুনে মুগ্ধ হলেন। কী অপূর্ব ভাষা, কী অপরূপ ছন্দ, ভাবের কী অভিনব ব্যঞ্জনা! এমনটি তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি। স্বভাবসুলভ পরিহাসতরল কণ্ঠে বলেছিলেন—এতকাল খেয়েছি আমসি, এতদিনে পেলাম টাটকা আমের স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর কাব্য তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসল। সারাক্ষণ কাব্যপাঠ আর তাঁর এতদিনকার ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখা—এই নিয়েই বেশ কিছুদিন মেতে রইলেন। বুঝতে বিলম্ব হল না যে রবীন্দ্রকাব্য ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ভারতীয় জীবনসাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ দেশকে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনবোধে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এদিক থেকে কবি দেশের পক্ষে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। এটি না হলে বিংশ শতকের দরবারে ভারত কোথাও ঠাঁই পেত না। এ সত্যটি ক্ষিতিমোহন প্রথমাবধিই হৃদয়ংগম করেছিলেন।

এদিকে কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগল কবির সঙ্গে পরিচিত হবার। ক্ষিতিমোহন চলে এলেন কলকাতায়। তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। কবিকে দেখলেন এক সভায় দূর থেকে। সেবারে ঐ দেখাটুকুই, সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি। কলকাতা থেকে গেলেন তাঁর দেশের বাড়ি ঢাকা জেলার সোনারঙ গ্রামে। সেখানে স্বদেশী প্রচার করতে এসেছেন এক যুবক—নাম কালীমোহন ঘোষ। ক্ষিতিমোহন এবং কালীমোহন সমবয়সী, দুজনে খুব ভাব জমে গেল। দুজনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, কালীমোহন স্বদেশী বক্তৃতা করেন ; ঘরে ফিরে এসে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করেন, কালীমোহন শোনেন। কিছুদিন দুই বন্ধুতে পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরে ক্ষিতিমোহনবাবু চলে গেলেন তাঁর কর্মস্থলে। এর অনতিকাল পরেই স্বদেশী প্রচারের কাজে কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং শান্তিনিকেতনের কাজে এসে যোগ দেন। কালীমোহনবাবুর কাছেই

রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই গুণবান যুবকটির কথা শোনেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর সতীর্থ এবং বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রীও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং নানাবিধ গুণের উল্লেখ করে বলেছিলেন, এরূপ একজন মানুষকে পেলে শান্তিনিকেতন লাভবান হবে।

তাঁর জন্যে যে শান্তিনিকেতনে একটি আসন পাতা হচ্ছে তার কিছুই তিনি জানতেন না। হঠাৎ একদিন রবীন্দ্রনাথের আহ্বান পেয়ে তিনি বিস্ময়ে হত-বাক। অভাবনীয় সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল। কালবিলম্ব না করে রওনা হয়ে গেলেন। ১৯০৮ সালের এক বর্ষণমুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় পৌঁছলেন বোলপুর স্টেশনে। বোলপুর থেকে হেঁটেই আসছিলেন। আশ্রমের কাছাকাছি এসে প্রথমেই শুনলেন কবিকণ্ঠের গান, 'তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে'— দেহলি গৃহের দোতলায় দাঁড়িয়ে কবি গাইছিলেন। বলেছেন— সে গানের সুর আজও আমার কানে লেগে আছে।

সেই যে এলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীরও বেশি কাল শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে গেলেন। শাস্ত্রীমশায় যেমন একটি আধুনিক চতুষ্পাঠী স্থাপন করবেন বলে একবার চলে গিয়েছিলেন কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার ফিরে এসেছিলেন, ক্ষিতিমোহনবাবুর জীবনেও অনুরূপ ঘটনা একবার ঘটেছিল। কাশীতে থাকতে বেদ-বেদান্তের সঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রটিও যত্ন করে আয়ত্ত করেছিলেন। বংশগত ব্যাবসা কবিরাজি করবেন, এই ইচ্ছা মনে ছিল। নিজ শক্তির 'পরে আস্থা ছিল প্রচুর ; বলতেন— ব্যাবসায় নামলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরূপে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারবেন, পারতেনও। সে উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তোড়জোড় করে ব্যবসায়ে নামবার আগেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হল। পরিহাস করে বলতেন— কবি রাজি হলেন না, তাই কবিরাজি করা হল না।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শাস্ত্রীমশায় যেমন বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ক্ষিতিমোহনবাবুও তেমনি মধ্যযুগীয় সন্তদের জীবনসাধনা নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। সন্তপন্থীদের সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা পূর্বাবধিই ছিল। এখন সে উৎসাহ দ্বিগুণিত হল। বহু শ্রম স্বীকার করে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের সমস্ত রাজ্য ঘুরে ঘুরে দাদূ কবীর রজ্জব প্রভৃতি সন্তদের বাণী সংগ্রহ করলেন। এ কাজে তাঁকে একাধিক ভারতীয় ভাষা

শিখতে হয়েছে। হিন্দী এবং গুজরাটী খুব ভালো করেই শিখেছিলেন। ঐ দুই ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থের রচয়িতা। মধ্যযুগীয় সাধনা ছাড়াও হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ, জাতিভেদ প্রথা, প্রাচীন ভারতে নারী, হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে নানা উপলক্ষে নানা সময়েই রবীন্দ্রকাব্যের রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন, তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' নামক গ্রন্থে। তাঁর সংগৃহীত সন্তবাণীর ব্যাখ্যান তাঁর নিজ মুখে শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন কী হৃদয়গ্রাহী ছিল তাঁর পরিবেশন। 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দেওয়া বক্তৃতামালার সংকলন। বাউল সম্প্রদায় এবং বাউল সাধনা সম্বন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লীলা বক্তৃতামালা বিশ্বভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহভাণ্ডার থেকে নানা সন্তবাণী এবং বাউল সংগীত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে এবং নানা প্রবন্ধে, ভাষণে ব্যবহার করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ কাজটির জন্যে সমগ্র দেশই ক্ষিতিমোহনবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ, অন্যথায় মধ্যযুগের ঐ রত্নভাণ্ডারটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং মধ্যযুগীয় সাধনার ইতিহাস ছাড়াও ক্ষিতিমোহনবাবুর পাণ্ডিত্য ছিল বহুমুখী। কত বিষয়ে যে তাঁর আগ্রহ ছিল তার অন্ত নেই। বিদ্যাবত্তা তো ছিলই, তা ছাড়া সারা ভারত পর্যটন করে বহু দর্শনে বহু শ্রবণে বিচিত্র অভিজ্ঞতাপুষ্ট ছিল তাঁর মন। যে-কোনো বিষয়ের আলোচনায় তিনি অনায়াসে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন এবং বাক্‌চাতুর্যে, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, পাণ্ডিত্যের ঝলকে বিষয়টিকে ঝলমলে করে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতেন। যে-কোনো বিদ্বজ্জনসভা তিনি একাই জমিয়ে রাখতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'একা নবরতন ক্ষিতিমোহন।' বিশ্বভারতীর সূচনায় শান্তিনিকেতনে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল। সেই গুণীজনসভায় ক্ষিতিমোহনবাবু একাই উজ্জয়িনী-রাজসভার নবরত্নের সমান ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী তার সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছে।

পাণ্ডিত্য অনেকেরই আছে কিন্তু সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পণ্ডিতি হয়ে দেখা দেয়। পণ্ডিতি জিনিসটা লোকদেখানো, সেটা কারণে অকারণে যেখানে-সেখানে এমনভাবে প্রকাশ পায় যে বিরক্তিকর তো বটেই, অনেক সময় রীতিমত হাস্যকর হয়ে ওঠে। পাণ্ডিত্য যেখানে খাঁটি সেখানে তাকে শোরগোল করে ঘোষণা করতে হয় না, আলোর মতো আপনি ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর পাণ্ডিত্যও যে কত সহজে বহন করা যায় সে আমি ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে তাঁর মুখে নানা বিষয়ের আলোচনা শুনে বুঝেছি। এমন সরস পাণ্ডিত্য সচরাচর দেখা যায় না। বিদ্যা যদি মনে মজ্জায় মিশে যায় তবেই সে সহজ হয়ে দেখা দেয়; আর যদি পুঁথি-পড়া মুখস্থ বুলি হয় তা হলেই তার বিরস বিবর্ণ মূর্তিটি বেরিয়ে পড়ে। আমরা সাধারণত পাণ্ডিত্যের সেই কাট-খোট্টা মূর্তি দেখেই অভ্যস্ত। পাণ্ডিত্য জিনিসটাকে পোষ মানিয়ে নিতে হয় নইলে সে জন্ গিলপিনের ঘোড়ার মতো আপন ইচ্ছায় চলে, চালকের ইচ্ছায় নয়। ফলে, দেয় বিদ্যাটা যেখানে গিয়ে পৌঁছবার কথা সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না, মাঠে মারা যায়। পাণ্ডিত্য থেকেও অনেকে তাঁকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানেন না। তাঁরা বিদ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়ান কিন্তু প্রকাশের কলা-কৌশল জানেন না বলে সে বিদ্যা কারো ভোগে আসে না। দেখে মনে হয় আমাদের বেশির ভাগ পণ্ডিতের উপরেই দেবযানীর অভিশাপ পড়েছে, 'তুমি শুধু তার/ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ ; / শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।'

বিদ্যা ফলাতে গেলে বিদ্যা নিষ্ফলা হতে বাধ্য। ক্ষিতিমোহনবাবুর ফুলে-ফলে-সার্থক পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে এত কথা বলতে হল। ক্ষিতিমোহন-বাবুর কাছে বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু প্রচলিত অর্থে তাঁর ছাত্র না হলেও এখানকার উৎসবে অনুষ্ঠানে মন্দিরের ভাষণে প্রতিনিয়তই আমরা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছি। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতনের সকল কর্মী অধ্যাপকই তাঁর ছাত্র। তা ছাড়া, একবার কিছুদিন ধরে তিনি পূরবী কাব্যের আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য কিংবা কাব্যালোচনার ক্লাস নিতেন তখন যেমন ছাত্র শিক্ষক কর্মী এবং আশ্রমবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলে উপস্থিত থাকতেন, ক্ষিতিমোহনবাবুর ক্লাসেও তাই হত। আমি সেই ক্লাসে উনিশ-কুড়ি বছরের ছাত্র থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও

উপস্থিত থাকতে দেখেছি। এ ধরনের ক্লাস এক সময়ে শান্তিনিকেতনের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিদ্যাচর্চার জন্যে একটি বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। সেটা এভাবেই হওয়া সম্ভব।

প্রাক্তন ছাত্রদের মুখে তাঁর অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের যে-সব বিবরণ শুনেছি তা রীতিমত বিস্ময়কর; কিন্তু তার একটুও যে অত্যুক্তি নয়, তার 'পূরবী'-ব্যাখ্যানের কয়েকটি ক্লাসে উপস্থিত থেকেই আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। বাক্‌দেবী তাঁকে অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্য দিয়েছিলেন। কঠিনতম জিনিসকেও যে তিনি কতখানি হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারতেন— যাঁরা কোনো প্রশ্ন নিয়ে কখনো তাঁর কাছে গিয়েছেন তাঁরাই তার সাক্ষ্য দেবেন। এককালে আমাদের সমাজে কথকতার প্রচলন ছিল; কথকতাই ছিল জনশিক্ষার প্রধান বাহন। ক্ষিতিমোহনবাবু ছিলেন কথককুলমণি। এমন মধুর ভাষণ কম লোকের মুখেই শুনেছি। বলতে জানলে মুখের কথা গানকেও হার মানায়। কোলরিজ সম্বন্ধে হ্যাজলিট্‌ বলেছিলেন— He talks far above singing। এ কথাটি ক্ষিতিমোহনবাবুর সম্পর্কেও বলা যেত। লোকে ভাবে কেবলমাত্র ধর্মকথাই কথামৃত। ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে আমি বুঝেছি যে সুন্দর করে বলতে পারলে সব কথাই কথামৃত। অবশ্য শান্তিনিকেতন মন্দিরে যাঁরা তাঁর ভাষণ শুনেছেন তাঁরাও বলবেন, ক্ষিতিমোহনের কথা অমৃতসমান। যাঁরা শুনেছেন তাঁরা পুণ্যবান হয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু গুণবান যে হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি কথার মধ্যে যথেষ্ট গুণপনা থাকত।

শান্তিনিকেতনের উৎসবাদিতে ক্ষিতিমোহনবাবুর মন্ত্রোচ্চারণ ছিল একটি প্রধান আকর্ষণের বিষয়। মন্ত্রোচ্চারণ যে কত শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হতে পারে যাঁরা একবার তাঁর মুখে শুনেছেন তাঁরাই তার সাক্ষ্য দেবেন। জওহরলাল একবার অন্যত্র বেদমন্ত্র উচ্চারিত হতে শুনে বলেছিলেন— মন্ত্রোচ্চারণ কিভাবে করতে হয় তা শান্তিনিকেতনে গিয়ে শিখে আসা উচিত। এই সূত্রে বলা আবশ্যক যে এখানকার প্রতিটি উৎসবের অনুষ্ঠান-বিধি রচনা করেছেন বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেন— দুই বন্ধুতে মিলে। প্রকরণে পদ্ধতিতে মন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যেকটি উৎসবের ভাবমূর্তিটি লোকসমক্ষে পরিস্ফুট হয়ে উঠত। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সৌন্দর্যবোধের উন্মেষে এবং রুচিগঠনে এ-সব উৎসবের মূল্য অপরিসীম।

শান্তিনিকেতনের বাণী এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ক্ষিতিমোহনবাবু এক সময়ে যেভাবে দেশময় প্রচার করেছেন এমন আর কেউ নয়। গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশ তিনি শান্তিনিকেতনে বসে কাটান নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে নিজস্ব গবেষণাকার্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই রবীন্দ্রকাব্য এবং রবীন্দ্রজীবনদর্শনের পর্যালোচনা করেছেন। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবও দেশেবিদেশে যেখানেই গিয়েছেন এ কর্তব্যটি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ শুধু যে তাঁর কাব্যে সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনটি গড়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যেও অতি সুস্পষ্টরূপে তা প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের সাধনা সহজের সাধনা। এখানে উপকরণের বাহুল্য ছিল না কোনো-কিছুতে। এমন-কিছু মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে উপকরণ তার মূল্য হারিয়েছিল। অভাব ছিল অনেক কিছুর, অভাববোধ ছিল না কোনো-কিছুর। অভাব অভিযোগ কথা দুটো আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি, যেন একটি আর-একটির দোসর। শান্তিনিকেতনে অভাব ছিল, অভিযোগ ছিল না। হাসতে জানলে কোনো দুঃখই গায়ে লাগে না। হাস্যে পরিহাসে কষ্টভোগকেও তাঁরা উপভোগ্য করে তুলতেন। ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। এক ভদ্রলোক গিয়েছেন ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ছাতাটি বন্ধ করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন— উঃ কী বিষ্টি, কী বিষ্টি! ক্ষিতিমোহনবাবু বলে উঠলেন— অ্যাঃ বাইরেও বৃষ্টি নাকি? আসল কথা খড়ের চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ে ঘরের মধ্যেই জল থই থই করছে, সেজন্যেই প্রশ্ন, বাইরেও বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। যাঁরা দুর্ভোগ নিয়েও কৌতুক করতে জানেন তাঁদের দুর্ভোগ ভোগাবে কে? এঁদের সকল অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল তাঁদের নিজ মনের আনন্দ। মনে যদি আনন্দ থাকে, স্বাচ্ছন্দ্য আপনি এসে ধরা দেয়। শান্তিনিকেতনের জীবন ছিল সহজ স্বচ্ছন্দ সানন্দ। সেই সহজ আনন্দ প্রতিফলিত ছিল অধ্যাপকদের জীবনে। ক্ষিতিমোহনবাবু যে খালি পায়ে, হাতে বই-খাতাপত্রের থলিটি ঝুলিয়ে পঞ্চাশ বৎসরকাল শান্তিনিকেতনের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর সেই মূর্তিটি শান্তিনিকেতন ল্যাণ্ডস্কেপের একটি অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। পথে চলতে চলতে যাকে দেখেছেন তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুটো কথা বলেছেন।

স্নেহমিশ্রিত হাস্যপরিহাসে অনেকখানি মাধুর্য বিকীর্ণ হত। শুধু ক্ষিতিমোহন সেন নন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেপালচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু, গোঁসাইজি, হরিদাস মিত্র, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ সকলেই ঐ ল্যাণ্ডস্কেপে মিশে ছিলেন। এঁরা সকলেই মজলিসী এবং আড্ডাধারী মানুষ। কখনো চায়ের আড্ডায় বসে গল্প জমাতেন, কখনো লাল কাঁকরের রাস্তায়, কখনো মাঠে মাঠে, কখনো-বা খোয়াই পেরিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। প্রত্যেকেরই সঙ্গে দু-চারজন করে সঙ্গী জুটে যেতেন। পথে চলতে চলতে বহু বিষয়ের আলোচনা হত। এটা শান্তিনিকেতন-শিক্ষার একটা মস্ত বড়ো অঙ্গ ছিল। একদা লিসিয়ামের বাগানে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টটল পদচারণা করতে করতেই অধ্যাপনার কাজ চালাতেন। সেকালের ঐ গ্রীক রীতিটি একালের শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনকে বলা চলে এ যুগের পেরিপেটেটিক ফিলজফির জন্মদাতা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা বহুলাংশে আড্ডাজাত। সে আড্ডা সমস্ত শান্তিনিকেতনের জীবনকেই সমৃদ্ধ করেছিল।

ক্ষিতিমোহনবাবু একদিকে অধ্যাপক, অপর দিকে পর্যটক। ভারতের দূর দূর অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহু তীর্থক্ষেত্রেও গিয়েছেন—দেবদেবী দর্শনে নয়, জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্যের অন্বেষণে। কিন্তু সারা জীবনের পর্যটন শেষ করে বলেছেন—সব দেখে শুনে এইটুকু বুঝেছি যে শান্তিনিকেতনই সর্বতীর্থসার। কারণ ভারতীয় সাধনার সারবস্তুটুকু শান্তিনিকেতনের জীবনেই বিধৃত আছে। তাঁর কথা শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল যে গান্ধীজিও ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন এক বিদেশী পর্যটককে। বলেছিলেন— ভারতবর্ষ দেখতে এসেছেন তো সর্বাগ্রে শান্তিনিকেতনে যান— 'Santiniketan is India.'

কালীমোহন ঘোষ

কালীমোহন ঘোষকে আমার ছেলেবয়স থেকেই জানবার চিনবার সুযোগ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে আমরা ছিলাম একই অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি আমার পিতৃদেবের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে এক সময়ে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল; সেই তখন থেকেই তাঁকে আমাদের একান্ত আপনার জন বলে জানতাম।

আমার পিতা আদিযুগের রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এ শতাব্দীর গোড়াতেই গ্রামাঞ্চলে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সেটিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে কিছু সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। সে কাজে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কালীমোহন ঘোষ অন্যতম। কালীমোহন তখন বালক বললেই চলে, সবে কৈশোর পার করে যৌবনে পা দিয়েছেন। আমার তখনো জন্মই হয় নি।

আমি যখন স্কুলে নীচের ক্লাসের ছাত্র কালীমোহনবাবু তখন শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক। ছুটিছাটায় দেশে এলে এক-আধদিন এসে আমাদের বাড়িতে কাটাতেন। পিতার সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর আলোচনা হত। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের নিয়ে খুব গল্প জমাতেন, শান্তিনিকেতনের গল্প বলতেন। যেমন স্নেহপ্রবণ তেমনি আমুদে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে বসে গল্প শোনাটা আমাদের কাছে খুব একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। শুধু গল্প নয়, মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের কবিতা বেশ জোর গলায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। বেশ মনে পড়ে বীরপুরুষ এবং বন্দী বীর—এই দুটি কবিতা আমার দাদাকে খুব তালিম দিয়ে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। কদিন পরে দাদা এক সভায় বন্দী বীর কবিতাটি আবৃত্তি করে একটা প্রাইজ পেয়ে গেল। বলা বাহুল্য, আমি নিজে তখনো অতখানি তালেবর হই নি, ইস্কুলেই ভর্তি হই নি।

কালীমোহনবাবু যখন কলেজের ছাত্র তখন বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সারা দেশ তোলপাড়। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে। কালীমোহনবাবু ছিলেন ভাবপ্রবণ অত্যুৎসাহী যুবক। কলেজ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বদেশী প্রচারে লেগে গেলেন। ঢাকা জেলার

বিক্রমপুর অঞ্চলে যখন প্রচারকার্যে নিযুক্ত তখন আস্তানা নিয়েছিলেন সোনারঙ গ্রামে। ক্ষিতিমোহন সেন মশায় ঐ গ্রামের অধিবাসী। ছুটিতে যুবক ক্ষিতিমোহন এসেছেন গ্রামে। স্বদেশী যুবক কালীমোহনের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। দুদিনেই খুব ভাব জমে গেল। ক্ষিতিমোহনবাবু সবে রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ পেয়েছেন। সারাদিন উচ্চকণ্ঠে কাব্য পাঠ করেন, কালীমোহনকে শোনান। কালীমোহনবাবুও কাব্যবিমুখ ছিলেন না, তবে কাব্যোন্মাদনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর স্বদেশী উন্মাদনা। সেজন্যে তাঁর গতিবিধির ঠিক-ঠিকানা ছিল না, আজ এখানে তো কাল সেখানে। ক্ষিতিমোহনবাবুকে নিয়েও নানান জায়গায় ঘুরেছেন, আমাদের অঞ্চলেও তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং পরেও যোগাযোগ হয়েছে। কালীমোহনবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবু সে কথার উল্লেখ করে প্রবাসীতে লিখেছিলেন, 'বাবুরহাটের শিক্ষাগুরু সারদা দত্ত মহাশয়ও তরুণ কালীমোহনের অনেক নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।'

১৯০৬ সাল, স্বদেশী আন্দোলন চলেছে জোর কদমে। প্রাদেশিক সম্মেলন বসছে বরিশালে। সেবারেই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে একটি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছে। সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্যে কালীমোহনবাবু গিয়েছিলেন বরিশালে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনায় সারা দেশ তখন এমন মত্ত যে সংগঠনমূলক কাজে মন দেবার মতো স্থৈর্য ধৈর্য কারোই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটা দেশবাসীকে বোঝাতে পারেন নি যে দেশ গড়ার কাজ শুধু মুখের কথা দিয়ে হবে না, হাতে-কলমে, খেতে-খামারে, হাটে-গঞ্জে কাজে নামতে হবে। কোনো দিক থেকে সাড়া না পেয়ে ভেবেছিলেন নিজের জমিদারি এলাকায় ছোটো আকারে হলেও নিজেই পল্লী-সংগঠনের কাজে হাত দেবেন। বলেছেন, 'এ কথা যখন কাউকে বলে ক'য়ে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন··· এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে নামব।'

প্রথম সাক্ষাতে কালীমোহনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়েই তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। উৎসাহে ভরপুর সুদর্শন যুবকটির সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। অবশ্য মনে উৎসাহ যতখানি শরীরে তাকত ছিল না ততখানি, ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর তাঁর জীর্ণ। কিন্তু কালীমোহন তাতে দমবার পাত্র নন। স্বভাবটাই ঐ রকম, সারাক্ষণ উৎসাহে টগবগ করছেন। সে মুহূর্তেই কাজে লাগতে রাজি। কালবিলম্ব না করে চলে গেলেন শিলাইদহে। রবীন্দ্রনাথও অবিলম্বে তাঁকে লাগিয়ে দিলেন গ্রামের কাজে। পল্লী-সংগঠন কথাটি আজ বহু ব্যবহারে জীর্ণ; সংগঠনকর্মীর সংখ্যাও অগণিত। কিন্তু আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে এ কাজ ছিল অভিনব। অনেকেই ভুলতে বসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ অভিযানের প্রথম অধিনায়ক আর কালীমোহন তার প্রথম পদাতিক। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কথাটির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'এই সংকল্পে সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।'

কাজে একবার মেতে উঠলে কালীমোহনের আর হুঁশ থাকত না, শরীরের কথা আদৌ ভাবতেন না। রুগ্ণ শরীর নিয়েই দিনমান গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। কাজের মধ্যে একেবারেই ডুবে যেতেন। কালীমোহনবাবুর কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি যাদের মধ্যে কাজ করতেন— সেই চাষী-মজুরদের সঙ্গে তিনি এতটুকু ব্যবধান রক্ষা করে চলতেন না। তাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে পারতেন, তারাও তাঁকে অনায়াসে ঘরের মানুষ বলে ভাবতে পারত। ভদ্রশ্রেণীর জীবদের তারা বলতে গেলে নখী দন্তী প্রাণী হিসাবে ভয়ে সম্ভ্রমে দূরে দূরেই রাখত। এই প্রথম ভদ্রঘরের একটি শিক্ষিত যুবককে তারা একান্ত আপনার জন বলে ভাবতে পারল। গায়ে পড়ে উপকার করতে গেলে লোকে উপকৃত বোধ করে না, বিব্রত বোধ করে। উপকারের মধ্যে একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব আছে, সেটাতেই ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কালীমোহনবাবুর মধ্যে মুরুব্বিয়ানার ভাবটি আদৌ ছিল না। সেজন্যে তারা তাঁকে যেমন ভালোবেসেছে তেমনি আবার মান্যও করেছে— কারণ যাঁকে লোকে ভালোবাসে তাঁকে কখনো অমান্য করে না। জনসেবার প্রথম শর্ত ভালোবাসা— এ কথাটি রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কালীমোহন

সে শর্তটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ভালোবাসা দিয়েই গ্রামবাসীর সেবা করেছেন এবং ভালোবাসা দিয়েই তাদের হৃদয় জয় করেছেন।

এদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগজীর্ণ শরীর অধিকতর জীর্ণ হল। অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথও ভয় পেলেন। শরীর সারাবার জন্যে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন গিরিডিতে। একটানা কয়েকমাস গিরিডিতে কাটিয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেখানে বেশ আনন্দেই ছিলেন। গিরিডিতে বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের বাস। স্বভাবগুণে কালীমোহন এঁদের সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অনাত্মীয়কে তিনি অতি সহজেই আত্মীয় করে নিতে পারতেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল।

গিরিডিতে থাকতেই তিনি দু-একবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং দু-চারদিন এখানে কাটিয়ে গিয়েছেন। দেখে শুনে স্থানটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এদিকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও শরীর তখনো যথেষ্ট মজবুত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন তখনই আবার তাঁকে গ্রামের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। আপাতত তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজেই লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকেই তাঁর শান্তিনিকেতনের কর্মজীবন আরম্ভ। এটা ১৯০৭/৮ সালের কথা। কালীমোহনবাবুর মহৎ গুণ— কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা। যে কাজই দেওয়া হত সে কাজটিই তিনি প্রাণ দিয়ে করতেন। বেশ কিছুদিন তিনি শিশুদের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; গৃহাধ্যক্ষ হিসাবে ছোটোদের আবাসগৃহে তাদের সঙ্গেই তিনি থাকতেন। তাদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। মিষ্টভাষী মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে ছোটোদের সঙ্গে ভাব জমাতে তাঁর একটুও বিলম্ব হত না। পড়াতেন বাংলা এবং ইতিহাস। পুরোনো ছাত্রদের মুখে শুনেছি তিনি ক্লাসে গ্রীক রোমান ইতিহাসের কাহিনী পড়ে শোনাতেন আর অতিশয় স্বদেশবৎসল মানুষ ছিলেন বলে সেইসঙ্গে ভারতীয় বীরদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীও খুব গর্বের সঙ্গে জাঁকিয়ে বলতেন। ছেলেরা খুব রোমাঞ্চিত বোধ করত।

বিদ্যালয়ে বছর-পাঁচেক কাজ করবার পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিলেত যাবার এক সুযোগ এল। ১৯১২ সালে পুত্র এবং পুত্রবধূ সমেত কবি যখন বিলেত যান তার কিছুদিন আগেই কালীমোহনবাবু রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলে পর কালীমোহনবাবু এসে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত

হলেন। অনতিকাল মধ্যেই গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে ইংরেজ-সুধী-সমাজে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সারাক্ষণ গুণমুগ্ধদের আনাগোনা— রথীবাবু এবং কালীমোহনবাবু মিলে সে ভিড় সামলাতেন। ঐ সুযোগে কবি ইয়েট্‌স্ এবং পাউণ্ডের সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই খুব ভাব জমে গিয়েছিল। রথীবাবু তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন— তিনি এবং কালীমোহনবাবু বহু সন্ধ্যা কাটিয়েছেন ইয়েট্‌স-এর চিলেকোঠায়; অনেক রাত অবধি গল্পগুজবে কাটত। এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে কালীমোহনবাবু বেশ একটু অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশেছিলেন। ঐ সময়ের আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য; কবিবন্ধু শিল্পী রোটেন্‌স্টাইন পার্লামেণ্ট হাউসে কয়েকটি ভারতীয় দৃশ্য আঁকবার ফরমাশ পেয়েছিলেন। একটি ছবির বিষয়বস্তু ছিল বারাণসীর ঘাট। ঐ ছবির সুমুখ দিকে যে ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে— তার মুখের আদলটি কালীমোহন ঘোষের। বলা বাহুল্য, কালীমোহনবাবুকেই রোটেনস্টাইন মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সেবারে কিন্তু কালীমোহনবাবু খুব বেশি দিন বিলেতে থাকতে পারেন নি। যাঁরা তাঁকে অর্থানুকূল্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেন নি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ফিরে এসে আবার বিদ্যালয়ের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষকতার কাজে যথেষ্টই পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন কিন্তু আসলে তাঁর মনটা ছিল জনসেবার দিকে— সেই শিলাইদহে একদা যে কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন। সে সুযোগ এল যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিভাগের পত্তন হল। সে কাজে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দফায় যে-ক'জন কর্মীকে লেনার্ড এল্‌মহার্স্টের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন কালীমোহন ঘোষ তাঁদের অন্যতম। সেই যে গ্রামের কাজে লেগে গেলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর কাজের প্রধান গুণ ছিল তাঁর আন্তরিকতা। যে কাজে হাত দিতেন সে কাজে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিতেন। গ্রামবাসীরা বাবু-ভুঞাদের সহজে আপন জন বলে মনে করতে পারে না। তাদের কাছে কালীমোহনবাবু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি তাদের সুখদুঃখের শরিক ছিলেন। বিপদে আপদে তাঁর কাছেই সর্বাগ্রে ছুটে আসত। গ্রামবাসীদের ঝগড়াবিবাদ তো বটেই অনেক সময় মামলা-মকদ্দমাও

তিনি আপসে মিটিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এতটুকু ব্যবধান রেখে চলতেন না। দিব্যি তাদের ঘরের দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে বসে তাদের ঘর-সংসারের, চাষবাসের খবর নিতেন, প্রয়োজন-মতো পরামর্শ দিতেন। হাতে-কলমে কাজ করিয়ে এদের মধ্যে থেকেই তিনি বেশ কয়েকজন গ্রাম-কর্মীও তৈরি করেছিলেন।

কালীমোহনবাবু মূলত ছিলেন স্বদেশবৎসল মানুষ। বালক বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা তাঁর রক্তে যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল সারা-জীবনেও তা স্তিমিত হয় নি। সুবক্তা ছিলেন, আবেগময় ভাষণে সহজেই শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলতে পারতেন। বহুকাল পুলিসের নজর ছিল কড়া, শান্তিনিকেতন থেকে অপসারণের দাবিও উঠেছিল। ঠিক সে সময়টিতেই বিলেতে চলে যাওয়াতে পুলিস আর ও বিষয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করে নি। পরে অবশ্য দেশের কাজ তিনি বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাক্যপ্রয়োগে করেন নি, করেছেন শ্রমসাধ্য জনহিতকর কর্মযোগে। মনটি ছিল অতিশয় পরদুঃখকাতর। আবেগ-প্রবণ মানুষ ছিলেন ব'লে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন দপ করে জ্বলে উঠতেন তেমনি আবার দুস্থজনের দুঃখে দুর্যোগে অতি সহজে বিগলিত হতেন। তাঁর ঐ স্বভাবজাত গুণটির কথা অতি সুন্দর করে বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর চৌপদীতে। বলেছেন—

কালীমোহনের অশেষ গুণ!
যে তাঁরে জানে— সে-ই জানে
দীন দুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন!
অবিচার সহে না প্রাণে॥

তিরিশের দশকে কালীমোহনবাবু আর-একবার বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন। সেবারে এল্‌মহার্স্ট সাহেবই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে সমবায় আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেখানকার সমাজজীবনকে কতখানি প্রভাবিত করছে সে-সব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসাই উদ্দেশ্য ছিল। এ উপলক্ষে তিনি ইয়োরোপের এবং পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশ পর্যটন করেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি বোলপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে সমবায়রীতিতে কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ঐ-সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামবাসীদের অশেষ কল্যাণ করেছিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কাজের চাপের সঙ্গে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর নজর ছিল না, কাজেরও বিরাম ছিল না। জীবনের শেষ দিনটিতেও তিনি শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। কর্মীরা বিদায় নেবার অল্পক্ষণ পরেই অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর জীবনান্ত ঘটে। অকালমৃত্যুই বলতে হবে, কারণ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন। অবশ্য মানুষের পরমায়ুর হিসাব যদি কাজের পরিমাণ দিয়ে করা যায় তা হলে তাঁকে দীর্ঘায়ু বলতেও বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় গ্রামোদ্যোগ-কর্মে এতখানি নিষ্ঠা আর কেউ দেখান নি। এর স্বীকৃতি আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে। বলেছেন, 'কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীর ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।' বিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন সব সময় সর্বাগ্রে সতীশ রায়কে স্মরণ করেছেন তেমনি পল্লী-সংগঠনের ব্যাপারে যখনই কিছু বলেছেন তখনই সর্বাগ্রে কালীমোহন ঘোষের নামটি করেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে— তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— তাঁর প্রিয়কার্য সাধনই তাঁর উপাসনা। কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়কার্য— গ্রামবাসীর সেবার দ্বারাই তাঁর জীবনের পূজা সাঙ্গ করেছেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক-একজন মানুষ থাকেন যিনি বলতে গেলে একাই একটি প্রতিষ্ঠান। এরূপ মানুষ যখন যেখানে থাকেন তখন সেখানকার জীবনযাত্রা প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তিনি তাঁর নিজের মধ্যেই একটি সমারোহকে বহন করে চলেন। তাঁর অপরিমেয় প্রাণশক্তি সমগ্র চতুষ্পার্শ্বকে প্রাণবন্ত করে তোলে; তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি লোকালয়কে উল্লসিত করে; তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণচ্ছটা সমস্ত পরিবেশকে রঞ্জিত নন্দিত করে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই-জাতীয় মানুষ, বলা যেতে পারে এই-জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর বিরাট দেহ এবং ততোধিক বিরাট মন নিয়ে সমস্ত আশ্রমটিকে তিনি ভরাট করে রেখেছিলেন। ভরাট গলায় গান করতেন, প্রাণ খুলে হাসতেন, প্রাণ ভরে সকলকে ভালোবাসতেন, মজাদার গল্পে ছোটো বড়ো সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। যেখানে বসতেন সেখানেই আসর জমে উঠত।

দিনেন্দ্রনাথ নানা গুণে গুণান্বিত মানুষ। উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তি। শিল্পী বংশে জন্ম; বংশের ধারাটি তিনি রক্ষা করেছিলেন। শিল্পীজনোচিত নানা গুণের অধিকারী ছিলেন— কবিতা লিখতেন, গান রচনা করতেন। সংগীতে তো কথাই নেই, অভিনয়েও ওস্তাদ ছিলেন। বিসর্জন নাটকে যাঁরা রঘুপতির ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছেন তাঁরাই জানেন তিনি কত বড়ো অভিনেতা ছিলেন। এ ছাড়া মজলিস জমাবার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গ ছিল ছোটো বড়ো সকলের কাছে লোভনীয়।

বিদ্যা দানের কাজে বিদ্বান মানুষেরই প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যা বলতে তো শুধু কেতাবী বিদ্যা নয়। বিদ্যা বহুবিধ। যা-কিছু নিয়মিত চর্চার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় তাকেই বলে বিদ্যা। কাজেই যে-কোনো গুণচর্চাকেই বলা যায় বিদ্যাচর্চা। কিন্তু আমরা বিদ্যাচর্চা বলতে শুধু বুঝি পাঠচর্চা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু পাঠচর্চার সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখেন নি, তাকে জীবনচর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছিলেন। জীবনকে পুরোপুরি পেতে হলে, তার রস উপলব্ধি করতে হলে বহুবিধ গুণের চর্চা চাই। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে প্রথমাবধিই একটি গুণচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেজন্যে শিক্ষক হিসাবে যাঁরাই এখানে এসেছিলেন তাঁরা বিদ্বান তো বটেই, প্রত্যেকেই ছিলেন গুণী ব্যক্তি।

দিনেন্দ্রনাথকে শুধু গুণী বললেও কম বলা হয়; বলা উচিত গুণীশ্রেষ্ঠ। এরূপ মানুষের সঙ্গই একটা শিক্ষা। এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। দিনেন্দ্রনাথকে লোকে প্রধানত সংগীতকুশলী বলেই জানে। পুরোনো দিনের একজন ছাত্র আমাকে বলছিলেন— সকলে দিনদার গানের কথাই শুধু বলে, কিন্তু তিনি যে কী সুন্দর পড়াতেন সে কথা আজ আর কেউ বলে না। আমরা পড়েছি, আমরা জানি। ইংরেজির ক্লাস নিতেন, সে ক্লাসটি আমাদের বড়ো প্রিয় ছিল। দিনেন্দ্রনাথ কিছুকাল বিলাতে অধ্যয়ন করেছেন, ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারেই দিনুবাবু কিছু ইংরেজির ক্লাস নিতেন। তবে তাঁর শিক্ষাদানের কাজটা ক্লাসের চাইতে ক্লাসের বাইরেই হত বেশি— তাঁর আড্ডায় বসে। কাব্যপাঠে খুব আনন্দ ছিল। পড়তেনও খুব সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা একের পর এক পড়ে যেতেন। পড়তে পড়তে তাঁর নেশা ধরে যেত; যারা শুনত তাদেরও।

আগেই বলেছি অতিশয় মজলিসী মানুষ ছিলেন। মজলিস জমাতেন ছেলে বুড়ো সকলকে নিয়ে। থাকতেন নিচু বাংলায়। আশ্রমের দিকে আসছেন দেখতে পেলেই চারি দিকে সাড়া পড়ে যেত। ছেলেরা আনন্দে 'দিনদা আসছেন' বলে চেঁচিয়ে উঠত, ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরত। অধ্যাপকমশায়রাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন— এই যে দিনুবাবু, আসুন, আসুন। ব্যস্, তাঁকে ঘিরে গল্পের আসর বসে যেত। ছোটোদের সঙ্গে ছিল দারুণ ভাব, প্রায়ই তাদের ঘরে এসে গল্প জমাতেন। সে দৃশ্য ছিল দেখবার মতো। বিরাট দেহ নিয়ে মহাদেবের মতো তিনি বসতেন মাঝখানে, শিশুরা তাঁকে ঘিরে, যতটা সম্ভব কোল ঘেঁষে। দু-একটি তাঁর কোলে উঠেই বসত একেবারে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। কী নিবিষ্ট মনে যে তাঁর গল্প শুনত কী বলব। সহজে তাঁকে ছাড়তে চাইত না। উঠবার উপক্রম করলেই আবদারের সুরে বলে উঠত— আর-একটু বসুন-না, দিনদা। দিনদাও উঠতে গিয়ে আবার ধপ্ করে বসে পড়তেন। শিশুদের যে কী ভালোবাসতেন সে বলার নয়। প্রতি মাসে একদিন দুদিন তাঁর বাড়িতে শিশুদের নিমন্ত্রণ বাঁধা ছিল। নিঃসন্তান মানুষ— এদের তিনি আপন সন্তানের মতো দেখতেন, কাছে বসে খাইয়ে আনন্দ পেতেন। এ ব্যাপারে পত্নী কমলা দেবীর ছিল সমান উৎসাহ। তিনি নিজ হাতে পরিবেশন করতেন আর দিনুবাবু নানান রকম গল্প ক'রে তাদের খাওয়ার

উৎসাহ বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর বাড়িতে শিশুদের যাতায়াত ছিল অবাধ। একটি পেন্‌সিল কাটার যন্ত্র কিনে এনে তাঁর বারান্দায় রেখে দিয়েছিলেন। ছেলেরা যখন খুশি এসে নিজ নিজ পেন্‌সিল কেটে নিত। শিশুরা যে-কোনো অছিলায় কাছে এলেই তিনি খুশি হতেন।

দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যখন যে বাড়িতে থাকতেন তখন সেটিই হয়ে উঠত শান্তিনিকেতন-জীবনের কেন্দ্রস্থল। এক সময়ে ছিলেন আশ্রমের একেবারে মাঝখানে বেণুকুঞ্জে; তখন বেণুকুঞ্জই ছিল আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র। নিত্য বসত গানের আড্ডা; আর গল্পের আড্ডা। মাঝে মাঝে ভোজসভা। বর্ষার দিনে যখন বাইরে ক্লাস বসানো সম্ভব হত না তখন ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হত বেণুকুঞ্জে। একের পর এক বর্ষার গান চলতে থাকত। বেণুকুঞ্জের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালে দিনেন্দ্রনাথের বেণুকুঞ্জে আমরা আমাদের আড্ডা বসিয়েছিলাম। দিনুদার গুণাবলীর কণামাত্র ছিল না আমাদের কারো তথাপি আমাদের স্বল্পসাধ্য নিয়ে তাঁর ট্র্যাডিশনটি জিইয়ে রাখবার অক্ষম চেষ্টা করেছি। অপরকে আনন্দ দেওয়া সাধ্যে কুলোয় নি কিন্তু নিজেরা আনন্দ পেয়েছি প্রচুর।

দিনেন্দ্রনাথের চা-এর আড্ডাটিও ছিল একটি ইনস্টিটিউশন। দিনুবাবু চা-বিলাসী ছিলেন। তখন ঘরে ঘরে চা-এর আয়োজনও ছিল না, চা-এর দোকানও ছিল না। 'চা-স্পৃহ-চঞ্চলরা' যথাসময়ে দিনুবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হতেন, সেখানে বিরাট আড্ডা বসত, হাসি গল্পে মজলিস মশগুল হত। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথও সে আসরে এসে যোগ দিতেন। পরে অধ্যাপক কর্মীরা মিলে যখন চা-চক্র স্থাপন করেন তখন তার নাম দেওয়া হয় দিনান্তিকা চা-চক্র। চক্র অবশ্য দিনান্তেই বসত, তা হলেও দিনেন্দ্রনাথের নামটিকে খুব সংগতভাবেই তার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এখন সেখানকার বেণুবনটি যেমন লুপ্ত তেমনি বেণুকুঞ্জ শূন্য, চা-চক্র পরিত্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী এবং ছেলেদের গানের কাণ্ডারী হিসাবে দিনেন্দ্রনাথের নাম শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ফাল্গুনী নাটকটি দিনেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে কবি তাঁকে ঐ বিশেষণে ভূষিত করে-ছিলেন। কবি গানের কথা গাঁথতেন আর গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন। গান রচনা শেষ হওয়া মাত্র ডাক পড়ত দিনেন্দ্রনাথের। সুরটি তাঁকে শিখিয়ে

দিয়ে কবি নিশ্চিন্ত। কবি নিজে ভুললেও সুরটি হারিয়ে যাবার আর কোনো ভয় ছিল না। প্রতিটি গানের সুর যক্ষের ধনের মতো আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রেখেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান স্বরলিপিকার। স্বরলিপি রচনায় তাঁর সহজ নৈপুণ্য সকলকে চমৎকৃত করত। আর শুধু গানের ভাণ্ডারী নন তো, কাণ্ডারীও বটে। রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক হিসাবে তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। হাল আমলের কথা ছেড়ে দিলে এক কালে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে নাম করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেরই শিক্ষা দিনেন্দ্রনাথের কাছে। শুধু খ্যাতনামাদের নিয়েই থাকতেন না, অখ্যাত অক্ষমদের প্রতিও তাঁর ঔদার্যের অন্ত ছিল না। কোনো শিক্ষার্থী সম্পর্কেই নৈরাশ্য বোধ করতেন না, সকলকেই আপ্রাণ চেষ্টায় শেখাবার চেষ্টা করতেন। গান গাইতে যেমন শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না, গান শেখাতেও তাই।

সংগীতবিদ্যায় তাঁর যে পারদর্শিতা তাকে রীতিমত প্রতিভাই বলা যেতে পারে। মনে হয় সুরজ্ঞান যেন প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যার ন্যায় তাঁর মনে মজ্জায় মিশে ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি ইস্কুলে পড়তেন তখনই পিয়ানো বাজিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন। বড়ো হয়ে ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের চর্চা করেছেন। ওদিকে আবার বাউল বা ভাটিয়ালি গান যখন করতেন তখন বাংলার মেঠো সুর অবলীলায় তাঁর গলায় খেলত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান এত ভালো গাইতেন যে কবি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে নানান জায়গায় তাঁর বন্ধু-মজলিসে সে-সব গান শোনাতেন। গলায় ছিল জাদু, কীর্তন গাইতেন অপূর্ব। পাশ্চাত্য সংগীতে গভীর জ্ঞান ছিল। বিলাতে যখন ছিলেন তখন ওদেশের সংগীত নিয়ে এত বেশি মেতে গিয়েছিলেন যে তাঁর আইন অধ্যয়নে তাতেই বাধা পড়েছে এবং ব্যারিস্টার হওয়া আর হয়ে ওঠে নি। পরে অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতকেই মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন। প্রাণাধিক পৌত্রটি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

দিনু-দাদাজির কি ক'ব কাহিনী
বীণাপাণির সে যে শিষ্য!
উথলি উঠে যবে রাগ রাগিণী
পুথলি বনি যায় বিশ্ব॥

দিনেন্দ্রনাথ যতখানি রবীন্দ্রসংগীতের মর্মে প্রবেশ করেছেন এমন খুব কম জনই করেছেন। কবিপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রত্যেকটি গানের কাব্যরসটি

তিনি অতি সহজে অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছেন। সেজন্যেই অত দরদ দিয়ে গাইতেও পারতেন। এ ছাড়া অনেক সময়েই কবির পাশে বসে সুরসৃষ্টির প্রক্রিয়াটা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দিনেন্দ্রনাথ বলেছেন— *সুরটা কিছুতেই মনোমত হচ্ছে না; সুর যেন অভিমানিনী প্রেয়সীর মতো মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।* কবি কত করে তার মান ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। অনেক করে যখন তার মন পেলেন কবি বললেন— এই নাও এবার আমার বাণীর মালাটি তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। গান রচনা এতক্ষণে সমাপ্ত হল। কবি বললেন— আমি তৃপ্ত, কথা বললে— আমি ধন্য, সুর বললে— আমি পূর্ণ।

সুরসৃষ্টির রহস্যটি হৃদয়ংগম করেছিলেন বলেই সুরের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা। সুরের এতটুকু বিকৃতি তিনি সইতে পারতেন না। তাঁর ঐ 'দুর্বলতাটি' ছেলেমেয়েদের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। যখন-তখন তাঁর কাছে গানের আবদার নিয়ে আসত। তিনি পারতপক্ষে তাদের নিরাশ করতেন না। কখনো যদি বলতেন, এখন নয়, পরে আসিস— তা হলেই তারা একটি কৌশল অবলম্বন করত। একজন কোনো-একটা গান একটু বে-তালে কিংবা বে-সুরে গাইতে শুরু করত আর দিন্‌দা' তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে— ওকি হচ্ছে, থাম্‌ থাম্‌— বলে গানটি ঠিক সুরে ধরে দিতেন। ব্যস্‌, তার পরে আপনি চলতে থাকত গানের পর গান।

ভাবলে খুব অবাক লাগে, সকলের জন্যে সকল-কিছুর জন্যে এত যাঁর দরদ, এত মমতা সেই মানুষই নিজের প্রতি, নিজের জিনিসের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নির্বিকার ছিলেন। কবিতা লিখতেন, লিখে কাউকে পড়ে শোনাতেন, তার পরে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। কারো কথা শুনতেন না; বলতেন, এই তো হয়ে গেল, একজনকে তো শোনালুম, ব্যস্‌ চুকে গেল। যৌবনকালে বোধ করি মনের ভুলে ছোটো একটি কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়েছিলেন। সে বই বিক্রির কোনো চেষ্টাই করেন নি, নিজের কাছেই সব গাদা করা ছিল। পরে এক সময়ে নিজ হাতেই তাতে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। নিজের সকল ব্যাপারেই তাঁর সংকোচ ছিল অপরিসীম। খুব উঁচুদরের মানুষ না হলে এতখানি নিরাসক্ত মন কারো হয় না—

কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়···
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

মৃত্যুর পরে অনেক খুঁজেপেতে সামান্য কিছু কবিতা, ক'টি গান এবং সংগীত সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে পত্নী কমলা দেবী একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ সমেত যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জেনেছিলেন তাঁরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

অকালমৃত্যু শান্তিনিকেতনকে বারে বারেই আঘাত করেছে; কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু একেবারে অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় তাকে যেন পঙ্গু করে দিয়ে গেল। বাহান্ন বৎসর পার হতে-না-হতেই তিনি বিদায় নিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—

রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।

অকস্মাৎ দিনেন্দ্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রের সংগীত স্তব্ধ হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে গুণীজনের অভাব ছিল না। দিনেন্দ্রনাথ গুণীজন তো বটেই তার উপরে তিনি ছিলেন আশ্রমের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। আশ্রমবাসী সকলের কাছ থেকে তিনি যতখানি ভালোবাসা পেয়েছিলেন এমন আর কেউ নন। তার কারণ ঐ একজন মানুষ শান্তিনিকেতনকে যতখানি আনন্দ দিয়েছেন এতখানি আর কেউ দেন নি। সত্যি বলতে কি, শান্তিনিকেতনকে যাঁরা আনন্দনিকেতন করেছেন তাঁদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথের স্থান সর্বাগ্রে। ছেলেমেয়েদের সকল নাটের গুরু। দিনুদা না হলে তাদের উৎসব ব্যসন কিছুই জমত না। বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে খোয়াইতে বেড়ানো একটা মস্ত বড়ো আনন্দের ব্যাপার ছিল। অধ্যাপকমশায়রাও তাতে যোগ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন এ খেলায় যথেষ্ট উৎসাহী। দিনুবাবুর বিপুল বপু নিয়ে খোয়াইতে বেড়ানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু তাঁকে না হলে ছেলেমেয়েদের কিছুতেই মন উঠত না। জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে যেত। একবার নেমে পড়লে আর কথা ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে সমান উৎসাহে বৃষ্টিতে ভিজে গান গেয়ে বেড়াতেন। পিকনিক হত ঘন ঘন। দিনুদাকে ছাড়া পিকনিকের কথা ছেলেমেয়েরা ভাবতেই পারত না।

আর উৎসব-অনুষ্ঠানের বেলায় তো কথাই নেই। দিনুবাবুই সকল উৎসবের উৎস। সত্যি বলতে কি, দিনেন্দ্রনাথই একটি উৎসব। তিনি

উৎসবের প্রতিমূর্তি। তিনি যেখানে যেতেন উৎসব তাঁর সঙ্গে যেত। আর-কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, তিনি একাই গল্প করে গান করে সকলকে হাসিয়ে নাচিয়ে উৎসব জমিয়ে দিতে পারতেন। এ তো গেল তাঁর স্বভাবজাত উৎসব-মুখর দৈনন্দিন জীবনের কথা। শান্তিনিকেতনের আনুষ্ঠানিক উৎসবাদিতেও তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা। এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের রাজসভায় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থাকতেন; তাঁকে বলা হত— Master of Revels— তিনি রাজা রানী এবং পারিষদবর্গের আমোদ-প্রমোদের জন্যে নাচ গান নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনের Master of Revels। আনন্দোৎসব নন্দনচর্চারই অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় এ-সব উৎসবকে বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর স্থান অপূরণীয় এবং তাঁর দান অবিস্মরণীয়।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে মন্দিরের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এখানকার কর্মের মধ্যে যে একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতুপর্যায়ের নানা বর্ণগন্ধগীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায়, আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র ছিলেন আমার প্রধান সহায়।··· এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যাম শোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সংগীতের, উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের চেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র।··· দিনেন্দ্রের এই যে দান, এর আনন্দের রূপ কোনো কালে যাবার নয়— যতদিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন; আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়।'

আশ্রম দিনেন্দ্রনাথকে ভোলে নি, ভুলবেও না। আজও তাঁর জন্মদিনে সকল আশ্রমবাসী মিলিত হন, সংগীতের আসর বসে, তাঁর জীবনকথার আলো-চনা হয়। দিনেন্দ্র-স্মৃতি সংগীত প্রতিযোগিতা আশ্রমের একটি অতি আকর্ষণীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

নেপালচন্দ্র রায়

শান্তিনিকেতন-জীবনের এক মস্ত বড়ো রহস্য— মানুষের মনকে এক অনির্দেশ্য আকর্ষণে টানতে থাকে। অথচ বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনকে আকৃষ্ট করবার মতো তেমন কিছু চোখে পড়বে না। শহুরে জীবনের জলুস নেই, হৈচৈ উত্তেজনা নেই। এখন তবু পাকা বাড়িঘর হয়েছে— লোকসংখ্যা বেড়েছে। এক সময়ে অতি স্বল্প পরিসরে ছিল অল্পসংখ্যক লোক। খড়ের ঘরে বাস, গাছের তলায় ক্লাস। আপাতদৃষ্টিতে নীরব নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবন। কিন্তু নীরব নিভৃতির মধ্যেও একটি আনন্দের গুঞ্জন ছিল, বড়ো রকমের তরঙ্গভঙ্গ না থাকলেও প্রাণচাঞ্চল্যে স্থানটি সর্বদাই আন্দোলিত থাকত। তরুমূলের মেলায়, খোলা মাঠের খেলায় ছেলেরা এবং বয়স্করা সকলেই মেতে থাকতেন। জীবনটা একটা বিশেষ সুরে বাঁধা ছিল। মনটা ঠিক তারে বাঁধা থাকলে সে সুরটা ধরতে বিলম্ব হত না। যাঁরা সে সুরে সুর মেলাতে পেরেছেন তাঁরাই মজে গিয়েছেন, তাঁরা আর ছেড়ে যেতে পারেন নি। এ যাবৎ যে-সব অধ্যাপকদের কথা বলেছি তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন অল্প বয়সে, যৌবনের প্রারম্ভে। সুর মেলাতে তাঁদের খুব একটা বেগ পেতে হয় নি।

নেপালবাবু শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন যৌবন পার করে দিয়ে প্রৌঢ় বয়সে। একবার কালোয়াতি রেওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে গলায় আর মেঠো সুর সহজে আসে না। কিন্তু নেপালবাবুর প্রাণটি ছিল একেবারে তাজা, মনটি এমন তারে বাঁধা যে সেখানে একই সঙ্গে অনেক সুরের খেলা চলত। এখানে আসবার আগে প্রায় বছর-কুড়ি তিনি শিক্ষকতার কাজ করে এসেছেন, এমন-কি, হেডমাস্টারিও করেছেন। হেডমাস্টার-জাতীয় মানুষদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে একটি সংশয় ছিল। এ-সব গুরুমশায়রা এমন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ যে ছেলেরা এঁদের কোনোমতেই তাদের স্বশ্রেণীর বলে ভাবতে পারে না। মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো অতিকায় প্রাণী; তার থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে তার কাছে তারা ঘেঁষতেই পারে না। এরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে হেডমাস্টার নেপালচন্দ্র রায়কে তাঁর বিদ্যালয়ের কাজে আহ্বান করেছিলেন, তার কারণ প্রথম আলাপেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে দীর্ঘদিনের হেডমাস্টারিও ওঁর মনে তেমন ভাঙচুর

ঘটাতে পারে নি। এ বয়সেও মনটিকে দিব্যি নিটোল সুডৌল রাখতে পেরেছেন। প্রকৃতপক্ষে চিরকিশোর বলতে আমরা যা বুঝি ইনি সেই বিরল জাতের মানুষ। নেপালবাবুর মতো শিক্ষকের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি।' রবীন্দ্রনাথ দেখেই বুঝেছিলেন যে এ মানুষটি খাঁটি শান্তিনিকেতন-গোত্রীয়। তা ছাড়া নেপালবাবু যখন এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের হেডমাস্টার তখন স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ। রামানন্দবাবুর মুখে রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছিলেন। এলাহাবাদে যাবার আগে নেপালবাবু কিছুকাল কলকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। সেখানে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর ছাত্র। তাঁরাও সব সময়ে খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় নেপালবাবুর গুণকীর্তন করতেন।

রামানন্দবাবু এবং নেপালবাবুতে মিলে এলাহাবাদে একটি অতি পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন। নেপালবাবু মাত্র দশটি বৎসর এলাহাবাদে ছিলেন কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যেই তিনি তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের জীবনে একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে এসেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-প্রণীত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে নেপালবাবুর অবদানের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। নেপালবাবু একদিকে যেমন ছাত্রবৎসল শিক্ষক অপর দিকে তেমনি আবার স্বদেশবৎসল সমাজসেবক ছিলেন। ১৯০৫ সালে যখন বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল, নেপালবাবু তখন এলাহাবাদের যুবক সমাজে স্বদেশীমন্ত্র প্রচার করে এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে তিনি সেখানকার রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন।

এলাহাবাদের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। ইতিমধ্যে স্থির করেছেন যে চাকুরি আর করবেন না, আইন অধ্যয়ন করে ওকালতি ব্যবসায়ে নামবেন। তাতে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারবেন এবং দেশসেবারও অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাবেন। বয়স তখন চল্লিশ, ঐ বয়সে ল' কলেজে ভর্তি হলেন, একে একে সব-ক'টি পরীক্ষা পাস করলেন।

হাইকোর্টে বসবার তোড়জোড় করছেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এর আগেও এলাহাবাদে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নেপালবাবুর ছাত্র, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী সবে একটি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে গিয়েছেন বিলেতে। অজিতবাবুর স্থান পূরণের জন্যে ইংরেজির একজন শিক্ষক অবিলম্বে প্রয়োজন। নেপালবাবুর চরিত্রমাধুর্য এবং অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের কথা তাঁর গুণমুগ্ধদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে থেকেই শুনে আসছিলেন। নেপালবাবুকে বললেন—আইন ব্যবসায়ে নামবার আগে যদি অন্তত মাস ছয়েকের জন্যে আমার বিদ্যালয়ের কাজে একটু সহায়তা করেন তো বড়ো উপকার হয়। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ অমান্য করেন এমন সাধ্য ছিল না। আসতে হল শান্তিনিকেতনে। এসেছিলেন সাময়িকভাবে সমূহ কাজ উদ্ধার করে দেবার উদ্দেশ্যে। কাজ তো উদ্ধার হল কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করবে কে? তিনি নিজেই মজে গেলেন শান্তিনিকেতনের জীবনে। আর এমন একটি মানুষ পেয়ে শান্তিনিকেতনই কি আর তাঁকে ছাড়তে চায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে লিখেছিলেন, 'নেপালবাবু কিছুদিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুদিনের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।' বাস্তবিকপক্ষে আনন্দটা রীতিমত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ঐ কিছুদিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে ছাব্বিশ বছর লেগে গিয়েছিল। কয়েক মাসের জন্যে এসে একটানা ছাব্বিশ বছর শান্তিনিকেতনের সেবায় কাটিয়ে দিলেন। ক্ষিতিমোহন-বাবুর যেমন কবিরাজি করা হয় নি, নেপালবাবুরও তেমনি ওকালতি করা আর হল না। আসল কথা মননে চিন্তনে তিনি পূর্বাবধিই শান্তিনিকেতনী ছিলেন। শিক্ষার মর্ম এবং শিক্ষকের ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ধ্যান-ধারণা নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, নেপালবাবু আগে থেকেই সে ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। সেজন্যেই তিনি এত সহজে শান্তিনিকেতনকে আপনার করে নিতে পেরেছিলেন।

শিক্ষক হিসাবে তুলনাবিহীন বলা যেতে পারে। ইতিহাস ভূগোল এবং ইংরেজি পড়াতেন। এক সময়ে তাঁর লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। আমরা ছেলেবেলায় সে বই পড়েছি। এমন মনোরম ভঙ্গিতে লেখা যে, সে বই পড়ে ছেলেরা দেশকে ভালোবাসতে শিখত।

অজিত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তাঁর রচিত ভূগোল-বৃত্তান্তের গ্রন্থ 'ভূপরিচয়' এমন চিত্তাকর্ষক ভাষায় লেখা যে তাতে সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যেত। পাঠ্য বই বেশির ভাগই অপাঠ্য। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকও যে প্রসাদগুণে কতখানি প্রসন্ন হতে পারে নেপালবাবুর রচিত ইতিহাস-ভূগোলের বই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ছেলেদের ভূগোল শেখাতে গিয়ে আমরা তাদের পরিচিত ভূখণ্ডটুকু কেড়ে নিই, তাদের পরিচিত জগৎ থেকে তাদের নির্বাসিত করি। নেপালবাবু তাঁর সুবিখ্যাত 'ভূপরিচয়' গ্রন্থখানি লিখবার সময়ে এ কথাটি নিশ্চিত স্মরণ রেখেছিলেন এবং আমাদের আবাসভূমি এই পৃথিবীর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করবার চেষ্টা করেছিলেন।

ইংরেজির শিক্ষক হিসাবেও বিদেশী ভাষা সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে যে স্বাভাবিক ভীতি থাকে সেটি তিনি দূর করবার চেষ্টা করতেন। সকল জিনিসকেই সরস করতে জানতেন, এমন-কি, ব্যাকরণকেও। ইংরেজির ক্লাসে পাঠ্যবহির্ভূত ইংরেজি সাহিত্যের নানা চিত্তাকর্ষক গল্প ছেলেদের কাছে মুখে মুখে বলতেন, কখনো পড়ে শোনাতেন। এ কাজটি অজিতবাবুও করেছেন। স্বদেশপ্রেমিক মানুষ— ইতিহাসের ক্লাসে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি এবং দেশী বিদেশী অন্যান্য বীরপুরুষদের কাহিনী শোনাতেন। খুব জমিয়ে গল্প বলবার ক্ষমতা ছিল, ছেলেরাও তাঁর মুখে গল্প শোনবার জন্যে ব্যগ্র থাকত। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের শুধু ক্লাস পড়িয়েই শিক্ষকতা শেষ হয় না। তাঁরা ছেলেদের সারাক্ষণের সঙ্গী। তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, তাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, চড়ুইভাতি করা, সন্ধ্যাবেলায় বিনোদন-পর্বে গল্প বলা— এ-সব সকল কাজে নেপালবাবুর ছিল সমান উৎসাহ। ছেলেরাও সকল রকমের আবদার তাঁর কাছেই এসে করত। কঙ্কালীতলার মেলা কিংবা ফুল্লরার পীঠস্থান দেখতে যাবে তো সঙ্গে যেতে হবে নেপালবাবুকে। 'সকল কাজের কাজী' আর কাকে বলে! আশ্রমবাসীদের কাছে বিশেষ করে ছেলেদের কাছে নেপালবাবুর ছিল নানা রঙের রঙ্গ, কাজেই ছেলেরা ছিল তাঁর সকল কাজের সঙ্গী, তাঁর সকল রসের রঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন। নেপালবাবুর শখ হল কবির অভ্যর্থনার জন্যে একটি নতুন প্রবেশ-পথ এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ করতে হবে এবং সেই নতুন পথেই তিনি আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন। নেপালবাবু ছেলেদের নিয়ে উঠেপড়ে লেগে গেলেন।

শুধু দিনের বেলায় নয়, রাত্তিরেও রাস্তা নির্মাণের কাজ চলতে লাগল। অন্যান্য অধ্যাপকরাও উৎসাহের সঙ্গে সে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যথাসময়ে কাজ শেষ হল এবং ঐ নতুন পথেই রবীন্দ্রনাথ সেবার আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। চীন ভবনের সম্মুখে ঐ রাস্তাটি এখন নেপাল রোড নামে পরিচিত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা, আশ্রম প্রাঙ্গণের রক্ষণাবেক্ষণ, শ্রীবৃদ্ধিসাধন ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই তিনি সমান দৃষ্টি রাখতেন। অধ্যাপক কর্মীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। সকলে তাঁর উপরেই নানা বিষয়ে নির্ভর করতেন এবং নেপালবাবুও সে দায়িত্ব সানন্দে বহন করতেন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির তার-বার্তাটি রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—এই নিন, এবার আপনার জলনিকাশের প্ল্যান বা ড্রেন তৈরির ব্যবস্থাটা করে নিতে পারেন কিনা দেখুন। অর্থাৎ তিনিই যে আশ্রমের প্রধান কর্মকর্তা সে কথাটি রবীন্দ্রনাথেরও বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর একটি ছড়ায় নেপালবাবুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'নৃপাল রাজকাজে সঁপিয়া হস্ত/সবদিকে রাখেন চোখ।' বলা বাহুল্য, এখানে রাজকার্য বলতে শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর পরিচালনার কাজ।

নেপালবাবুর মস্ত বড়ো গুণ যে তাঁর মনটি ছিল আশ্চর্যরকম নমনীয়। তাকে তিনি ইচ্ছামত হেলাতে দোলাতে পারতেন। শিশুমহলে শিশুর ন্যায় অজ্ঞ, প্রাচীনের আসরে সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেমানুষিতে মত্ত, আবার সে মানুষই বিদ্যালয় পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর আলোচনায় রত। এক সময়ে ছোটোদের জন্যে আলাদা করে মন্দিরে উপাসনার ভার দেওয়া হয়েছিল নেপালচন্দ্রের উপরে। সে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সকলের চেয়ে যেটি প্রধান ভাব সেই একটি মাতৃভাব আপনার মধ্যে দেখিয়াছি, সেইজন্যই আমি বুঝিয়াছি আপনি অন্তরের মঙ্গল কামনা দিয়া ছাত্রদিগকে যাহা বলিবেন ঈশ্বর তাহাকেই উপাদেয় করিয়া তুলিবেন।' নেপালবাবু তাঁর মন্দিরের উপাসনায় ছেলেদের কাছে কখনো মহাপুরুষদের, কখনো বীরপুরুষদের জীবনকথা বলতেন, কখনো এ-সব বাদ দিয়ে হ্যারো ইটন্-এর ক্রিকেট খেলার গল্পও বলেছেন। বলার গুণে যা বলতেন তাই উপাদেয় হত। ছেলেরা তন্ময় হয়ে শুনত। নীতিকথার ছড়াছড়ি থাকত না কিন্তু কথার মাধুর্য ছেলেদের মনে আপনিই একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিত।

সরল শিশুমনের খোরাক জোগানোর ভার যেমন তাঁর উপরে পড়ত তেমনি আবার বিদ্যালয়ের জটিল সমস্যাদির জট ছাড়াবার জন্যে সর্বাগ্রে তাঁরই ডাক পড়ত। 'নিজে সংসারী মানুষ ছিলেন না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সংসার পরিচালনার ভার বহুলাংশে তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিল। একাধিকবার আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্যোগপর্বে পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান রচনায়ও নেপালবাবুর অনেকখানি হাত ছিল। আইনজ্ঞ মানুষ ছিলেন বলে এ-সব ব্যাপারে তাঁর মতামতকে সকলেই যথেষ্ট মূল্য দিতেন। দিনান্তিকা চা-চক্র এবং চক্রের সভ্যদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে গানটি (…চা-স্পৃহ চঞ্চল) লিখে দিয়েছিলেন তাতে নেপালবাবুকে 'কন্‌সটিট্যুশন-নিয়ম-বিভূষণ, তর্কে অপরিশ্রান্ত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে নেপালবাবু যেমন জাঁকিয়ে গল্প করতে পারতেন তেমনি অবিশ্রান্ত তর্কও করতে পারতেন। আর-একটি ব্যাপারেও নেপালবাবুর সহায়তা অত্যাবশ্যক ছিল। শান্তিনিকেতনের তখন অভাবের সংসার। ব্যয়সংকুলান এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বছরই বাজেট নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাতে হত। সে কাজটা বেশির ভাগ করতেন নেপালবাবু। একবার নেপালবাবু, জগদানন্দবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক নিজ নিজ বেতনের কতক অংশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও যখন কুলোল না তখন নেপালবাবু প্রস্তাব করলেন, যাঁদের বয়স ষাট উত্তীর্ণ এবং স্বভাবতই যাঁরা একটু বেশি বেতন পাচ্ছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করবেন। এ প্রস্তাব অনুযায়ী যিনি সর্বপ্রথম অবসর গ্রহণ করলেন তিনি স্বয়ং নেপালচন্দ্র রায়। এ ছাড়া আর যাঁরা সে বছর তাঁর অনুগমন করেছিলেন তাঁরা হলেন জগদানন্দ রায় এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশ্রমবাসী সকলের কাছ থেকে তিনি যতখানি শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছেন সংসারে এতখানি খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। সমস্ত আশ্রম পরিবারটিরই তিনি ছিলেন অভিভাবকের ন্যায়। স্ত্রীপুরুষ সকলের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক— ছোটোদের দাদামশায়, বড়োদের জ্যাঠামশায়, অন্য সকলের কাছে মাস্টারমশায়। রাস্তায় চলতে সকলের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতেন, এবাড়ি-ওবাড়ি ঢুকে কুশল সংবাদ নিতেন, কখনো বসে গল্পে জমে যেতেন। মজলিসী মানুষের যেমন স্বভাব; সময়জ্ঞান ছিল না।

এজন্যে অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারতেন না। তাই নিয়ে নানা কৌতুকের সঞ্চার হত। একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি পরামর্শ-সভা ডেকেছিলেন। নেপালবাবু অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু পথে কারো বাড়িতে গল্পে মেতে গিয়ে আর হুঁশ ছিল না। সভায় গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সভার কাজ আদ্ধেক সমাধা হয়েছে। সভাশেষে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বললেন— আজ নেপালবাবুকে দণ্ড দিতে হবে। নেপালবাবু অপরাধীর মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আসনের পেছন থেকে একটি লাঠি তুলে নিয়ে বললেন— এই নিন আপনার দণ্ড। ঐ লাঠিটি আসলে নেপালবাবুরই। আগের দিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ভুলে ফেলে এসেছিলেন।

অত্যন্ত ভুলো প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর ভুলো মনের নানা মজার মজার কাহিনী এখনো শান্তিনিকেতনে প্রচলিত আছে। একবার নাকি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার সময় তিনি ছেলেকে ভুলে হাওড়া স্টেশনে ফেলে রেখে নিজে চলে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ-সব গল্পের কতক বানানো, কতক বাড়ানো। তবে আপন-ভোলা মানুষরা স্বভাব-দোষেই— স্বভাবগুণেও বলা যায়— অনেক কথা ভুলে যান। নেপালবাবু বন্ধুদের আহারে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে বলতে ভুলে যেতেন। তাই নিয়ে নেপালবাবুর স্ত্রীকে মাঝে মাঝে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হত। তবে অতিশয় সুগৃহিণী ছিলেন বলে তিনি তৎপরতার সঙ্গে সব সামলে নিতেন। আতিথ্যের ত্রুটি হত না, একটু বিলম্বে হলেও অতিথিরা ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হতেন। আহারের সঙ্গে ভুলো মনের কৌতুকটিও তাঁরা উপভোগ করতেন। নেপালবাবুর নিমন্ত্রণ এভাবে এক কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রিতেরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলছিলেন। শুনে রবীন্দ্রনাথ যখন খুব হাসছেন তখন একজন বললেন— তা গুরুদেব, যাই বলুন, নেপালবাবু আপনার বড়দাদার চাইতে ঢের ভালো। নেপালবাবুর আর যাই হোক, অতিথিদের দেখলে মনে পড়ে যায়; কিন্তু আপনার বড়দাদার দেখলেও মনে পড়ে না। সত্যি সত্যি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণের কথা বাড়িতে বলতে তো ভুলতেনই, নিজে যে নিমন্ত্রণ করেছেন সে কথাও ভুলে যেতেন।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই যে ব্যক্তিবিশেষকে ঘিরে নানা কাহিনীর প্রচলন তা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিটির বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। কিছু বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব না থাকলে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে লোকে গল্প তৈরি করে না। যে মানুষ অন্য পাঁচজনের মতো নয়, কথায় কাজে স্বভাবে চরিত্রে একেবারে স্বতন্ত্র, তাঁর সম্বন্ধেই লোকের কৌতূহল জাগে, তাঁকে নিয়েই গল্পগাথা তৈরি হয়। এঁদের নিয়ে লিজেণ্ড গড়ে ওঠে। বলতে বাধা নেই যে এঁদের কথায় কাজে অসংগতি এবং খামখেয়ালিপনার ছোঁয়াচও থাকে—ফলে নিত্যদিনের নিস্তরঙ্গ জীবনে ক্ষণে ক্ষণে ছোটোখাটো তরঙ্গের উৎক্ষেপ হয়। সেই তরঙ্গ থেকে যে অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয় তাই থেকেই লিজেণ্ডের উৎপত্তি। শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা থেকেই এ-সব লিজেণ্ডের জন্ম হয়েছে। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যাঁদের নিয়ে লিজেণ্ড তৈরি হয় তাঁরা সকলেই প্রাণবান ব্যক্তি আর যে সমাজ লিজেণ্ড তৈরি করতে এবং তাকে লালন করতে জানে সেও তার নিজ প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। এই যাঁদের কথা একে একে বলছি তাঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের Legendary figures— যেমন হৃদয়বান তেমনি প্রাণবান। আর শান্তিনিকেতন যে এঁদের নানা গল্প-গাথাকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আজও লালন করে আসছে তাও নিঃসন্দেহে তার গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে বলা চলে শান্তিনিকেতনের আদি এবং অকৃত্রিম আশ্রমিক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষের প্রথম ছাত্রদের তিনি অন্যতম। এখানকার পাঠ সমাপ্ত করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। বছর-চারেক বিদেশে থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরে এলেন। আজ থেকে সত্তর বছর আগে বিদেশী ডিগ্রির দৌলতে সরকারী কৃষিবিভাগে মোটা মাইনের একটা চাকরি পাওয়া কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু সন্তোষবাবু সে চিন্তাকে আমলই দিলেন না। সোজা চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। চাষবাস করতে হয় তো নিজের মতো করে এখানেই করবেন আর সেইসঙ্গে যে বিদ্যালয়কে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, সে বিদ্যালয়ের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত করবেন। সেই যে এসে বসলেন, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সর্ব শক্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনের সেবা করে গেলেন।

আমাদের সমাজে গুরুদক্ষিণা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। শিক্ষা সমাপ্তির পর গুরুকে কিছু প্রণামী বা সম্মান-দর্শনী দেবার রীতি ছিল। এখন কথাটাই আছে প্রথাটা নেই। শান্তিনিকেতনে গুরু ছিলেন, গুরুদেবও ছিলেন কিন্তু গুরুদক্ষিণার কথা কেউ উত্থাপন করেন নি। অবশ্য গুরুদক্ষিণার কথা শিষ্যেরই ভাববার কথা, গুরুর নয়। আর-একটা কথাও ভাবতে হবে, শান্তিনিকেতনে শান্তিনিকেতনই গুরু, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। কারণ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনটি গড়ে দিয়েছিলেন, সে জীবনের শিক্ষাই শান্তিনিকেতনের প্রকৃত শিক্ষা। সে শিক্ষা সন্তোষচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল এবং প্রকৃত গুরু সেই শান্তিনিকেতনকে কেউ যদি সত্যিকারের গুরুদক্ষিণা দিয়ে থাকেন তো দিয়েছেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতনের পরম আত্মীয়, রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি বরাবর বলে এসেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আশ্রমের প্রতি আত্মীয়জনোচিত স্নেহপ্রীতি ভালোবাসা প্রত্যাশা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ দাবি সর্বপ্রথম পালন করেছেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। তিনিই শান্তিনিকেতনের সর্বপ্রথম ছাত্র, যিনি শান্তিনিকেতনের সেবাতেই নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। বহুকাল আগের কথা, রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে সন্তোষচন্দ্রকে

লিখছেন— 'আজ আটই পৌষ। এই দিন আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের দিন— ঐ দিনের দিনপতি হচ্ছ তুমি। তাই আমি এখান থেকে তোমাকে স্মরণ করে আমার আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি।' আজ এতকাল পরেও সন্তোষচন্দ্রকেই বলা চলে প্রাক্তনের যথার্থ প্রতীক।

সন্তোষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। বন্ধুপুত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সন্তানবৎ স্নেহ করতেন এবং সন্তোষচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথকে আজীবন পিতার ন্যায় ভক্তি করেছেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র ছিলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ে সহপাঠী। দুজন একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দুজনকেই আবার একই সঙ্গে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়। একটি মালবাহী জাহাজে বেশ কষ্ট করেই তাঁদের যেতে হয়েছিল। বন্দরে বন্দরে থেমে, মাল নামিয়ে মাল উঠিয়ে জাপানে গিয়ে পৌঁছতেই তাঁদের পাঁচ মাস লেগে গেল। সেখান থেকে আর-এক জাহাজে আমেরিকায়। পূর্বব্যবস্থামত সেখানকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যা-বিভাগে তাঁরা ভর্তি হলেন। তখনো পর্যন্ত ভারতীয় ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য বেশির ভাগ বিলাতেই যেতেন, আমেরিকায় খুবই কম। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ করি এঁরা দুজনই প্রথম ভারতীয় ছাত্র। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে অতি অল্পদিনেই ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে দুই বন্ধুই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে আর্থার সীমুর নামে একজন অধ্যাপক এই দুই বিদেশী বালককে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। ক্রমে ঐ অধ্যাপক-পরিবারের সঙ্গে তাঁদের এতই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যে তাঁরা প্রায় তাঁদের ঘরের ছেলেই হয়ে গিয়েছিলেন। সীমুরপত্নী মায়ের ন্যায় তাঁদের স্নেহযত্ন করতেন।

এ শতাব্দীর প্রথম দশকে আমেরিকার শিক্ষিত মহলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল খুব সুবিস্তৃত ছিল না। শিক্ষিতরাও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি। শোনবার কথাও নয়, কারণ রবীন্দ্রকাব্যের ইংরেজি তরজমা তখনো প্রকাশিত হয় নি। সন্তোষচন্দ্রের মুখেই সীমুরদম্পতি প্রথম শুনেছিলেন যে তাঁর বন্ধু রথীন্দ্রনাথের পিতা আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি। শুনে তাঁরা খুব বিস্মিত হন এবং কবি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁদেরই মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথের নামটি বন্ধুমহলে প্রচারিত হয়েছিল। একদিন সীমুর-গৃহের একটি সান্ধ্য পার্টিতে সন্তোষচন্দ্র আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন, সেখানে সবাই তাঁকে

ধরে বসলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। তাঁদের অনুরোধে সন্তোষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটির সমস্তটা না হলেও বেশ খানিকটা অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতারা কেউ বাংলা জানেন না কিন্তু আবৃত্তিগুণে সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। বহুকাল পরে মিসেস সীমুর একটি প্রবন্ধে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন, বলেছেন— সন্তোষের মুখে নদী-জল-ধারার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি এখনো যেন কানে লেগে আছে—

তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।

বিদেশে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন ১৯০৬ সালে, ফিরে এলেন ১৯১০ সালে। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ এই অভিপ্রায় নিয়েই তাঁদের বিদেশে পাঠিয়েছিলেন যে ফিরে এসে তাঁরা নিজের হাতে চাষবাস করবেন। সন্তোষচন্দ্র গো-পালন বিদ্যাও শিখে এসেছিলেন; শান্তিনিকেতনে তিনি প্রথম একটি গোশালা স্থাপন করলেন। উত্তর ভারত থেকে ভালো জাতের গাভী আনানো হয়েছিল। ঐ গোশালা থেকে বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্যে দুধের জোগান দেওয়া হত। পরে আশ্রম এলাকার পূর্ব দিকের মাঠে চাষ-বাসের জন্যে সন্তোষবাবু প্রায় একশো বিঘা জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এখানকার অনুর্বর জমিতে এবং প্রধানত জলের অভাবে চাষের চেষ্টা খুব একটা সফল হয় নি। তারও চাইতে বড়ো কথা, তাঁর আয়ুতেই কুলোয় নি; এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগের পূর্বেই তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে। ঐ জমির একাংশে একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে তাঁর স্বল্পকালের জীবন তিনি এখানেই কাটিয়ে গিয়েছেন। ইক-মিক-কুকারের উদ্‌ভাবক ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

গোশালার কাজের সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের কাজও করতেন, ইংরেজির ক্লাস নিতেন, ছেলেদের **Mass drill, Fire drill** ইত্যাদি শেখাতেন। আশ্রমের সকল কাজের সঙ্গেই তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে আশ্রমের অতিথি পরিচর্যার দায়িত্বটি তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। অতিশয় বিনয়ী এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। সন্তোষবাবুর আন্তরিকতার গুণে শান্তিনিকেতন এক সময়ে অতিথিসেবার জন্যে খ্যাতিলাভ করেছিল। গান্ধীজি যখন তাঁর ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে প্রথম এখানে আসেন তখন তাঁদেরও দেখাশোনার

ভার সন্তোষবাবুর উপরেই পড়েছিল। নেপালবাবু গান্ধীজির সঙ্গে সন্তোষচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— He is the youngest and finest of our teachers। বাস্তবিকপক্ষে সন্তোষচন্দ্রকে শিক্ষক চরিত্রের আদর্শ বলা যেতে পারে। এমন মধুর চরিত্রের মানুষ সংসারে বিরল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর চৌপদীতে যথার্থই বলেছেন—

সন্তোষে নেহারিলে জুড়ায় আঁখি
শিশু সমান নিরদোষ!
কটু-ই বা কী, মধুর-ই বা কী
সব তাতেই তাঁর তোষ!

সন্তোষচন্দ্রের ন্যায় এমন নিষ্ঠাবান কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। যে কাজটিরই ভার নিতেন তাই নিখুঁতভাবে করবার চেষ্টা করতেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল। এজন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগের ভার রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রের উপরে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকতেন। ছাত্রপরিচালক পদটির যখন সৃষ্টি হয় তখন সন্তোষবাবুকেই সর্বপ্রথম সে কাজের ভার দেওয়া হয়। পরে এক সময় তিনি শিক্ষাপরিচালক নিযুক্ত হন। আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষের অধীনে শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত ব্যবস্থাপনা শিক্ষা-পরিচালককেই করতে হত। বিশ্বভারতী যখন স্থাপিত হল তখনো সন্তোষচন্দ্র ছিলেন তার প্রথম কর্মকর্তাদের অন্যতম।

ইতিমধ্যে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এলম্‌হার্স্ট সেখানে চাষবাস এবং গ্রাম সংগঠনের কাজ শুরু করেছেন। চাষবাসের কাজে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দুইই আছে বলে এলম্‌হার্স্ট নিজের সহযোগী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সন্তোষবাবুকে। পরে যখন গ্রামের ছেলেদের জন্য শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা হল তখন ঐ বিদ্যালয়ের ভার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হল সন্তোষচন্দ্রের উপর। রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন শিক্ষাসত্রে এমন সব ছেলেদের নেওয়া হবে যাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে পরীক্ষা পাস করানোর দাবি উঠবে না। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সে দাবি ছিল। পরীক্ষার দাবি মেটাতে গেলে প্রকৃত শিক্ষার দাবি অনেকখানি ছাড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই স্থির করেছিলেন শিক্ষাসত্রের শিক্ষাটা গ্রামজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, গ্রাম্য মানুষদের জীবিকার প্রতি লক্ষ রেখে প্রধানত হবে হাতে-কলমে শিক্ষা। এর

সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার যে পুঁথিগত অংশটি থাকবে সেটি হবে পরীক্ষামুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এবং এলমহার্স্ট দুজনে মিলে শিক্ষাসত্রের পরিকল্পনাটি রচনা করেছিলেন। এখানকার শিক্ষাক্রম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনুরূপ ছিল না। লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এগজামিনের পড়া তৈরি করার তাগিদ ছিল না। একান্তভাবে গ্রামের ছেলেদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলে শিক্ষাসত্রের শিক্ষাটা এমন ধরনের ছিল যাতে এখানকার পাঠ সমাপ্ত করে ছেলেরা গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ বংশগত পেশা অবলম্বন করতে পারে এবং উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষালাভের দরুন অধিকতর উৎকর্ষের সঙ্গেই পৈত্রিক ব্যাবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। শিক্ষাসত্রে সাধারণ পঠন-পাঠনের সঙ্গে চাষের কাজ, গো-পালনের কাজ, হাঁস-মুরগি-পালনের কাজ শেখানো হত।

১৯২৪ সালে ছ'টি ছেলেকে নিয়ে শিক্ষাসত্রের কাজ শুরু হয়েছিল প্রথমটায় এই শান্তিনিকেতনেই। সন্তোষবাবুর নেতৃত্বে ঐ ছ'টি বালককে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষারীতির সৃষ্টি হল। পরে গান্ধীজি যে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন তা অনেকটা এরই অনুকরণে। ছেলেরা রান্নাবান্না থেকে শুরু করে, ঘরদোর সাফ করা, বাগান করা ইত্যাদি ইস্কুলের সকল রকম কাজ নিজের হাতে করত। সন্তোষবাবু ছেলেদের সঙ্গে সকল কাজে সমান অংশ নিতেন। শুধু মৌখিক নির্দেশ দিয়ে নয়, সব কাজই নিজের হাতে করে ছেলেদের শিখিয়েছেন। তার সঙ্গে পড়াশোনা এবং সংগীতচর্চাও চলত; শরীরচর্চার জন্যে ব্যায়ামও শেখাতেন। ছেলে ক'টিকে যেমন শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন, তাদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন তেমনি তাদের আনন্দেও রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যথাস্থানে যথাযোগ্য মানুষটিকেই বসিয়েছিলেন। জানতেন যে এ কাজে সন্তোষচন্দ্রের ন্যায় তাঁর একান্ত অনুরক্ত মানুষই যোগ্যতম ব্যক্তি। সত্যি বলতে কি, সন্তোষবাবু ঐ শিক্ষাসত্রের কাজে একেবারে যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবই ছিল ঐ, যে-কাজটিরই ভার নেবেন তাই প্রাণমন দিয়ে করবেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালে যে বিপত্তি ঘটেছিল শিক্ষাসত্রের বেলায়ও তাই ঘটল। সতীশচন্দ্র রায় এবং মোহিতচন্দ্র সেন দুজনেই বৎসরকালমাত্র শান্তিনিকেতনের সেবা করে চিরবিদায় নিলেন। সন্তোষচন্দ্রও অকালেই চলে গেলেন। টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হল। শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠার পরে

অতি অল্প দিনই তিনি এর কার্য পরিচালনা করতে পেরেছেন— পুরো দুটি বছরও নয়। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষাসত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে দিয়েছিলেন যে চরিত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। সন্তোষবাবুর মৃত্যুর পরে শিক্ষাসত্র শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হল। এলম্‌হার্স্ট সাহেবের অনুরোধে নন্দলাল বসু মশায় কিছুদিনের জন্যে শিক্ষাসত্রের পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি পর্যবেক্ষক হিসাবেই কাজ করতেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একজন সহকারী অধ্যাপক দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এ ব্যবস্থাও খুব বেশি দিন চলে নি। নন্দলাল বসু বলেছিলেন, 'সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুতেই শিক্ষাসত্র কানা হয়ে গেল।' সত্যি বলতে কি, এর মূলগত উদ্দেশ্যটি তিনিই ঠিক বুঝে নিয়েছিলেন। পরে নানা হাত হয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এখন সেটি একটি গতানুগতিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে এবং শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রে একই পাঠক্রম অনুযায়ী একই পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈরি করা হচ্ছে। এটি রবীন্দ্রনাথের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

সন্তোষচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্তিমান অনুগামী আর দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কথা তাঁর কাছে বেদবাক্যের মতো ছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্মীদের ডেকে যখন যে কথা বলেছেন তার সমস্তই তিনি টুকে রাখতেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব আখ্যাটিকে আমি কোনো কালেই খুব একটা মানানসই ব্যাপার বলে মনে করি নি। কবি মানুষ গুরুদেব হতে যাবেন কেন? তা হলেও বলব রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব আখ্যাটি কারো মুখে যদি মানিয়ে থাকে তো সন্তোষচন্দ্রের মুখেই মানিয়েছে। তিনি তাঁকে যথার্থই গুরু-জ্ঞানে মান্য করতেন। সকল কাজে সকল ভাবনায় তিনি তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে একেবারে যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সেই কথাটি স্মরণ করেই সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পরে গভীর দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে— সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড়ো এবং সত্য বিভাগ, তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। মনে হচ্ছে সেখানে যেন ফাঁক পড়ে গেল। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল, কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত—

আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো আঘাত ছিল। যে একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না।'

রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশ থেকে স্বদেশে ফিরছিলেন, এ মর্মান্তিক সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁচেছিল সমুদ্রপথে সুয়েজে। পূর্বোক্ত কথা-ক'টি তখনই এক চিঠিতে লিখেছিলেন। অপর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'সন্তোষের কথাটা ভুলতে পারিনে।··· যৌবন সমাপ্ত হতে-না-হতে ওর জীবন সমাপ্ত হল। তবুও ওর জীবনের ছবি সুব্যক্ত। চার দিকে কত লোক ব্যাবসা করছে, চাকরি করছে, সংসার করছে, সমস্তটাই ঝাপসা। তাদের দিনগুলো দিনের স্তূপ, একটার উপর আর-একটা জড় হয়ে উঠেছে, সবগুলো মিলে কোনো রূপ ধরছে না। সন্তোষের জীবন তেমন রূপহীন জীবন নয়। মনে পড়ছে, এই সেইদিন এল আমেরিকার শিক্ষা শেষ করে। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা করে নিলে। তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এই কাজের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবিতে আমরা প্রতিদিন যে কাজ করে থাকি তার কোনো উদ্‌বৃত্ত নেই। নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি সাধনার সঙ্গে সন্তোষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়ে ছিল যে সাধনা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মণ্ডলের অতীত। তার শ্রদ্ধা-প্রদীপ্ত জীবনের সেই পরিণতির ছবিটি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনকে যে কয়জন অসাধারণ ব্যক্তি শান্তিনিকেতন করিয়া তুলিয়াছেন, অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম।' মনে রাখতে হবে যে, শান্তিনিকেতনকে শান্তিনিকেতন করা শুধুমাত্র কর্তব্য-কর্মযোগে সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয়েছে স্বভাবধর্মযোগে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যাঁদের স্বভাবের মিল হয়েছে তাঁরাই শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে কিছু নিতে পেরেছেন এবং শান্তিনিকেতনকে কিছু দিতেও পেরেছেন। এই দেওয়া-নেওয়া নিয়েই শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে অনেক বিদেশীই শান্তিনিকেতনে এসেছেন, এখনো আসছেন। সংসারের যা নিয়ম— এসেছেন, থেকেছেন আবার চলে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে শুধু দুজন বাঁধা পড়ে গেলেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে। এঁরা দুজন হলেন অ্যাণ্ড্রুজ আর পিয়ারসন। দুজনেই বলতে পেরেছেন— 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।' শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের সুর মিলে গিয়েছিল। এঁরা মনেপ্রাণে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক। শান্তিনিকেতনের জীবন-সাধনায় এঁরা যেভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তেমন খুব কম লোকই করেছেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তখনো নাবালক, বয়স বারো-তেরো বছরের বেশি নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই কেন্দ্র ব্যক্তি, তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তির যেমন প্রসার হয়েছে, শান্তিনিকেতনের নামও তেমনি দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছে। এজন্যে ওর সাবালক হতে খুব বেশি দিন লাগে নি। নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বিশ্বখ্যাতি লাভ করলেন সেদিন শান্তিনিকেতনের নামও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে গিয়ে পৌছল। তা হলেও এ যাবৎ যাঁরাই এসেছেন রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণেই এসেছেন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ভাব হয়েছে পরে। স্বীকার করতেই হবে শান্তিনিকেতনেরও একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, মানুষের মনকে টানতে জানত। অ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ারসন দুই বন্ধুই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের টানে, কিন্তু এসে শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, শান্তিনিকেতনকেও মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেদিন বিশ্বখ্যাতির প্রবেশদ্বারটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেই দিনটিতে অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগসূত্র সেদিনই রচিত হয়েছে। এর অনতিকাল পরে অ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ারসনের শান্তিনিকেতনে আগমন স্বভাবতই তাৎপর্যপূর্ণ। সাগরপারের প্রথম অতিথির আগমন এবং শান্তিনিকেতনের আতিথ্যের বিস্তার সেই প্রথম ঘটল। পরে তো কতজনই এসেছেন কিন্তু অ্যাণ্ড্রুজ এবং পিয়ারসনকে আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের আত্মীয়-সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গতার স্মরণীয় প্রতীক বলে মনে করি।

১৯১২ সালে বিলাতে রোটেনস্টাইনগৃহে যেদিন গীতাঞ্জলির কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়েছিল সেই একটি দিনেই কবি বিদেশী বহু গুণীজনের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। সে বন্ধুত্বের কাহিনী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়, বন্ধুজনরাও সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বরণীয়। কালের বিবর্তনে, স্থানকালের ব্যবধানে, অজ্ঞানে অদর্শনে সে বন্ধুত্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল কিন্তু সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর অনুরাগ দিনে দিনে বর্ধিত হয়েছে, বন্ধুত্ব গভীরতর হয়েছে এবং ক্রমে সে বন্ধুত্ব নিকটতম আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন হয়েছেন তাঁর একান্ত আপনজন তেমনি শান্তিনিকেতন হয়েছে তাঁর আপন ঘর, ভারতবর্ষ আপন দেশ। এই মানুষটি চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ।

প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটি কবির মুখেই শোনা যাক। বলেছেন, 'শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। অ্যাণ্ড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরপ্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।'

ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় আগে থেকেই। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, পেমব্রোক কলেজের ফেলো। দিল্লীতে এসেছিলেন সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের অধ্যাপক হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়ে অবধি মন ঝুঁকেছে শান্তিনিকেতনের দিকে, বন্ধু পিয়ারসন সমেত স্থির করেছেন দিল্লীর পাট তুলে দিয়ে চলে আসবেন শান্তিনিকেতনে। তবে যত তাড়াতাড়ি আসবেন ভেবে-

ছিলেন তত তাড়াতাড়ি আসা হয় নি। অ্যাণ্ড্রুজ একদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপর দিকে লোকালয়ের সেবক। এ দেশে এসে অবধি স্বচক্ষে দেখেছেন ইংরেজ দুঃশাসনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুর্ব্যবহার, দেখেছেন অসহায়ের নিপীড়ন। স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়দের আচরণে লজ্জিত মর্মাহত বোধ করেছেন। এখন আবার শুনছেন এ কুকীর্তিরই পুনরাবৃত্তি চলছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজি তার প্রতিবাদে সেখানে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছেন। একবার সেখানে গিয়েও অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখতে হবে আর ঐ প্রতিরোধ আন্দোলনটা ঠিক কী ধরনের তারও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে। দুই বন্ধুতে চলে গেলেন আফ্রিকায়। যাবার আগে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলেন। এর কয়েক মাস আগে আরেকবারও শান্তিনিকেতনে এসে সব দেখেশুনে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে জীবনে এক নতুন দিগ্‌দর্শন হল এবং দুজনের মধ্যে জীবনব্যাপী বন্ধুতারও সূত্রপাত হল। আর গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রটিও সেই তখনই এবং তাঁর দ্বারাই রচিত হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে পূর্ব-সংকল্প অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন। মোহিতচন্দ্র সেনের ন্যায় অ্যাণ্ড্রুজও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদানের উপযোগী প্রচুর বিদ্যাবত্তা নিয়ে শিশুমনের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। পিয়ারসন সম্পর্কেও ঠিক এ কথাই বলা চলে। মনে রাখতে হবে যে প্রথম দিকে যাঁরাই এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই নাম-যশের মোহ কাটিয়ে, সাংসারিক লাভালাভের কথা না ভেবে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র ছেড়ে, কোনো-কিছুর আশা না রেখে, শুধু কবি-সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধনের আনন্দে অতি ক্ষুদ্র এক বিদ্যায়তনের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। একে মস্ত বড়ো ত্যাগ বলতে হবে। বোধ করি ফলাকাঙ্ক্ষা করেন নি বলেই প্রত্যেকে অত্যাশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছেন। আরো কি, যা তাঁরা ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন তার সমস্তই বহুগুণ হয়ে তাঁদের হাতে ধরা দিয়েছে। এঁদের অনেকেই বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে তো বটেই, কেউ কেউ সারা ভারতের ইতিহাসেই স্থান পেয়েছেন। এই ক্ষুদ্র স্থানটিতে এসেই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন জীবনের এই এক বিচিত্র রহস্য।

অ্যাণ্ড্রুজ যখন এলেন তখন এই বিদ্যায়তনের মূর্তি অতি দীন, খ্যাতি যৎসামান্য। বলা বাহুল্য, তিনি এর আকারের ক্ষুদ্রতা, উপকরণের বিরলতা, আর্থিক অসচ্ছলতা— কোনো-কিছুকেই গ্রাহ্য করেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বেও তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। সবল চরিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা।··· নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল, এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয়কে আকর্ষণ করেছিল।'

মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিয়ে এসেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতনের দীন মূর্তির মধ্যেও তিনি অপরূপ লাবণ্য দেখতে পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন নামক দ্বিতল গৃহটি ছাড়া কয়েকটি খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর মাত্র সম্বল আর চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এতেই তিনি মুগ্ধ; যেখানে গিয়েছেন সেখানেই শান্তিনিকেতন জীবনের মহিমা এবং প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যের গুণকীর্তন করেছেন। বিদেশ-ভ্রমণকালে দূরদেশী শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে শান্তিনিকেতনের বার্তা শোনাতে গিয়ে বলেছিলেন— Words cannot describe the beauty of Santiniketan— শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। আপাত শ্রবণে কথাটাকে অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারত কিন্তু শান্তিনিকেতনের মর্ম যাঁরা বুঝেছেন তাঁরাই এর সত্যতা অনুভব করবেন।

পরিপূর্ণ জীবনচর্চার ক্ষেত্ররূপে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সম্ভাবনাটিকে অ্যাণ্ড্রুজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি সেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আকারে ক্ষুদ্র হলেও প্রকারে প্রকরণে ছিল বৃহৎ। প্রয়োজন অনুপাতে আয়োজন ছিল ঢের বড়ো। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হবে ইস্কুলের ছেলেদের পড়াবার জন্যে ব্রহ্মবান্ধবের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তির বা মোহিতচন্দ্র সেনের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে বা বাংলা সাহিত্য পড়াবার জন্যে বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের না হলেও চলত।

ইংরেজি শেখাবার জন্যে অ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ারসনের ন্যায় অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ডিগ্রিধারীর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ বিদ্যারম্ভে লঘু ক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন না। শিক্ষা বলতে তিনি যা ভেবেছেন বুঝেছেন তা কোনো আটপৌরে ব্যবস্থা দ্বারা চলতে পারে না। তাঁর শিক্ষা-ভাবনা এমন কিছু দাবি করেছে যা মেটাবার জন্যে শিক্ষককে শুধু বিদ্বান হলেও চলত না, তাঁকে গুণবান হতে হত। সেজন্যেই এক সময়ে শান্তিনিকেতনে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল। আবার শান্তিনিকেতনের জীবনটিকেও তিনি এমনভাবে গড়ে দিয়েছিলেন যে তার আকর্ষণেও গুণীব্যক্তিরা আপন তাগিদেই এখানে এসেছেন। অবশ্য এমন কথা কখনোই বলব না যে এখানে যাঁরাই এসেছেন তাঁর সকলেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তবে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে শান্তিনিকেতন জীবনের দাবি মেটাতে গিয়ে সাধারণকেও গতানুগতিকের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়েছে।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আর-একটি কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যা-কিছু ভেবেছেন, করেছেন তার কোনো-কিছুকেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। সব-কিছুকেই বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। বহুকাল পূর্বে বলেছিলেন— 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো' কথাটি নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তর্জীবন সম্বন্ধেই বলেছিলেন— তা হলেও লক্ষ করবার বিষয় যে তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গেও এর একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তাঁর ধর্মচিন্তায় কোনো বিশেষ ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায়ের বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর ধর্ম পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম— মনুষ্যত্বের ধর্ম। তিনি তার নাম দিয়েছেন মানুষের ধর্ম। কাব্য রচনার কালেও ঐ লক্ষ্যটিকেই সুমুখে রেখেছেন; তাঁর কাব্যের একটি বিশ্বমানবিক ভূমিকা আছে। তাঁর বিদ্যালয় সম্পর্কেও ঐ কথাটি বলা চলে। বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলে জনহীন এক প্রান্তরের মধ্যে যে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন সে তার আত্মীয়তাকে প্রসারিত করেছে প্রথম দিন থেকেই। কারণ সেদিন যাঁরা শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রেবাচাঁদ; তিনি সিন্ধু প্রদেশের লোক। অনতিকাল পরেই ছাত্ররাও এসেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ সারা ভারতের সঙ্গে তো বটেই বহির্বিশ্বের

সঙ্গেও নিয়ত যোগ রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া পর্যটক মানুষ ছিলেন, বিশ্ব-পরিক্রমা করেছেন— যেখানে যে ভালোটুকু দেখেছেন শুনেছেন তারই বার্তা শান্তিনিকেতনে বহন করে এনেছেন। তেমনি আবার তাঁর বাক্যে কর্মে কাব্যে সাহিত্যে সংগীতে বিশ্বভারতীর বাণী প্রচারিত হয়েছে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে। এ কাজে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন অ্যাণ্ড্রুজ। অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন শান্তিনিকেতনের roving ambassador বা ভ্রাম্যমাণ দূত। তাঁর মানবদরদী মন এবং সেবাপরায়ণ কর্মের দ্বারাই তিনি সর্বত্র বিশ্বভারতীর মানবিক আদর্শকে প্রচার করেছেন। এই যে পৃথিবীর নিত্যবহমান চিন্তা এবং কর্মধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা— শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। শিক্ষা ব্যাপারটা যে কত ব্যাপক তথাকথিত শিক্ষাবিদ্‌রাও সব সময়ে তা মনে রাখেন না। বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পৃথিবীর নানা স্থানে কত অন্যায়, কত অনাচার অবিচার— কোথাও এর একটা প্রতিবাদ থাকবে না? ঐ কথাটির মধ্যেই বিশ্বভারতীর তথা সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যতম কর্তব্যের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। মানুষ যেখানে বিপন্ন নিরন্ন নিপীড়িত নির্যাতিত সেখানেই অ্যাণ্ড্রুজ ছুটে গিয়েছেন। এটা যতখানি তাঁর আপন স্বভাবধর্মের কাজ ততখানি বিশ্বভারতীরও কাজ। কেউ যেন মনে না করেন তিনি বেশির ভাগ সময় শিক্ষাবহির্ভূত কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কারণ, এটাও শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি শুধু পুঁথি-পড়ানো মাস্টার নন, তার চাইতে ঢের বড়ো তাঁর স্থান— তিনি দীনজনের বন্ধু, নিঃসহায়ের সহায়। দেশের লোক ভালোবেসে নাম দিয়েছে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ। সার্থক নাম বলতে হবে— দীনদুঃখীর এমন বন্ধু সংসারে কমই দেখা গিয়েছে।

নানা স্থান থেকে নানা কাজে— বিশেষ করে আর্তত্রাণের কাজে ডাক আসত বলে স্থির হয়ে বসে রুটিনবাঁধা কাজ করা তাঁর পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হত না। অবশ্য আশ্রমে যখন থাকতেন তখন সকল কর্তব্যই যথাবিধি সম্পন্ন করতেন। তবে তাঁর আগমন নির্গমন অবস্থানের কোনোই নিশ্চয়তা ছিল না। একবার বেশ কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে হঠাৎ ফিরে এসে ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে বললেন, অনেকদিন ক্লাস বাদ গিয়েছে, আজকেই তাঁর ক্লাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তাই করা হল। ছাত্রছাত্রীদের কাছে খবর পাঠানো হল, অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বিকেলবেলায় ক্লাস নেবেন।

ছেলেমেয়েরা বিকেলবেলায় এসে শুনলে, সাহেব দুপুরবেলাতেই জরুরি তলব পেয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন— ফিজি কিংবা মরিসাসে।

নিজেকে নিতান্ত ঘরের মানুষ মনে করতেন বলেই শান্তিনিকেতনকে এবং শান্তিনিকেতনের কাজকে তিনি এত সহজভাবে নিতে পেরেছিলেন। যখন আশ্রমে থাকতেন তখন তিনি পুরোমাত্রায় আশ্রমিক। যখন বাইরে যেতেন তখনো মুহূর্তের জন্যে শান্তিনিকেতনকে ভুলতেন না। নিজের সংগতি ছিল না কিছুই কিন্তু বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের দিনে যখন যেখানে গিয়েছেন সেখান থেকেই কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এনেছেন। সে দুর্দিনে আশ্রম প্রতিপালনে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। আশ্রম-বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ অত্যাবশ্যক ছিল। এক সময়ে শান্তিনিকেতনের পাঁচ জন মহামান্য অধ্যাপক বিশ্বভারতীর পঞ্চপ্রধান নামে পরিচিত ছিলেন। এই পাঁচ জন হলেন— নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন এবং সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ।

শিক্ষা জিনিসটাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে যাঁরা দেখবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় অ্যাণ্ড্রুজও এমন জাতের মানুষ যাঁর উপস্থিতি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই আশ্রমবাসীদের কাছে একটা প্রেরণার উৎস ছিল। এঁদের উপস্থিতিই সমগ্র পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে শিক্ষার পরিবেশনে পরিবেশের একটা মস্ত বড়ো অংশ আছে। বালক বৃদ্ধ সকলে অ্যাণ্ড্রুজকে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো বিষয়ে একটু প্রাচীনপন্থীও ছিলেন; কিন্তু তিনিও অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেন। বলেছেন, 'অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সত্ত্ব, দম, তপ, তিতিক্ষা, ত্যাগ ইত্যাদি দেখিয়া আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতাম।'

আপনভোলা সন্ন্যাসীসদৃশ মানুষ। নিজের জিনিসপত্রও গুছিয়ে রাখতে জানতেন না। কোথাও যেতে হলে এর ওর কাছ থেকে বিছানার চাদর, কম্বল, বালিশ ইত্যাদি নিয়ে যেতে হত। ফিরবার সময় অবশ্যই সে-সব জিনিস ঠিক ভাবে ফিরে আসত না— হয় ভুলে ফেলে আসবেন না-হয় তো আর কাউকে দিয়ে আসবেন। কখনো আবার অপরের জিনিসও তাঁর সঙ্গে চলে আসত। শুনেছি, একবার অতি সুন্দর একখানা আনকোরা

নতুন চাদর এনে রবীন্দ্রনাথের সুমুখে রেখে বললেন— Gurudev, here's a lovely present for you! গুরুদেব একনজর তাকিয়ে বললেন— Where did you steal it from? সাহেব একগাল হেসে বললেন, গুরুদেব, আপনি ঠিক ধরেছেন, এটা যে কী করে আমার জিনিসের সঙ্গে চলে এল বুঝতেই পারছি না। তাই ভাবলাম আপনাকে দিয়ে দিলে আমার দোষ স্খালন হয়ে যাবে। তাঁর এই ভুলো মনের দরুন অনেক সময়েই নানা কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতিকে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন। বলতেন, বড়ো ইংরেজ আর ছোটো ইংরেজ। এদেশের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটো ইংরেজের দৌরাত্ম্য দেখেছেন প্রচুর। কিন্তু ইংলণ্ডের সমাজজীবনে ইংরেজের চারিত্র মহিমা তাঁকে এক সময়ে মুগ্ধ করেছিল। সেই বড়ো ইংরেজকে তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ চরিত্রের অধঃপতন। তথাপি এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন যে তাঁর সেই মহদাশয় ইংরেজ যে একেবারে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অ্যাণ্ড্রুজ। বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে ইংরেজজাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে।'

অ্যাণ্ড্রুজের স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে মন্দিরের ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্য মানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে লাভ এখানে অক্ষয় হয়ে রইল। তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্যে এবং সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন— তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।'

উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন

শান্তিনিকেতনের চোখে অ্যাণ্ড্রুজ আর পিয়ারসন যেন দুই যমজ ভ্রাতা। লবকুশের ন্যায় চার্লি অ্যাণ্ড্রুজ এবং উইলি পিয়ারসনের নাম অনেক সময় এখানে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ১৯১২ সালে কবি যখন বিলাতে তখন অ্যাণ্ড্রুজের মতো পিয়ারসনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর বিদ্যালয়ের কথা শুনে পিয়ারসন বালকের ন্যায় পুলকিত। আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি— কেম্‌ব্রিজে বিজ্ঞান, অক্সফোর্ডে দর্শন অধ্যয়ন করে লণ্ডন মিশন সোসাইটি -পরিচালিত কলকাতার একটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আবার ভারতবর্ষে ফিরবার জন্যে অস্থির। স্বাস্থ্য ভালো ছিল না বলে মায়ের আপত্তি ছিল কিন্তু পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে রাজি হতে হল।

পিয়ারসনের আর তর সয় না। ১৯১২-র শেষ দিকে ভারতবর্ষে ফিরে এসেই ছুটে এলেন শান্তিনিকেতন দেখতে। রবীন্দ্রনাথ তখনো বিদেশ থেকে ফেরেন নি। অবশ্য তাতে অতিথি পরিচর্যার কোনো ত্রুটি হয় নি। সন্তোষ মজুমদার মশায় কয়েকটি ছেলে সমেত স্টেশন থেকে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। পথেই তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ছেলেদের সরল জীবন, তাদের হাসিখুশি ভাব, তাদের কণ্ঠে গান, মুখে মন্ত্রোচ্চারণ শুনে তিনি মুগ্ধ। সর্বোপরি শান্তি-নিকেতনের উদার প্রান্তর এবং শান্ত পরিবেশ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর সেই প্রথম আগমনের স্মৃতিটি তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনের একটি মনোরম বিবরণ দিয়ে তিনি 'শান্তিনিকেতন-স্মৃতি' (*Santiniketan*) নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এখানকার জীবনের সঙ্গে তিনি কতখানি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

১৯১৩-র নভেম্বর মাসে অ্যাণ্ড্রুজ এবং পিয়ারসন দুজনে মিলে আবার এলেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছেন। নির্যাতিত মানুষের প্রতি দুজনেরই অসীম মমতা।

দুই বন্ধুতে সংকল্প করেছেন, ঐ অভিনব আন্দোলনের ফলাফল স্বচক্ষে দেখবার জন্যে তাঁরাও যাবেন সেখানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনার জন্যেই তাঁদের আগমন। কবির অনুমতি এবং শুভেচ্ছা নিয়ে দুজনে চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সকলেই জানেন যে সেই তখন থেকেই অ্যাণ্ড্রুজ-পিয়ারসনের দৌত্যে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের সূচনা হল।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে, কয়েকদিন আগে-পরে দুজনেই এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। পিয়ারসনই এসেছিলেন আগে। অল্প দিনেই বাংলা ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। বলে নেওয়া ভালো যে অ্যাণ্ড্রুজ ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাঙালি সেজেছিলেন কিন্তু বাংলা ভাষাটি শিখতে পারেন নি। পিয়ারসন তাঁর ইংরেজি পোশাক ছাড়েন নি কিন্তু বাংলা ভাষা শিখে বাঙালি বনে গিয়েছিলেন। মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ; স্বভাবগুণে অল্প দিনেই শান্তিনিকেতনের ঘরের মানুষটি হয়ে গেলেন। ছেলেরা তাঁকে সে ভাবেই দেখত, আপনজনের মতো নানা আবদার নিয়ে আসত। তাদের জন্যে তাঁর ঘরে সব সময়েই কিছু খাবার মজুত থাকত। খাওয়াতে ভালোবাসতেন। শুধু ছেলেদের নয়, বন্ধুবান্ধব যিনিই যখন যেতেন কাউকেই কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। বাঙালি মায়েদের মতো তাঁর এই অভ্যাস আশ্রমবাসী সকলেরই জানা ছিল। তিনি বলতেন— আগের জন্মে আমি বোধ করি বাঙালি ছিলাম।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মর্মকথাটি পিয়ারসন অতি সহজে ধরতে পেরেছিলেন। একেবারে গোড়ার কথাটি হল— যাকে শেখাবে তাকে আগে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার তাগিদেই ছেলেদের উপযোগী পন্থা পদ্ধতি শিক্ষক আপনিই উদ্ভাবন করে নিতে পারতেন। পিয়ারসনকে কিছু বলে দিতে হয় নি। আপন স্নেহের টানেই ছেলেদের সঙ্গে গল্প করেছেন, তাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন— কখনো মেঘের রঙটি, কোথাও দূরের বনরেখাটি মনে ধরেছে তো ছেলেদের ডেকে দেখিয়েছেন, নিজে তন্ময় হয়ে দেখেছেন। তাঁর আবিষ্ট ভাবটি ছেলেদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ-সব কথা আমি তখনকার দিনের তাঁর ছাত্রদের মুখে শুনেছি। ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরেও ইংরেজি বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন। দু-একবার যখন কিছু বেশি দিনের জন্যে দেশে গিয়েছেন তখন সেখান থেকেও বিদ্যালয়ে ব্যবহারের

জন্ত ছেলেদের উপযোগী বই কিনে পাঠিয়েছেন। ইংলণ্ডে বসেও শান্তিনিকেতনের কথাই ভাবতেন।

ছাত্রদের যে তিনি কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন পূর্বোক্ত শান্তিনিকেতন-স্মৃতি নামক গ্রন্থটির পাতায় পাতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ছেলেদের অসুখে বিসুখে শয্যাপার্শ্বে বসে মায়ের মতো তিনি তাদের শুশ্রূষা করতেন। এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একটি ছেলে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মা এসে ছেলেকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে গেলেন। পিয়ারসন তাঁর অভ্যাসমত ছেলেটির সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার পরে পিয়ারসনের উদ্‌বেগের আর অন্ত নেই। খবর জানবার জন্যে অস্থির। মায়ের কাছে একটি চিঠি গেল। চিঠির মধ্যে বারোখানা টেলিগ্রাম ফর্ম— প্রত্যেকটিতে টিকিট লাগানো, ঠিকানা লেখা— পিয়ারসন, শান্তিনিকেতন। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে মায়ের কাছে আবেদন, প্রতিদিন যেন একটি টেলিগ্রামে খোকার খবর তাঁকে জানানো হয়। ঐ শান্তিনিকেতন-স্মৃতি নামক গ্রন্থটিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র যাদব নামক একটি বালকের যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে সেটিও শান্তিনিকেতন জীবনের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যাদবের শেষ কাতরোক্তি —ফুল আর ফুটবে না— পার্শ্বে উপবিষ্ট পিয়ারসনের আশ্বাস— ভয় নেই, ফুল ফুটবে— জীবন-নাট্যের এক অতি মর্মস্পর্শী দৃশ্য; ডাকঘরের অমল এবং ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে যায়। অমল বলছে— রাজার চিঠি কি আসবে না— ঠাকুরদা বলছেন— আসবে, চিঠি আজই আসবে।

বোধ করি রোগীর সেবায় তাঁর অক্লান্ত শ্রম এবং নিষ্ঠার কথা স্মরণ করেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে পরে শান্তিনিকেতন হাসপাতালটির নতুন করে নামকরণ হয়েছিল পিয়ারসন মেমোরিয়াল হসপিটাল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁর 'শান্তিনিকেতন-স্মৃতি' নামক গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি আগেই ঐ হাসপাতালের উন্নতিকল্পে দান করেছিলেন। মাঝে মাঝে এ উদ্দেশ্যে বাইরে থেকেও তিনি অর্থ সংগ্রহ করে এনেছেন। পিয়ারসনের স্মৃতিবিজড়িত এখানকার আর-একটি জিনিসেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পিয়ারসন তাঁর স্নেহ ভালোবাসা কেবল তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়েই ক্ষান্ত হন নি। শান্তিনিকেতনের গা ঘেঁষে যে সাঁওতাল পল্লীটি আছে, ছেলেদের নিয়ে প্রায় রোজই তিনি সেখানে যেতেন।

সাঁওতাল বালকদের সঙ্গে ছেলেরা খেলাধুলা করত; পিয়ারসন গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন। আশ্রমবাসীরা যেমন এরাও তেমনি তাঁর আপনজন হয়ে গিয়েছিল। তারাও তাঁকে সে ভাবেই দেখত, মন খুলে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলত। তাঁর ভালোবাসায় শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর ভদ্রের কোনো ব্যবধান ছিল না। অন্ত্যজ এবং অসহায়ের প্রতি করুণা ছিল অসীম। একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— গুরুদেব বড়ো সত্য কথা বলেছেন— ছোটো ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বোঝা যায় জাত নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরে তাঁর নামেই সাঁওতাল পল্লীটির নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রামটি পিয়ারসন পল্লী নামে পরিচিত।

পিয়ারসন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণে যান তখন অ্যাণ্ড্রুজ পিয়ারসন দুজনকেই নিয়েছিলেন সঙ্গী হিসাবে। পিয়ারসন সেক্রেটারির ন্যায় সকল কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন। আমেরিকা থেকে কবি যখন আবার জাপান হয়ে দেশে ফিরলেন তখন পিয়ারসন থেকে গেলেন জাপানে। কিছুদিন পরে সেখান থেকে যান চীনে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করে তিনি একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন; তাতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হন। বইখানার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল এবং চীন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তিনি স্বগৃহে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তাঁর বন্দীদশা ঘুচল। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ ভ্রমণে গেলেন তখন পিয়ারসন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হলেন। ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে ১৯২১ সালে পিয়ারসন আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। অনেক দিন পরে ফিরে এসে তাঁর যতখানি আনন্দ, আশ্রমবাসী সকলের ততখানি। ভাবটা যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। এরূপ মানুষ না থাকলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় এতদিন পরে সে শূন্যতা দূর হল।

দুঃখের বিষয় তা'ও খুব বেশি দিনের জন্যে নয়। পিয়ারসনের স্বাস্থ্য কোনোকালেই খুব ভালো ছিল না। ১৯২৪ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আবার ইয়োরোপে যান। ইতালি পরিভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে তিনি ট্রেনের

কামরা থেকে পড়ে যান। সে আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁকে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শোনা গিয়েছিল— My one and only love— India. মৃত্যুর আঘাত শান্তিনিকেতনে নতুন নয় তথাপি এমন সর্বজনপ্রিয় পরম আত্মীয়ের বিয়োগে সমগ্র আশ্রম যেন স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শুনেছি অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথও কেঁদে ফেলেছিলেন।

পিয়ারসনের শান্তিনিকেতন-প্রীতি যতখানি রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের প্রতি আসক্তিও ততখানি। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গোরা উপন্যাসের অনুবাদ। রবীন্দ্রকাব্যের ইংরেজ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ বলতে গেলে কিছুই হয় নি। আয়ুতে কুলোয় নি, নতুবা এই অতি মূল্যবান কাজটি পিয়ারসনের দ্বারা সুষ্ঠুভাবেই হতে পারত। তাঁর সাহিত্যানুরাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বলাকা কাব্যগ্রন্থটি পিয়ারসনকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রের কবিতাটিতে সহৃদয় মানুষটিকে উদ্দেশ করে লিখেছেন—

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য—
তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

শান্তিনিকেতনের মানুষদের যেমন নিজ হাতে সেবাযত্ন করেছেন তেমনি শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক রূপসজ্জায়ও পিয়ারসন নিজের হাত লাগিয়েছিলেন। একটি বিদেশী ফুলের লতা এনে কোণার্ক গৃহে রোপণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন নীলমণিলতা। বনবাণী কাব্যের 'নীলমণিলতা' নামক কবিতায় তার সকৃতজ্ঞ এবং সানন্দ উল্লেখ আছে। সবুজ রঙের কয়েকটি বিদেশী পাখিও পিয়ারসন শান্তিনিকেতনে এনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বনবাণীর 'পরদেশী' নামক কবিতায় ঐ-সব পাখির উল্লেখ এবং সেইসঙ্গে 'বিদেশী সখা'র প্রতি কৃতজ্ঞতারও উল্লেখ আছে—

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।

অ্যাণ্ড্রুজের মতো পিয়ারসনও এ দেশকেই আপন দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। পিয়ারসনের মা ছেলেকে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন; তাই দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে একটি ছোটোখাটো বাড়ি করে নিয়েছিলেন। দেহলি বাড়ির ঠিক সুমুখেই ছিল সেই বাড়িটি। পরে একতলা বাড়িটিকে দোতলা করা হয়েছিল, নাম ছিল দ্বারিক। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরে ঐ বাড়িতেই প্রথম সংগীতভবন এবং কলাভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। শ্রীসদন তৈরি হবার আগে কিছুদিন ছিল মেয়েদের হস্টেল হিসাবে। পরবর্তীকালে দ্বারিক গৃহটি শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ বিভাগের দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ছাত্র মিলে আমাদের বহু সুখস্মৃতি ঐ গৃহটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখন সেই স্মৃতিটুকুই আছে, গৃহটি আর নেই।

একদা যাঁদের একান্ত নিঃস্বার্থ সেবা লাভ করে শান্তিনিকেতন ধন্য হয়েছিল তাঁদের মধ্যে পিয়ারসনের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিদেশী নীলমণিলতাটি প্রতি বসন্তে যেমন নীল ফুলের স্তবকে স্তবকে অজস্রভাবে আপনার পরিচয়কে সগর্বে প্রচার করে, তেমনি বিদেশী সখা পিয়ারসনের স্মৃতিটিকেও নীলাঞ্জন আভায় সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত করে রাখে।

অসিতকুমার হালদার

রবীন্দ্রনাথই প্রথম এমন ইস্কুল গড়ে দিলেন যেখানে শুধু পুঁথি-পড়ার ক্লাস নয়, গানের ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস— এমন-কি, গল্প বলারও ক্লাস আছে। খেলাধুলা তো বটেই, ছাত্র-মাস্টার মিলে নাটকের অভিনয়ও বাঁধা ছিল। আশ্রমবাসী সকলে মিলে যে চড়ুইভাতি করা হত তাকেও শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই দেখা হত। শিক্ষা ব্যাপারটা যে একটা কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আনন্দের ব্যাপার সেটা শান্তিনিকেতনই দেশকে শিখিয়েছে।

বিদ্যা কথাটিকে শান্তিনিকেতন প্রথমাবধিই অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছে। বিদ্যাচর্চা বলতে শুধু পাঠচর্চা নয়, গুণচর্চা। সেজন্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পুথি-পড়া বিদ্যার উপরে যতখানি জোর দেওয়া হয়েছে ঠিক ততখানিই দেওয়া হয়েছে হাতে-আঁকা ছবির উপরে, হাতে-গড়া যে-কোনো সুন্দর জিনিসের উপরে; কিংবা সুরেলা গলায় গানের ক্ষেত্রে, মিঠে হাতের বাজনার উপর। সংগীত এবং চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা বলতে গেলে গোড়া থেকেই করা হয়েছিল। প্রথম দিকে যাঁরা ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওঙ্কারানন্দ, সন্তোষকুমার মিত্র এবং নগেন্দ্রনাথ আইচ। পরবর্তীকালে যাঁরা শিল্পী হিসাবে নাম করেছেন তাঁরাও বলেছেন যে এঁদের কাছেই ছবি-আঁকার হাতেখড়ি হয়েছিল। সন্তোষবাবু এবং নগেনবাবু খুব বেশি দিন শিল্প-শিক্ষকের কাজ করেন নি, অন্যবিধ কাজের ভার নিতে হয়েছে। তবে শান্তিনিকেতনের জীবনে এঁদের দুজনেরই একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিদ্যাদানের জন্যে যেমন ক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা এবং অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিধারীরা আসতে লাগলেন তেমনি অঙ্কনবিদ্যা শেখাবার জন্যেও প্রথমে এলেন প্রতিভাধর শিল্পী অসিতকুমার হালদার, পরে স্বয়ং নন্দলাল বসু। উভয়েই অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য। কলকাতা আর্ট-স্কুলে দুজনেই অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। অসিতকুমার জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত। তাঁর মাতা সুপ্রভা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিদি শরৎকুমারী দেবীর কন্যা।

আর্ট-স্কুলে শিক্ষা সমাপ্তির পরেও অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষানবিশি চলছিল। ঠিক ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আহ্বান এল শান্তি-

নিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন অসিতকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অবনবাবুর কাছে প্রস্তাব করলেন, 'অসিতকে এবার আমি নিজের কাছে রেখে ওকে দেখতে শেখাব; দৃষ্টি তৈরি হলে ওর হাতে যা তৈরি হয়েছে তোমার কাছে তা আরো সহজে কাজ করবে।' এই 'দেখতে শেখা' জিনিসটা একটা মস্ত বড়ো কথা। শুধু কবি বা শিল্পীর পক্ষে নয়, যে-কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই এটি অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় চোখ মেলে দেখতে শেখা এবং হাত লাগিয়ে কাজ করতে শেখার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৯১১ সালে অসিতকুমার এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। তাঁর উপরে ভার পড়ল ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যাদের ছবি আঁকায় আগ্রহ আছে এবং আঁকার হাতও আছে তাদের নিয়ে একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা। প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন মুকুল দে-কে নিয়ে, তার পরে একে একে এলেন ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, অন্নদা মজুমদার। সন্তোষ মিত্রও মাঝে মাঝে এসে ক্লাসে যোগ দিতেন। কলাভবনের কথা তখনো ভাবা হয় নি কিন্তু কলাভবনের সূচনা বলতে গেলে তখন থেকেই হয়েছে। পরে যখন কলাভবন স্থাপিত হল তখন অসিতবাবুই হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ। প্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকিংকর ঘোষ। নন্দলাল বসু তখনো স্থায়ীভাবে এসে কাজে যোগ দেন নি; আসা-যাওয়া করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর ইতিমধ্যে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। ১৯১৯ থেকে '২১ সাল পর্যন্ত অসিতবাবু কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং জগদানন্দ রায় -সম্পাদিত তখনকার 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হত তাতে বলা হয়েছে: 'কলাবিভাগের কার্য সবিশেষ প্রশংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ; ইহা দেখিয়া আমাদের বহু আশা হইয়াছে। এবার চিত্রকলা এবং শিল্পকলা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই এবার কতকগুলি নতুন চিত্র আঁকিয়াছেন।… এই-সমস্ত চিত্র 'প্রাচ্যশিল্প সমিতিতে' (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট) প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংসিত হইয়াছে। কোনো কোনো চিত্র বহুমূল্যে বিক্রিত হইয়াছে।'

শান্তিনিকেতনে আসার কিছুদিন পরে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ -কর্তৃক আহূত হয়ে অসিতবাবু গিয়েছিলেন রামগড়ে 'যোগীমারা' গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নেবার জন্যে। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন শিল্পীবন্ধু সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অসিতকুমারের লেখা ঐ ভিত্তিচিত্রের বিবরণ 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় তখন প্রকাশিত হয়েছিল। গুহাচিত্রের অনুলিপি করার কাজে প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯০৯-১০ সালে যখন বিলাত থেকে লেডি হ্যারিংহাম এসেছিলেন ভারতীয় শিল্পকলা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে। ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে এবং অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহে অসিতকুমার, নন্দলাল এবং সমরেন্দ্র গুপ্ত গিয়েছিলেন লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গী হয়ে অজন্তায়। তখনো অসিতকুমার 'ভারতী' পত্রিকায় অজন্তার চিত্রকলা সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুবই কম— বোধ করি বছর-কুড়ির বেশি নয়। পরে ঐ-সব লেখা 'অজন্তা ও বাগ গুহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

এর পরে আবার গুহাচিত্রের নকল নেবার জন্যে আহ্বান এল গোয়ালিয়র স্টেট থেকে। সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ বাগ গুহাচিত্রের অনুলিপি করার জন্যে গেলেন ১৯২১ সালে। এবারে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর। বাগগুহার চিত্রাবলী সম্পর্কেও তিনি 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিয়ু'তে লিখেছিলেন। তাঁর 'বাগগুহা রামগড়' নামক বইটি শান্তিনিকেতন প্রেস থেকেই ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এবারে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

তাঁদের অঙ্কিত বাগগুহা চিত্রাবলীর এক প্রস্থ কপি তাঁরা শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। কলাভবনের উদ্যোগে এখানে ঐ চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে অধ্যাপনার ফাঁকে তাঁর নিজের ছবি আঁকার বিরাম ছিল না। বহু ছবি এঁকেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সে-সব ছবি পাঠানো হয়েছে এবং শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে প্রচারিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের জীবন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে, এ কথা 'রবিতীর্থে' নামক গ্রন্থে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বলেছেন— বিশ্বের কাছে পরিচিত হবার প্রকৃষ্ট

স্থান বিশ্বভারতী। এখানে আসার অল্পদিন পরে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নামক কবিতা অবলম্বনে তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন। মিসেস ট্রেসি নামে এক মার্কিন মহিলা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে। তিনি ঐ ছবিটি পাঁচশো টাকায় কিনে নেন। তখনকার দিনের পক্ষে দামটা রীতিমত চমকপ্রদ বলতে হবে। ঐ সময়কার আর-একটি ছবিও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গান, 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে'— ছবিটি এই নামে এখন পরিচিত। এ ছবিটির একটি ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সরস্বতীর একটি ছবি আঁকতে বলেছিলেন। সে সরস্বতী হবে 'দিব্য-প্রজ্ঞা' সরস্বতী। বলেছিলেন, 'আমার উপযুক্ত সরস্বতী— তোদের ক্যালেণ্ডারের সরস্বতী নয়।' কবি তাঁর কল্পনায় কাব্য-সরস্বতীকে যে জ্যোতিদৃপ্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছিলেন সেই ভাবটি নিয়েই অসিতকুমার একটি 'অগ্নিময়ী সরস্বতী' আঁকলেন। রঙিন ছবিটি সম্পূর্ণ করে যখন রবীন্দ্রনাথের সুমুখে ধরা হল তখন তিনি উৎফুল্ল হয়ে গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জনে গেয়ে উঠেছিলেন, 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' গানটি সেই তখনই লেখা হল। অনেকেরই ধারণা এই গানটি অবলম্বন করেই ছবিটি আঁকা হয়েছিল। কিন্তু অসিতকুমার বলছেন— সেটা ঠিক নয়, ছবিটি দেখেই গানটি রচিত হয়েছিল। এ ছবিটি বিশ্বভারতী কলাভবনের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

বাংলার গ্রাম্যজীবন নিয়েও অসিতকুমার কিছু ছবি এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই থেকে এক তাড়া স্কেচ নিয়ে বলেছিলেন, প্রত্যেকটি ছবির জন্যে একটি করে কবিতা বা গান রচনা করে দেবেন। ছবি এবং গান মিলিয়ে একটি বই হবে। বইটির নামও কবি বাতলে দিয়েছিলেন— চিত্র-বিচিত্র। কিন্তু কবি চলে গেলেন বিদেশে, পরিকল্পনাটি আর কার্যে পরিণত হল না। ঐ গ্রাম্য ছবিগুলির একটিতে ছিল গ্রাম্যবধূ ঘড়া নিয়ে ঘাটে এসেছে জল নিতে কিন্তু কাজের কথা ভুলে গিয়ে আপন মনে একটি পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলে ভাসাচ্ছে। এই ছবিটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেছিলেন :

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।

অসিতকুমার নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শিল্পপ্রতিভা কেবলমাত্র ছবি আঁকাতেই আবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য শিল্পেও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিছু পারদর্শিতাও অর্জন করেছিলেন। অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথম প্রথম একটু বাধো-বাধো ভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সংকোচ কাটিয়ে দিলেন। 'অচলায়তন' সবে লেখা হয়েছে। অসিতকুমারকে নামিয়ে দিলেন উপাধ্যায়ের ভূমিকায়। পরে ফাল্গুনী এবং ডাকঘরের অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেছেন, দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। আর্টিস্ট হিসাবে মঞ্চসজ্জায় এবং অংশগ্রহণকারীদের মেক্-আপেও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর যে কাজ করেছেন গোড়ার দিকে সে কাজ করেছেন অসিতকুমার হালদার। এ-সব ছাড়া ছবি-আঁকার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর পরিমাণে লিখেছেনও। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। শুধু শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধাদি নয়— আগ্রহ ছিল নানা দিকে। কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, বহু-সংখ্যক একাঙ্ক নাটিকা লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে থাকার দরুনই তাঁর সৃজনী প্রতিভা এত বিচিত্র পথের সন্ধান পেয়েছিল।

১৯১১ থেকে ১৯২৩ সাল অবধি মোটামুটি ভাবে তিনি শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন। মাঝে কিছুদিনের জন্যে কলকাতা আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায় তাঁর সহকারী অধ্যক্ষ ক'রে। তখনো সুযোগ পেলেই তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন এবং কিছুদিন করে থেকে ছেলেদের ছবি আঁকায় সাহায্য করতেন। ১৯১৯ সালে যখন কলাভবন স্থাপিত হল তখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে চলে এলেন সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে। কলাভবনের কাজ খুবই উৎসাহের সঙ্গে করেছেন। তখনকার বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সে কাজের যে সপ্রশংস উল্লেখ ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। ঐ নতুন বিভাগটি সম্বন্ধে অন্যান্য অধ্যাপকদেরও একটি স্নেহমিশ্রিত কৌতূহল ছিল। ছেলেরা কে কী আঁকছে দেখবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ থাকত। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, মাঝে মাঝেই রঙ তুলি ইত্যাদি কিনে এনে ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

ব্যক্তিগতভাবে অসিতকুমারের সঙ্গে বিশেষ ভাব ছিল পিয়ারসনের। গল্প-গুজব, আলাপ-আলোচনা তাঁর সঙ্গেই বেশি হত। ১৯২৩ সালে পিয়ারসন গেলেন দেশে। অসিতকুমার ধার-কর্জ করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে পিয়ারসনের সঙ্গে চলে গেলেন বিলাতে। ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়

সাধনের উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলেন পশ্চিম দেশে। খুব বেশিদিন থাকা হয় নি; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালির নানা শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন করে কয়েক মাস পরেই দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে আসার অত্যল্পকাল পরেই তাঁর শান্তিনিকেতন-বাসে ছেদ পড়ল। ১৯২৪ সালে তিনি জয়পুর মহারাজের চারুকলা বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ ক'রে চলে গেলেন। সেখানে বৎসরকাল থেকে জয়পুর ছেড়ে আবার চলে গেলেন লখনৌ আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে। এর পরে আর স্থান বদল করেন নি; কর্মজীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি লখনৌতেই ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পরে বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়েছেন।

অসিতকুমারের শান্তিনিকেতনে অবস্থান খুব দীর্ঘদিনের নয়। মাঝে মাঝেই ছেদ পড়েছে, কাজেই, সব মিলিয়ে বোধ করি সাত-আট বছরের বেশি হবে না। কিন্তু কাজের মাপ তো কালের মাপে হয় না, হয় গুণের মাপে। কাজের যদি একটা বিশিষ্ট রূপ থাকে তা হলে অল্পদিন থেকেও স্থায়ী ছাপ রেখে যাওয়া যায়। সতীশ রায় এবং মোহিত সেন দুজনেই তো মোটে একটি বছর করে ছিলেন। কিন্তু সেই এক বছরে তাঁরা যা দিয়ে গিয়েছেন সে ঋণ কি শান্তিনিকেতন কোনো কালে শোধ করতে পারবে? আবার এমনও হয় দীর্ঘকাল থেকেও অনেকে কিছুই দিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি নিজেই ব'লে গিয়েছেন। বলেছেন, 'অনেকে এসেছেন, থেকেছেন, কাজও করেছেন কিন্তু সে কাজটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করে নি বলে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন।' অল্পদিন থেকেও অসিতবাবু যে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন তার কারণ তিনি শান্তিনিকেতনকে কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আবার শান্তিনিকেতনের জীবন থেকে এমন-কিছু তিনি নিয়েছেনও যা তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। গুণে গরিমায় তাঁর ব্যক্তিত্বটির মধ্যে বেশ একটি বর্ণচ্ছটা ছিল, সেটি যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদেরই মনে একটু রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। আমি একেই বলি শান্তিনিকেতনের জাদুস্পর্শ।

ভীমরাও শাস্ত্রী

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই। প্রথম সংগীত-গুরু দিনেন্দ্রনাথ, পরে তাঁকে সাহায্য করেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, আরো পরে তেজেশচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক সময় সন্ধ্যার বিনোদন পর্বে ছেলেদের নিয়ে গানের আসর জমাতেন। গোড়ার দিকে সংগীত শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো-কিছুকেই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখতে চান নি। রবীন্দ্র-সংগীত তাঁর একান্ত আপনার জিনিস, তাঁর বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে আদরের। তা হলেও সংগীত বলতে তিনি সকলপ্রকার কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্র-সংগীতের কথাই ভেবেছেন, কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের কথা নয়। হিন্দুস্থানী সংগীত তো বটেই, পাশ্চাত্য সংগীতের কথাও ভেবেছেন, বলেছেন। অর্থাভাবের দরুন কিছুদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে; কিন্তু সুযোগ হওয়া মাত্র আর বিলম্ব করেন নি। প্রথমে এসেছিলেন উত্তর-ভারতীয় দুজন মুসলমান ওস্তাদ। এঁরা খুব বেশিদিন ছিলেন না। পরে ১৯১৩-১৪ সালে এলেন পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। শান্তিনিকেতনে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষার পাকাপাকি ব্যবস্থা তাঁকে নিয়েই করা হল। তিনি একদিকে যেমন কণ্ঠসংগীতে পারদর্শী তেমনি আবার যন্ত্রসংগীতেও— তবলা এবং পাখোয়াজ খুব ভালো বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে পীঠাপুরমের মহারাজা যখন তাঁর দরবারের প্রসিদ্ধ বীনকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তখন ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁর কাছ থেকে বীণাবাদন শিখে নিয়েছিলেন। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী একাধিকবার এখানে এসেছেন কিন্তু একনাগাড়ে বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। সেজন্যে ভালো ক'রে তালিম নেবার জন্যে শাস্ত্রীজি একবার পীঠাপুরমে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। শাস্ত্রীজির উদ্দীপনায় বীণা বাজনায় এক সময়ে এখানে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এখনো ভাঙাচোরা অবস্থায় কিছু বীণা পড়ে আছে কিন্তু বীনকার নেই একজনও।

ভীমরাও শাস্ত্রী শুধু যে শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী ছিলেন এমন নয়, সংস্কৃত কাব্যে, সাহিত্যে, এবং শাস্ত্রাদি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কাব্যতীর্থ এবং সাংখ্যতীর্থ উপাধি ছিল।

একদিকে যেমন সংগীত শিক্ষা দিতেন, অপর দিকে তেমনি বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গেই করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন —ভীমরাও শুধু গানে নয়, জ্ঞানেও ওস্তাদ। তাঁর সেই সুপ্রসিদ্ধ চৌপদীতে বলেছিলেন—

বিশারদ নহেন গানে কেবল—
জ্ঞানেও ছ্যান ডুব সাঁতার।
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল
নখদরপণে তাঁর॥

যুবক বয়সে এসেছিলেন, যৌবনসুলভ উৎসাহ ছিল সমস্ত ব্যাপারে। বাংলা ভাষাটা ভালো জানা ছিল না, তাতেও পিছ-পা হন নি। প্রথম প্রথম ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতেন, পরে দিব্যি শিখে নিয়েছিলেন। এখানকার উৎসব-নাটকাদিতে সংগীতাংশে অংশ তো নিতেনই, তা ছাড়া ছাত্র এবং অধ্যাপকদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে প্রাচীন পদ্ধতিতে নান্দীগানসহ সংস্কৃত নাটক করাতেন। সংগীত শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি পুরোনোদের অনেকের মুখেই শুনেছি। শিক্ষার গুণে উচ্চাঙ্গ সংগীতও শিক্ষার্থীদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। শান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতি তাঁর পুরোনো ছাত্ররা বলেছেন যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্পর্কে তিনি সুরতাল সহযোগে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতেন যে অল্পবয়স্ক স্কুলের বালক হয়েও তাঁরা তাতে যথেষ্ট রস পেতেন। এ ছাড়া পুরোনো দিনের কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায়, সংগীত বিভাগের অনেকখানি কাজ তাঁকে এক হাতে সামলাতে হত। হিন্দীগান ছাড়াও বীণা মৃদঙ্গ এবং তবলা শেখাবার ভারও তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল।

শান্তিনিকেতন-শিক্ষার প্রাণময় ভাবাদর্শটিকে তিনি ঠিকমত ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্যে এখানকার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এতটুকু তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। আশ্রমজীবনের প্রতি মুহূর্তটিকেই তিনি উপভোগ করতেন। চা খেতেন না। কিন্তু দিনুবাবুর চায়ের আসরে নিত্য হাজির থাকতেন। কারণ, নানা বিষয়ের আলোচনায়, নানা রসের অবতারণায় সে মজলিসটি ছিল পরম উপভোগ্য। দিনুবাবুর কাছে বেশ-কিছু রবীন্দ্রসংগীত শিখে নিয়েছিলেন। শ্রীপঞ্চমীর দিনে দিনেন্দ্রনাথ ছেলেদের নিয়ে আম্রকুঞ্জে— শালবীথিতে গানের আসর বসাতেন। তখন ওটিই ছিল

রসন্তোৎসব। শাস্ত্রীজি খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গানে যোগ দিতেন, প্রয়োজন হলে তবলা বাজাতেন, জগদানন্দবাবু বেহালা নিয়ে বসতেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলা বসে। সেখানে বাউলদের বিপুল সমাগম, রাতভর গান চলতে থাকে। একবার ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁর কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে সেখানকার বিরাট বটগাছের তলায় বসে রবীন্দ্রনাথের বাউল গানের আসর বসিয়েছিলেন। সাগরেদদের মধ্যে ছিলেন অনাদি দস্তিদার, শচীন কর, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা প্রভৃতি। আসরও খুব জমেছিল। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে 'দ্বারিক' গৃহের নীচ তলায় শাস্ত্রীজি তাঁর নিজস্ব গানের আসর জমিয়ে বসতেন। সাগরেদরা কেউ বাঁয়া তবলা, কেউ এসরাজ, কেউ বেহালা নিয়ে তাঁর গানের সঙ্গে সংগত করতেন। পুরোনোরা বলেন যে তাঁর কণ্ঠে অপূর্ব সব উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনবার সুযোগ তাঁদের হয়েছে। পুজোর ছুটির আগে এখন ছেলেমেয়েদের আনন্দবাজার বসে। ছেলেমেয়েরাই দোকান সাজিয়ে নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করে। আগেও তাই হত। শাস্ত্রীজি অধ্যাপক এবং ছাত্রদের একটি দল জুটিয়ে, প্রতি দোকানে গিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কিছু দান সংগ্রহ করতেন। সে অর্থ বিদ্যালয়ের দরিদ্রভাণ্ডারে জমা দেওয়া হত। আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন অগ্রণীদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে যখন কলকাতায় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন হত তখনো শাস্ত্রীজি বাদক এবং গায়করূপে সে দলের সঙ্গে থাকতেন।

প্রথম যখন আসেন তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষক হিসাবেই এসেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরে যখন আলাদা করে সংগীত বিভাগের সূচনা হল, তখন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ। দিনুবাবুর পরে অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভীমরাও শাস্ত্রী। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। তার কিছুকাল পরেই তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ ক'রে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান। অধ্যক্ষের দায়িত্বটি তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদন, সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'সংগীত বিভাগের কার্য অতি সন্তোষপ্রদভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এই বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভূত উদ্যমে ও উৎসাহে সুশৃঙ্খলভাবে ইহা পরিচালনা করিয়াছেন।' প্রতি বৎসরের প্রতিবেদনেই এরূপ সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

চলে যাওয়ার আগে বিশেষ করে এই বিত্থালয়ের কথা ভেবেই তিনি আরো কিছু মূল্যবান কাজ করে গিয়েছেন। বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বাংলা অক্ষরে হিন্দী গানের দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন— তার একটির নাম 'সঙ্গীত দর্পণ', অপরটির নাম 'সঙ্গীত পরিচয়'। এ ছাড়া পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত রাগ-রাগিণীর পরিচয় দিয়ে 'রাগশ্রেণী' নামে একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। শাস্ত্রীজির আর-একটি কাজেরও বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলি' নাম দিয়ে গীতাঞ্জলির সমস্ত গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু গান যোগ করে দেবনাগরী লিপিতে তিনি রবীন্দ্র-সংগীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এবং তাতে প্রতিটি গানের যথাযথ স্বরলিপি রচনা করে দিয়েছিলেন। অবাঙালী সংগীত-প্রেমিকদের মধ্যে এই গ্রন্থটিকেই রবীন্দ্রসংগীত প্রসারের প্রথম সুসম্বদ্ধ প্রয়াস বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে শাস্ত্রীজিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর 'রাগশ্রেণী' নামক গ্রন্থটির জন্যও রবীন্দ্রনাথ একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ খুবই তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। সব সময়ে পণ্ডিতজি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর কণ্ঠে হিন্দী-গান শুনে তাতে বাংলা কথা বসিয়ে কিছু গান রচনা করেছিলেন। হিন্দীভাঙা গান নামে সে-সব পরিচিত। আবার শাস্ত্রীজিও রবীন্দ্রসংগীতে খুবই রস পেয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতে এতখানি আগ্রহ খুব একটা দেখা যায় না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যখন 'আমার শেষ পারানির কড়ি' এই গানটি গ্রামোফোনে রেকর্ড করানো হয় তখন গানটির সঙ্গে বীণা বাজিয়েছিলেন ভীমরাও শাস্ত্রী ; এসরাজ বাজিয়েছিলেন ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ।

প্রায় পনেরো বৎসর কাল তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। খাবার বেলায় স্বপাক খেতেন কিন্তু আর-সমস্ত ব্যাপারেই সকলের সঙ্গে তিনি মিলে মিশে থাকতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং তেজেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। এঁদের মতো অত দীর্ঘকাল তিনি এখানে থাকেন নি, কিন্তু যতদিন ছিলেন, এমন কায়মনোবাক্যে শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর সেবা করেছেন যে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তিনিও এঁদের মতোই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নন্দলাল বসু

ভারতীয় শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবনে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের প্রয়াসে অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য হিসাবেই কবির সঙ্গে নন্দলালের প্রথম পরিচয়। নন্দলাল তখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর কর্মী। পরে যখন জোড়াসাঁকো গৃহে বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় তখন নন্দলালকে দেখেছেন আর-একটু কাছে থেকে। সেখানে তিনি অঙ্কনশিক্ষার্থীদের ছবি-আঁকা শেখাতেন। রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমাদেবী ছিলেন তাঁর অন্যতমা ছাত্রী। 'বিচিত্রা'র উদ্যোগে ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের যে-সব নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার মঞ্চসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথের সহকারী হিসাবে নন্দলালের হাত ছিল অনেকখানি। অবনীন্দ্র-শিষ্যদের সকলকেই রবীন্দ্রনাথ স্নেহদৃষ্টিতে দেখতেন। একবার নন্দলাল, সুরেন কর ও মুকুল দে-কে তিনি শিলাইদহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পদ্মাতীরে প্রকৃতি দেবী যে বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভার সাজিয়ে বসে আছেন তারই প্রতি শিল্পীত্রয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ করি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। নিজ কাব্য-সৃষ্টিতে ঐ সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে তিনি যে সম্পদ আহরণ করেছেন, জানতেন যে এঁরাও সেখান থেকে কিছু রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারবেন এবং পারলে লাভবানই হবেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলতেন যে আঁকতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখতেও শিখতে হবে। তিন নবীন শিল্পী কবির সঙ্গে কখনো কুঠিবাড়িতে, কখনো বোটে নানা আলাপে আলোচনায় ক'টি দিন পরমানন্দে কাটিয়ে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় গুণের এমন সমজদার সংসারে বিরল। যখন যেখানে এত-টুকু গুণের আভাস দেখেছেন তখনই তাকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানিয়েছেন। গুণের আবিষ্কারে যেন ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয়'নি, গুণের সমাদরেও তেমনি এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। নন্দলাল প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে এলেন (কাজ নিয়ে নয়, শান্তিনিকেতন দেখতে) তখন কী বা তাঁর বয়স— সবে তিরিশের কোঠায় পা দিয়েছেন। কিন্তু সেই তখনই তরুণ শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে আম্রকুঞ্জে অভ্যর্থনা করেছিলেন। আলপনা-চিত্রিত, পদ্মফুলে সজ্জিত, ধূপগন্ধে সুরভিত সভাস্থলে বসানো হয়েছিল চন্দনচর্চিত ললাট, সলজ্জ নন্দলালকে।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা করে আশীর্বচন উচ্চারণ করেছিলেন। ঐ সময়েই আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে নন্দলাল বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে দেয়াল-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। একই সময়ে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সমাদৃত হলেন আমাদের তরুণ শিল্পী।

শান্তিনিকেতন সেই তখন থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলাভবনের কাজে এসে যোগ দিলেন ১৯১৯ সালে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে আবার তাঁকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের কাজে ফিরে যেতে হল। বৎসরকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন পাকাপাকিভাবে। ১৯২২ সালে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসরের একাগ্র সাধনায় কলাভবনকে একটি বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের খ্যাতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমে বিদেশে বিস্তারিত হয়েছিল।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দলালের আগমন এবং কলাভবনে যোগদান একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সকল দেশে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরীক্ষাগ্রহণ এবং ডিগ্রি-বিতরণ। বিদ্বান পণ্ডিত অধ্যাপকগণ বিদ্যাচর্চায় অবশ্যই লিপ্ত থাকেন, এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন; কিন্তু তার বেশির ভাগই ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ—এর দৌড় খুব বেশি দূর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের এবং দশের অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো মূল্যবান চিন্তার সৃষ্টি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই হয় নি। গ্রীক সভ্যতার আদি যুগে প্লেটোর অ্যাকাডেমি এবং অ্যারিস্টটলের লিসিয়াম্ বিদ্যালয়ে এমন কিছু মৌলিক চিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল যা বহু শতাব্দী ধরে মানবসমাজকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য বিদ্যার উৎপাদন এবং বিদ্যার উদ্‌ভাবনা। পূর্বোক্ত গ্রীক বিদ্যালয় দুটি অতি ক্ষুদ্র বিদ্যায়তন হয়েও প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য পালন করেছে। ইদানীং ইয়োরোপ-আমেরিকার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে নানা উদ্‌ভাবনার যে প্রয়াস চলছে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে তা খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। ঐটুকু বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেই ডিগ্রি-বিতরণ কেন্দ্র। এদিক থেকে বিশ্বভারতী সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, সে অনন্য। বিশ্বভারতী পৃথিবীর একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে একটি বিরাট সৃজনীপ্রতিভা

—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যদিনের জীবনকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। নিত্য নতুন গান রচনা হয়েছে, ছেলেমেয়েরা সে গানের সুরে মেতে উঠেছে। নতুন কবিতা বা গল্প লেখা হয়েছে, সকলকে ডেকে তা পড়ে শুনিয়েছেন। নাটক রচনা হয়েছে তো ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপকদের ডাক পড়েছে নাটকের মহড়ায়। রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান হিসাবে শান্তিনিকেতন হল সাহিত্যের পীঠস্থান। রবীন্দ্রসংগীত আজ সমগ্র দেশ জুড়ে— শান্তিনিকেতন সে সংগীতের জন্মস্থান। তার উপরে যখন কলাভবনের সৃষ্টি হল, তখন শান্তিনিকেতন হল ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বিশ্বভারতীকে শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে দেখলে তাকে ছোটো করে দেখা হয়। সংগীত সাহিত্য শিল্প— এই তিনের মিলনে বিশ্বভারতী একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। আন্দোলন তো সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে না, সে ঢেউ তুলে চারি দিকে নিজেকে ব্যাপ্ত করে। এক সময়ে সমস্ত দেশের শিক্ষা চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে সে প্রভাবিত করেছে। অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এখানেই বিশ্বভারতীর পার্থক্য। মননশীলতা এবং সৃজনশীলতা— এ দুয়ের মিলন এখানে যেমন ঘটেছিল এমনটি আর কোথায় ঘটেছে? রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ন্যায় দুই সৃজনী প্রতিভার সহযোগিতাকে শিক্ষাজগতে রীতিমত মণিকাঞ্চন যোগ বলতে হবে।

শিক্ষাকে যেখানে বৃহত্তম শিল্প অর্থাৎ জীবনশিল্প হিসাবে দেখা হয়েছে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান কথা শিল্পরুচি। সে কাজ গোড়ার দিকে শুরু করেছেন কবি নিজে। কবিমনের স্বভাবসুলভ শোভনরুচির ছাপ পড়েছে প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে যেখানে কোথাও একটু রঙ ছিল না, সবুজের আভা ছিল না সেখানে একটি যেন মরুদ্যান গড়ে উঠল। ক্ষয়ে-যাওয়া মাটির ক্ষয় নিবারণ হল। মাটির গায়ে সবুজের ছোপ লাগল, ছেলেদের মনেও। এ-সমস্তই কবির নিজ উদ্যমে সম্ভব হয়েছে। নন্দলালের আগমনের পরে আশ্রমের অঙ্গসজ্জায় তিনিই হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। কবি এবং শিল্পীর মিলনে দিনে দিনে শান্তিনিকেতন-জীবনের শ্রী সৌন্দর্য বাড়তে লাগল। কবির কাব্য, রঙে রেখায় রূপ গ্রহণ করল। প্রাচীর-গাত্রে দেখা দিল কচ-দেবযানীর কাহিনী, নটীর পূজার কাহিনী। রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জার ভার নিলেন নন্দলাল আর তাঁর সহশিল্পী সুরেন কর। যথার্থ

শিল্পরুচি জাদুমন্ত্রের কাজ করে। যৎসামান্য উপকরণের সাহায্যে সহজের মধ্যে সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলবার দুঃসাধ্য সাধনায় নন্দলালের অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ পেল। সুরকার হান্ডেল সম্পর্কে বীটোফেন বলেছিলেন— Go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means। রূপসজ্জার ব্যাপারে সামান্যকে অসামান্য করবার ক্ষমতায় নন্দলালের সমকক্ষ ব্যক্তি এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি। আমাদের মঞ্চসজ্জা এবং উৎসব-সজ্জায় এক নতুন ধারার প্রবর্তন হল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস মণ্ডপ সজ্জায় শিল্পের এই সহজিয়া সাধনার রূপ দেখে গান্ধীজি বলেছিলেন— নন্দলালজী তো জাদুকর হ্যায়। শান্তিনিকেতনের উৎসব-প্রাঙ্গণ প্রতি ঋতুতে তাঁরই হাতের ছোঁয়া লেগে প্রাণবন্ত হয়েছে। এক কথায় শান্তিনিকেতনের প্রসাধন-ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। সুন্দর জিনিস সারাক্ষণ চোখের সুমুখে থাকলে মানুষের রুচি অজ্ঞাতসারে মার্জিত হয়। চৈত্যর কাচে-ঢাকা আধারে ছবি কিংবা মূর্তি কিংবা কোনো হস্তশিল্পের নিদর্শন ছাত্রদের চোখের সুমুখে রাখা থাকত। রুচি অনুশীলনে এর মূল্য অপরিসীম। সংগীত সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। ছাত্ররা ক্লাস করছে, তারই মধ্যে দূর থেকে গানের সুর তরঙ্গিত হয়ে আসছে। ছকে বাঁধা জীবনকে ছন্দোবদ্ধ করেছে, এরও মূল্য কম নয়। চার্লস ল্যাম তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন— ঘরে বসে আমি লিখছি, আমার জানলার বাইরে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, তাদের রিনরিনে মিষ্টি গলার কলকোলাহল আমার কাজ অনেকখানি সহজ করে দিচ্ছে। বলেছেন, 'It is like writing to music. They seem to modulate my periods।' ছেলেপিলের কলরব যদি ক্লান্তি হরণ করতে পারে তা হলে তাদের মিঠে গলার গান যে কাজের মধ্যে কতখানি মাধুর্য এনে দিতে পারে— শান্তিনিকেতনে এই অভিজ্ঞতা নিত্যদিনের। রুটিনের রূঢ়তা ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মন থেকেই দূর হয়ে যায়।

ঋতু-উৎসবের অঙ্গসজ্জার কথা আগে বলেছি। এই সূত্রে বলা আবশ্যক যে রবীন্দ্রকাব্যে ঋতুবৈচিত্র্য বা প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীল রূপ যে স্থান অধিকার করেছে নন্দলালের চিত্রশিল্পেও ঠিক সেই স্থান দখল করেছে। সকল দেশেরই কাব্যে শিল্পে বিষয়বস্তু এককালে আহরণ করা হয়েছে প্রধানত পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক মাল-মসলা থেকে। অর্থাৎ সেকালের কাব্য-

শিল্প কিছু বা ধর্মকথা কিছু বা ইতিবৃত্তকথা। পশ্চিমদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কাব্যশিল্পের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়েছিল। পুরাবৃত্ত ইতিবৃত্ত ছেড়ে আমাদের নিত্যপরিচিত জগৎ কাব্যে সাহিত্যে স্থান পেল। ইংরেজি সাহিত্যে এ পরিচয়কে পরে ঘনিষ্ঠতর করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাঁর কাব্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— to give the charm of novelty to things of everyday life। অতি পরিচয়ে যে জিনিস উপেক্ষিত তার মধ্যে সৌন্দর্যের আবিষ্কার যথার্থ শিল্পীমনের পরিচায়ক। আমাদের সাহিত্যে ঐ কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে আমাদের মনকে সজাগ করে দিলেন। আমাদের ঘরের পাশের গাছপালা ফুলফল, আমাদেরই দোরের সুমুখ দিয়ে যে মানুষ হাটে যায়, গোরুর গাড়ি চালায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়ল।

আমাদের কাব্যে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাজটি করেছেন, চিত্রশিল্পে সেই কাজ করেছেন নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বুনো ফুলটিকেও অবহেলা করেন নি, বলেছেন— তোমার আসন কাব্যে দিলাম পেতে; নন্দলালের ছবিতেও তেমনি এতকালের শিল্পের উপেক্ষিতরা রেখায় তুলিতে ফুটে উঠল। বীরভূমের খোয়াই, গোরু-চরা মাঠ, সাঁওতাল মাঝি-মেঝেন, সমুদ্রতীরের নুলিয়া, পাহাড়ী মুটে মজুর— শিল্পের জগতে এদের সকলের স্থান করে দিলেন। আমাদের চিত্রশিল্পে এটি মস্ত বড়ো দান। এর অভিনন্দন মিলেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে নন্দলালকে সম্বোধন করে বলেছেন—

যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।

কিংবা

এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চৈঃশ্রবা ত্যেজে।

উচ্চৈঃশ্রবাকে ত্যাগ করে ছাগলের প্রতি মনোনিবেশ করার মধ্যেই পুরাবৃত্ত ছেড়ে পারিপার্শ্বিককে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের অভ্যাসজীর্ণ চোখ এবং মনকে নিত্য পরিচিত জিনিসের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত করেছেন নন্দলাল সেই জিনিসকেই তুলির স্পর্শে চোখের সুমুখে তুলে ধরে ঐ পরিচয়কে আরো অন্তরঙ্গ করেছেন। নন্দলালের প্রকৃতিবন্দনা কেবল-

মাত্র গিরিশৃঙ্গের শোভা এবং সূর্যাস্তের স্বর্ণাভায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রকৃতির মূর্তি বহু ক্ষেত্রে অতিশয় প্রাকৃত—

ওই যে গরিবপাড়া,
আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটির ছাড়া।
তার ও পারে শুধু
চৈত্রমাসের মাঠ করছে ধূ ধূ।

এই নিরাভরণ দৃশ্যের সৌন্দর্য নন্দলালের আবিষ্কার। এদিক থেকে নন্দলাল কবিগুরুর শিল্পী-শিষ্য। তাঁর শিল্পকর্ম অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির পরিপূরক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গ্রন্থে ছবির অলংকরণ নন্দলালের কৃত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে তিনি রঙে রেখায় রূপ দিয়েছেন। এ দিক থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম interpreter বা ভাষ্যকার। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথও নন্দলালের আঁকা চিত্র অবলম্বন করে বহু কবিতা রচনা করেছেন।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে যাঁরা এসে রবীন্দ্রনাথের কাজে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। সে প্রতিভাকে উৎসাহিত, উদ্দীপিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের যত্ন এবং চেষ্টার বিরাম ছিল না। চীন জাপান ভ্রমণে যখন যান তখন অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়েই ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসুকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু ছিলেন ভারতীয় সাধনার তত্ত্বানুসন্ধানী। প্রাচ্য জগতের অপর একটি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁর কাজে লাগবে, অপর পক্ষে চীনা এবং জাপানী শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচয় এবং শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নন্দলালের কাজের সহায়ক হবে— এ-সব ভেবেই ভ্রমণ-সঙ্গী হিসাবে তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যে বিশ্বভারতীর অবশ্যকর্তব্যের অন্তর্গত সে বিষয়ে কবি নিজে যেমন সর্বক্ষণ সজাগ ছিলেন তেমনি অন্যদেরও যথা-সম্ভব সচেতন রাখবার চেষ্টা করতেন। ঐ বিশ্ব-সাথে যোগসাধনের কাজে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন প্রধানত অ্যাণ্ড্রুজ দেশ-বিদেশে কর্মযোগে আর করেছেন নন্দলাল তাঁর শিল্পসাধনার যোগে। যে কালে বিদেশী ছাত্রদের এ দেশে আসার চলন হয় নি সেই তখনো দূর দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্বভারতীর

কলাভবনে এসে ভিড় করেছেন। এসেছেন সিংহল থেকে, চীন জাপান জাভা থেকে। শান্তিনিকেতনের 'নন্দন' ক্ষুদ্রাকারে এ যুগের নালন্দা।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাধনার স্থল শান্তিনিকেতন। সেই সাধনক্ষেত্রের প্রসাধন-ভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি বিনা সাধনায় সে কার্য সাধন করতে পারেন নি। নন্দলালের জীবন এক সাধনার জীবন। আমাদের দেশে বলে যোগীরা যোগাসন ছেড়ে ওঠেন না। নন্দলাল অর্ধ-শতাব্দীকাল বলতে গেলে যোগাসনে বসে কাটিয়ে দিলেন। অর্থ স্বার্থ, পদ-মর্যাদা, ক্ষমতার মোহ, বহির্জগতের সমারোহ কিছুই তাঁকে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। চতুর্গুণ মাহিনার চাকুরি একাধিকবার প্রত্যাখান করেছেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বহুজনের স্বার্থত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়।

শান্তিনিকেতন-শিক্ষার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক। সে সম্পর্ক যে কতখানি উদার, কতখানি মধুর হতে পারে স্বচক্ষে না দেখে থাকলে আজ কেউ তা বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে নন্দলাল এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কটি পুরাকালের গুরুশিষ্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছাত্রদের শুভাশুভ চিন্তায় তিনি তাঁদের অভিভাবক, সংকটে সমস্যায় সচিব, ললিত-কলাচর্চায় প্রিয় সখা। ছাত্র-শিক্ষক মিলে কলাভবনে একটি অতি স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ঐটিই শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ। শিক্ষক নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে শোকে অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।' প্রকৃত শিক্ষক যে কিভাবে আপন ব্যক্তিত্বকে চতুষ্পার্শ্বে পরিব্যাপ্ত করতে পারেন তার প্রমাণ— শুধু কলাভবনের ছাত্রদের কাছেই নয়, সমস্ত আশ্রমবাসীর কাছেই তিনি মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জিনিসটা একতরফা নয়— শিক্ষক-ছাত্রের সমবেত প্রয়াসের ফল। আপন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নন্দলাল নিজ মুখে বলেছেন, 'শেখাই নি, একসঙ্গে কাজ করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করেছি। আমারটা

দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি। কে মাস্টার, কে ছাত্র মনেই হয় নি।' এই হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কথা। ঐ এক কথায় শান্তিনিকেতন শিক্ষাপদ্ধতির মর্মকথাটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট বলেছিলেন —নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। শিক্ষকের কৃতিত্ব সম্পর্কে এর চাইতে বড়ো কথা আর হতে পারে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই শিক্ষার প্রধানতম উৎস। সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বুদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।'

সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, বিদ্যার বিকিরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সেদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি কেবলমাত্র তার নিজস্ব পরিধিতে আবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশে বিস্তৃত। শিক্ষা বিকিরণের আদর্শ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ এবং লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রকাশ বিশ্বভারতীর কর্মসূচীর অন্তর্গত করে দিয়েছিলেন। আবার গ্রন্থপ্রণয়নই শিক্ষা বিকিরণের একমাত্র উপায় নয়। রবীন্দ্রনাথের গান এবং নাটকের অভিনয়ও এ কাজে প্রচুর সহায়তা করেছে। নন্দলালও শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর এক অভিনব দান—তাঁর অঙ্কিত অগণিত স্কেচ। যখনই যার কাছে চিঠি লিখেছেন তখনই কার্ডের একদিকে কোনো-না-কোনো স্কেচ করে পাঠিয়েছেন। অটোগ্রাফ বইয়ের তো কথাই নেই। এরূপ শত শত স্কেচ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। লোকশিক্ষার এ এক অভিনব প্রণালী। এককালের লোক-সংগীত, লোকসাহিত্য যে কাজ করেছে শিল্পের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসু সেই কাজটি করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়।' কথাটি অনুধাবনযোগ্য।

নন্দলালের মতো এমন মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ যখন যেখানে উপস্থিত থেকেছেন তাঁর নীরব উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে প্রসন্ন করেছে। অসাধারণ মানুষও যে কত সাধারণভাবে চলাফেরা মেলামেশা করতে পারেন সেটা নন্দলাল বসুকে দেখে যতটা মনে হয়েছে এমন আর কাউকে দেখে নয়। পরনে খদ্দরের পাজামা, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, গলায় খদ্দরের চাদর, পায়ে স্লিপার। গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য চাদরটি মাথায় জড়িয়ে নিতেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকেও

দেখেছি বেশভূষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। গোঁসাইজি সমেত এমন আরো অনেকে জীবনযাত্রায় যেমন সরল, বাক্যে ব্যবহারে তেমনি সরস। আমাদের সময় মাস্টারমশাই এবং ক্ষিতিমোহনবাবুই ছিলেন সকল আশ্রমবাসীর অভিভাবকস্থানীয়। পথে ঘাটে দেখা হলেই সহাস্য স্নেহসম্ভাষণ লাভ করতাম এবং পুরস্কৃত বোধ করতাম।

কারুকলার ভাষা নির্বাক। শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গে কারুকলার ছাপ অর্থাৎ নন্দলালের উপস্থিতি সর্বত্র বিজ্ঞাপিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— রেখা অপ্রগল্‌ভা; সে নিজেকে কথনো সরবে ঘোষণা করে না। শিল্পের স্বভাব শিল্পীর মধ্যে বর্তায়। আগেই বলেছি এমন মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সংসারে বিরল। শিল্পসৃষ্টিতে তিনি যে সংযম দেখিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে সেই সংযম প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবহারে বা কাজে কথনো কোনোপ্রকার আতিশয্য প্রকাশ পায় নি। মানুষের ধর্মবোধ যেমন আচরণে প্রকাশ পায় তাঁর শিল্পধর্ম তেমনি নিত্যকার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে তিনি সার্থক করেছেন, 'আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে, তাঁর জীবনে। আমরা বারংবার তার প্রমাণ পেয়েছি নন্দলালের স্বভাবে।'

সময়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতন নানাভাবেই বদলাচ্ছে, বদলাবেও। তবু ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁদের মধ্যেই শান্তিনিকেতন-জীবনের রেশটুকু পাওয়া যেত। নন্দলালের দেহাবসানের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এক যুগের অবসান হল। যাঁদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীর সংসার পেতেছিলেন নন্দলালের মৃত্যুতে সে সংসারের শেষ প্রদীপটি নিবে গেল।

সুরেন্দ্রনাথ কর

একাধারে গৃহিনী সচিব সখী এবং প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ— এরূপ নারীরত্নের অভাবে অজ রাজার বিলাপ খুবই স্বাভাবিক। শান্তিনিকেতনও আজ এমন একজন মানুষের অভাবে কাতর যিনি সুদীর্ঘকাল সুনিপুণ গৃহিণীর ন্যায় শান্তিনিকেতন সংসারের পরিচর্যা করেছেন, সংকটে সমস্যায় যিনি ছিলেন পরামর্শদাতা-সচিব, উৎসবে ব্যসনে প্রিয় সখা, ললিতকলাচর্চায় আশ্রমগুরুর প্রিয় শিষ্য, অপর পক্ষে শান্তিনিকেতনের অন্যতম স্থপতি। একাধারে এত গুণের অধিকারী ঐ মানুষটির নাম সুরেন্দ্রনাথ কর। বাস্তবিক পক্ষে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সুরেনবাবুর সম্পর্কটি ছিল এমন নিবিড় যে এসে অবধি যত মানুষকে এখানে দেখেছি তার মধ্যে সুরেনবাবুকেই মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনের সর্বোত্তম সুহৃদ।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তখন সুরেনবাবুর গৃহে গৃহিণী নেই। সুকণ্ঠী গৃহিণী রমা দেবী (সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী) পূর্বেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুটি নাবালক পুত্র নিয়ে সুরেনবাবু আপন গৃহস্থালি দেখেন আর সেইসঙ্গে সমস্ত শান্তিনিকেতনের সংসারটি পরিচালনা করেন। এমন সুনিপুণ-গৃহিণীপনা সচরাচর দেখা যায় না। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-সচিব— প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রথীন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথের স্বভাবে আশ্চর্য মিল ছিল। দুজনেই অক্লান্তকর্মা কিন্তু কর্ম-ব্যস্ততার লেশমাত্র চিহ্নও দেহে মনে লক্ষ্য করা যেত না। মুখে প্রসন্ন হাসি, ব্যবহারে নিখুঁত সৌজন্য। দুজনেই নেপথ্যচারী মানুষ; সব কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজেরা থাকতেন অলক্ষ্যে। নিত্যদিনের কাজে তো বটেই উৎসবাদির ন্যায় বৃহৎ ব্যাপারে, শত শত অতিথির আগমনেও হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি হাঁক ডাক ছিল না। সমস্তই নীরবে নিষ্পন্ন হত। নীরব কর্মীর কথা কানেই শুনেছিলাম, চোখে দেখি নি। এঁদের দুজনকে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। এত কম কথায়, এত নিঃশব্দে সুবৃহৎ সমারোহ ব্যাপার সম্পন্ন হতে আর কোথাও দেখি নি।

শান্তিনিকেতনের জীবনধারার সঙ্গে তাঁদের কর্মধারাকে তাঁরা মিলিয়ে

নিয়েছিলেন বলেই এমন সহজ স্বচ্ছন্দ সুবিন্যস্তভাবে সকল কাজ সম্পন্ন হতে পারত। শান্তিনিকেতনের জীবনে যে একটি শোভন রুচির ছাপ ছিল তারই ফলে এখানকার সকল কাজে কর্মে সেই শোভনতার ছন্দটি বজায় থাকত। শুধু শোভনতা বললেও সবটুকু বলা হয় না, এর কর্মধারার মধ্যে এমন-কিছু অভিনবত্ব ছিল যা বাইরে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার উপলক্ষেই সেই অভিনবত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম এবং তাও সুরেনবাবুর মাধ্যমেই। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে একজন ইংরেজি শিক্ষকের প্রয়োজন, তৎকালীন সহ-কর্মসচিব ক্ষিতীশ রায় জানতে চেয়েছিলেন আমি আসতে রাজি কিনা। আমি তাঁকে সম্মতি জানিয়ে লিখেছিলাম। কদিন পরে শান্তিনিকেতন-সচিব সুরেন্দ্রনাথ করের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। লিখেছেন— আপনি আমাদের কাজে যোগ দিতে রাজি আছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমাদের দু-একজন সহকর্মীর কাছে আপনার কথা শুনেছি। শুনে মনে হয়েছে, আমাদের কাজ আপনার ভালো লাগবে এবং আপনাকেও আমাদের ভালো লাগবে। আর আশা করছি, আলাপ-পরিচয় হলে আমাদেরকেও আপনার কিছু খারাপ লাগবে না। অতএব আর কালবিলম্ব না করে যত শীঘ্র সম্ভব এসে আমাদের কাজে যোগ দিন···। বলা বাহুল্য, এটিই আমার নিয়োগপত্র। এরূপ নিয়োগপত্র শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কোথাও সম্ভব ছিল না। কাজে যোগ দিতে এসে প্রথম দিনটিতেই সুরেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; এ সাক্ষাৎটিও অভিনব বলতে হবে। প্রাথমিক আলাপের পরেই বলেছিলেন— স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করবেন, পঁচাত্তর টাকায় সংসার চলবে না। কিন্তু পঁচাত্তরটা কোনো কালে আশি হবে এমন আশ্বাস দিতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো ক্রমে কখনো কিছু অর্থাগম হয় তা হলে সামান্যটুকু হলেও সকলেই তৎক্ষণাৎ তার ভাগ পাবেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎ; পরে দিনে দিনে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ক্রমেই বেড়েছে।

মনে প্রাণে আর্টিস্ট মানুষ, আর্টের প্রতি প্রবণতা স্বভাবজাত। নন্দলাল বসুর আত্মীয়, মুঙ্গের জেলায় একই অঞ্চলের অধিবাসী। বোধ করি নন্দলাল-বাবুর দেখাদেখিই কলকাতায় এসেছিলেন ছবি আঁকা শিখতে। কিন্তু আর্ট-স্কুলে ভর্তি হন নি; ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে

একান্তে। শেখাটা তাতে ভালো ছাড়া খারাপ হয় নি। জোড়াসাঁকো বাড়িতে যখন বিচিত্রা ক্লাবের উদ্যোগে ছবি আঁকার ক্লাস খোলা হল তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ ছাত্রটিকে লাগিয়ে দিলেন শেখাবার কাজে। সুরেন্দ্রনাথ সেই ক্লাসে শেখান আর অবসর সময়ে নিজে শেখেন। এই করেই আঁকায় হাত এসে গেল। কিছুদিন পরে হাত পাকাবার আর-এক সুযোগ এল যখন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে দেয়ালচিত্র আঁকবার জন্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে আহ্বান এল নন্দলালের কাছে। নন্দলাল তাঁর সহকারী হিসাবে নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে।

বিচিত্রা ক্লাবের কাজে কচিৎ কখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, সামান্য পরিচয়ও হয়েছে। পরিচয়টা ভালো করে হল কিছুদিন পরে। একবার নন্দলাল বসু, মুকুল দে এবং সুরেন্দ্রনাথ কর তিনজন একসঙ্গে গেলেন শিলাইদহে। রবীন্দ্রনাথই তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শিলাইদহের প্রাকৃতিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের চিরকালের প্রিয়। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে এঁরা কিছু প্রেরণা পেতে পারেন এই ভেবেই বোধ করি তিন নবীন শিল্পীকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কখনো বোটে, কখনো কুঠিবাড়িতে কবির সান্নিধ্যে তিন বন্ধু কয়েকটি দিন খুব আনন্দেই কাটালেন। স্বল্পভাষী লাজুক প্রকৃতির ছেলেটিকে রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন— অবনকে বলে তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাব। সেখানে প্রকৃতি এবং মানুষ দুয়েরই সাহচর্যে ছবি আঁকায় উৎসাহ পাবে। ওদিককার আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন থেকেও শিল্পের ব্যবহারে অনেক কিছু নেবার আছে। সুরেন্দ্রনাথ এরূপ সহৃদয় আহ্বানের কথা ভাবতেও পারেন নি; তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি। বললেন— আপনি যখনই আজ্ঞা করবেন তখনই চলে আসব। শুধু মুখের কথা নয়, কাজেও তাই করলেন। কয়েকমাস পরেই ১৯১৭ সালে কলকাতার পাট তুলে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লাগিয়ে দিলেন ছোটোদের ছবি আঁকার কাজে। বলেছিলেন— আশ্রমের গাছপালা, ফুল-ফলের ছবি আঁকতে শেখাও— বিভিন্ন গাছের ডালপালা লতাপাতা, ফুল-ফলের বৈশিষ্ট্য যেন ছেলেরা লক্ষ্য করে দেখতে শেখে।

পরে যখন কারুকলা-চর্চার জন্য পৃথকভাবে কলাভবনের সৃষ্টি হল তখন তিনি কলাভবনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। কে কাজটি করতেন তাই

অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। নন্দলাল বসু তখনো আসেন নি, তবে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিল। মাঝে মাঝে এসে ক'দিন করে থেকে উপদেশ-নির্দেশাদি দিয়ে, এবং ক্লাস নিয়ে কাজে সহায়তা করতেন। অসিত হালদার তখন কলাভবনের অধ্যক্ষ। তা হলেও সুরেনবাবুকে অনেকখানি দায়িত্ব বহন করতে হত। তখনকার বার্ষিক বিবরণীতে বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেন উভয়েই একাধিকবার তাঁর কর্মকুশলতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

সুরেনবাবু কেবলমাত্র কলাভবনের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন নি। মানুষটি যে অতিশয় করিতকর্মা সেটি অল্পদিনেই সকলে টের পেয়ে গেলেন, ফলে নানা কাজে তাঁর ডাক পড়তে লাগল। পরে এক সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের স্থপতি হিসাবে নাম করেছিলেন। আমরা এসে যে শান্তিনিকেতনকে দেখেছিলাম তার বারো-আনাই সুরেনবাবু আর রথীবাবুর হাতে গড়া। কথা প্রসঙ্গে একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন—ঐ যে সত্যকুটির বাড়িটি দেখছেন ঐটি দিয়েই আমার স্থাপত্যশিল্পে হাতে-খড়ি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম কয়েক মাস আমি ঐ গৃহটিতেই বাস করেছি। টালির ছাদ দেওয়া সে বাড়িটি এখন নেই, এখন সেখানে পাকা বাড়ি হয়েছে। সুরেনবাবু বলছিলেন যে বোলপুরে একটা ভাঙা বাড়ির ঝড়তিপড়তি মাল অতি সস্তা দরে কিনে তাই নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে একটা জিনিস খাড়া করা গেল। খুব যে সুদৃশ্য একটা-কিছু হল এমন নয়, তবে দেখতে কিছু খারাপও নয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য রকম কম খরচে একটা গোটা বাড়ি তৈরি হয়ে গেল দেখে সবাই খুব তারিফ করতে লাগলেন।

এর পরের উল্লেখযোগ্য কাজ হল আশ্রমবাসীদের জন্যে খুব বিরাট আকারে একটি কুয়ো তৈরি করানো। আশ্রমে তখন দারুণ জলকষ্ট। ছোটো ছোটো ক'টি অগভীর কুয়ো ছিল, গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে যেত। অত বড়ো কুয়ো খননের কাজে তেমন অভিজ্ঞ লোক এদিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সুরেনবাবু তাঁর নিজের দেশ মুঙ্গের অঞ্চলে গিয়ে সেখান থেকে লোকজন নিয়ে এলেন। বিরাট কুয়ো তৈরি হল, আশ্রমের জলকষ্ট দূর হল। তখনকার দিনে মস্ত বড়ো কাজ বলতে হবে। এ কাজে সুরেনবাবু আশ্রমবাসী সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, এ-সব বাড়তি কাজের দরুন কলাভবনের কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটত না। নিজের ছবি আঁকার কাজেও শৈথিল্য ঘটে নি। তাঁর কিছু কিছু ছবি ইতিমধ্যেই শিল্পরসিকদের কাছে সমাদর লাভ করেছে। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় সচিত্র গীতাঞ্জলির যে-সংস্করণটি প্রকাশিত হয়ে তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের তিনখানা ছবি ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছবি-ক'খানা বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে গোয়ালিয়র-রাজের আমন্ত্রণে অসিতকুমার হালদার এবং নন্দলাল বসু যখন বাগ গুহাচিত্রের অনুলিপি করবার কাজে যান তখন তাঁদের সহকারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ছুটিছাটায় নন্দলালের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলে যেতেন নালন্দা, রাজগীর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে। প্রাচীন শিল্পনিদর্শনাদি দেখা, তার অনুলিপি তৈরি করা, সে-সব স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের স্কেচ করা কলাভবন শিক্ষারীতির অঙ্গীভূত ছিল। এ-সব অবকাশ-ভ্রমণ যেমন ছিল শিক্ষাপ্রদ তেমনি উপভোগ্য। ছেলেমেয়েরা এ-সব সুযোগের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত।

শান্তিনিকেতনে আসার অত্যল্পকাল মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণে কবিকে যেতে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, সঙ্গে নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে। শিক্ষক মানুষকে নানা গুণে গুণান্বিত করে নেবার ঐ ছিল কবির এক কৌশল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরোতেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট মানুষের সান্নিধ্য, অপর দিকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা— দুয়ে মিলে যে-কোনো ব্যক্তিরই জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। সুরেনবাবুর শিক্ষা এভাবেই হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যকলায় তখনই তাঁর আগ্রহ জন্মেছে। নানা উপলক্ষে উত্তর ভারতের শিল্পকলার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। পরে কবির সঙ্গে গিয়েছিলেন সিংহলে, গিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে; ইন্দোনেশিয়া থেকে শিখে এসেছিলেন বাটিকের কাজ, কলাভবনের শিক্ষাক্রমে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতন থেকে এখন সারা ভারতবর্ষে তা ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে যান তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গেই ইংল্যাণ্ড অবধি গিয়েছিলেন এবং পরে ইয়োরোপের নানা শিল্পকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখেন।

এদিকে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরে বিদ্যাচর্চার নানা আয়োজন যেমন

বাড়তে লাগল, প্রতিষ্ঠানের আয়তনও তেমনি বাড়তে থাকল। অধ্যাপক ও ছাত্রদের আগমনে ছাত্রাবাসের এবং অধ্যাপকদের বাসগৃহের প্রয়োজন হল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিপূর্বেই এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভার বহুল পরিমাণে তাঁরই উপর ন্যস্ত হয়েছিল; এখন গৃহাদি নির্মাণের দায়িত্বও তাঁকেই গ্রহণ করতে হল। এ কাজে তিনি প্রথম সহযোগীরূপে পেলেন সুরেনবাবুকে। দুজন প্রকৃত গুণী এবং কুশলী কর্মীর ঐ শুভসংযোগ শান্তিনিকেতনের পক্ষে যথার্থই সুফলপ্রদ হয়েছিল। আর সেই যে দুজনে হাত মিলিয়েছিলেন একাদিক্রমে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তা অব্যাহত ছিল। আমরা এসে যে শান্তিনিকেতনকে দেখেছি তার অঙ্গ এবং অঙ্গন রচনা এঁরা দুজনেই করেছিলেন। এক উদয়ন বাদ দিলে বৈভবের চিহ্ন ছিল না কোথাও কিন্তু সৌষ্ঠব ছিল প্রচুর। বেশির ভাগই দু-ঘরের ছোটো ছোটো বাড়ি— রান্নাঘর, স্নানের ঘরসমেত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। অল্প আয়ের নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে আদর্শ। যৎসামান্য ভাড়া, রুচিরোচন চেহারা। এ-জাতীয় বাসগৃহের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনেই প্রথম। ক্রমে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এখানকার গৃহনির্মাণ প্রণালীর প্রতি সমস্ত দেশেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে যখন নানা স্থানে শিল্পনগরী স্থাপিত হল তখন টাউন-প্ল্যানিং-এর কাজে ডাক পড়তে লাগল সুরেনবাবুর। বোকারোর নগর পরিকল্পনা বলতে গেলে পুরোপুরি তাঁরই রচনা, রাউরকেল্লায় গৃহনির্মাণ, আংশিকভাবে তাঁর পরিচালনায়। ডি.ভি.সি.-র আমন্ত্রণে হাজারিবাগ, মাইথন এবং দুর্গাপুরেও বহুবিধ গৃহ নির্মাণ করেছেন। রথীবাবু এবং সুরেনবাবু যে স্থাপত্যকলার চর্চা করেছেন, তাকে বলা চলে গার্হস্থ্য স্থাপত্যকলা। কত সামান্য ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য রুচিসম্মত গৃহ নির্মিত হতে পারে সেটি এক সময়ে তাঁরা হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। স্বল্পবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে এর মূল্য ছিল অপরিসীম। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের সব ব্যাপারেই যেমন একটু শোভন রুচির বৈশিষ্ট্য ছিল এ-সব গৃহের শ্রীছাঁদের মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্যের ছাপটি চোখে পড়ত। আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে এবং বলেছি যে, নন্দলালের নেতৃত্বে যেমন একটি শান্তিনিকেতন স্কুল অফ পেন্টিং-এর সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি রথীবাবু এবং সুরেনবাবুর প্রবর্তনায় একটি শান্তিনিকেতন স্কুল অফ আর্কিটেকচারেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে নানা জন নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন, সুরেনবাবু তাকেই নিজের মতো করে একটি চাক্ষুষ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন— আড়ম্বরহীন উপকরণ-বিরল সরল সুন্দর, অল্পে তুষ্ট স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে একটি ক্ষুদ্র নীড় রচনা। 'ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা'— প্রতিটি গৃহ যেন এই মনোবাসনাটির প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-বেলাকার ঘর'— শ্যামলীর নির্মাতাও সুরেনবাবু। ছাত সমেত সম্পূর্ণ একটি মাটির বাড়ি তৈরির পরীক্ষা সেই প্রথম এবং বোধ করি সেই শেষ। এটি নির্মাণেওযথেষ্ট নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়েছে। শ্যামলীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

গৃহ নির্মাণে তাঁর এই ঘরোয়া রীতির কথা এত করে বলছি এইজন্যে যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা এবং শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে এর একটি মিল আছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যথাসম্ভব তাল মান রক্ষা করে চলতে শেখা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষাকে সেভাবে দেখা হয় নি বলেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদিককার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে যেমন মাটির দেয়াল এবং খড়ের চালের ঘরই রেওয়াজ, শান্তিনিকেতনেও ছাত্র-শিক্ষকরা গোড়ার দিকে খড়ের ঘরেই বাস করেছেন। এরই উন্নত সংস্করণ পরবর্তীকালের ছোটো ছোটো পাকা বাড়ি। গাছের ছায়ায় ছায়ায় ক্ষুদ্রায়তন বাড়িগুলো খানিকটা যেন গা ঢাকা দিয়েই থাকত; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খুব একটা বেমানান মনে হত না। আজকে সারা দেশে সাধারণের উপযোগী যে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে তার উদ্‌ভাবক এবং প্রথম প্রয়োগকর্তা।

সুরেনবাবু ছিলেন একান্তভাবে প্রচারবিমুখ মানুষ। খ্যাতির মোহ ছিল না তিলমাত্র, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালোবাসতেন। বাইরে থেকে কোনো কাজের আহ্বান এলে সহজে রাজি হতেন না। কোনোক্রমে রাজি করানো গেলেও শর্ত করে নিতেন যে তাঁর নামটি যেন প্রকাশ করা না হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে কেওড়াতলায় যে চিত্তরঞ্জন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়— তার স্থাপত্যকলার প্রশংসা অনেকেই করেছেন কিন্তু স্থপতির নামটি বহুকাল দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর স্থাপত্য কীর্তির এটি

অন্যতম নিদর্শন। পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এসেছে, সব সময়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। গুজরাটের শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই-এর গৃহ আমেদাবাদের একটি দর্শনীয় বস্তু। আডেয়ারে অ্যানি বেসান্ত-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটির গৃহ সুরেনবাবুর তৈরি; কলকাতার বরানগরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউট্-এর গৃহাদিও তাঁরই পরিকল্পনায় এবং নির্দেশনায় নির্মিত। এমন আরো বহুবিধ কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি, তখন দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর নিত্যব্যবহার্য একটি প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে সজ্জিত করে দেওয়া হয় এরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু এ কার্যভারটি সুরেনবাবুর উপরে অর্পণ করেন। সুরেনবাবু কাজটি এমন সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়েরই অকুণ্ঠ স্তুতি লাভ করেছিলেন। ভারতের নানা স্থান থেকে প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন একদিন তাঁর ঘরে বসে সে কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। বললেন— কাজ শেষ করে বিদায় নিয়ে আসবার আগে দুজনেই ধরে বসলেন, এই ঘরে বসে তিনজনের একটি ছবি তুলতে হবে। হাসতে হাসতে দেরাজ খুলে একখানা ফোটো বের করে আমাকে দেখালেন। একটি সোফাতে সুরেনবাবুকে মাঝখানে বসিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং জওহরলাল বসেছেন তাঁর দু পাশে। দুই মহামান্য ব্যক্তির মাঝখানে কুঞ্চিত কুণ্ঠিত সুরেনবাবুকে দেখে খুব কৌতুক বোধ করেছিলাম; কারণ গণ্যমান্যদের আসরে সুরেনবাবুকে কখনো দেখা যেত না। কাজের মানুষ, কাজ চুকিয়ে দিয়েই সরে পড়তেন; আর তাঁর নাগাল পাওয়া যেত না।

বোঝা কঠিন নয় যে, এ-জাতীয় কাজের চাপে ছবি-আঁকার কাজটা ক্রমে চাপা পড়ে গিয়েছে। সে দিকে আর বেশি নজর দিতে পারেন নি। বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে তিনি যখন শান্তিনিকেতন-সচিব পদে নিযুক্ত হলেন তখন সমগ্র আশ্রম পরিচালনার ভারটিই তাঁর উপরে এসে পড়ল। অর্থসংকট তখনো পূর্ববৎ, সে অবস্থায় শান্তিনিকেতনের সুবৃহৎ সংসার প্রতিপালন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ইচ্ছা থাকলেও ছবি আঁকার অবকাশ ছিল না। এক সময়ে ভালো ছবি এঁকেছিলেন, সবে নাম হতে শুরু করেছিল, সে জিনিস ছেড়ে দিতে হল বলে নিজের মনে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল। গুণগ্রাহীরাও

দুঃখিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক গুরুদয়াল মল্লিক সুরেনবাবুকে বলতেন— the artist who committed suicide, অবশ্য নন্দলাল বসু অবসর গ্রহণ করার পরে সুরেনবাবুই কলাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্মজীবনের শেষ পর্বে তিনি স্বল্পকালের জন্য তাঁর শিল্পীজীবনে আবার ফিরে এসেছিলেন।

আমরা এসে সুরেনবাবুকে শান্তিনিকেতন-সচিব হিসাবেই দেখেছি। এমন নির্ভরযোগ্য নিবিষ্টচিত্ত নিষ্ঠাবান কর্মী শান্তিনিকেতনে আর দেখা যায় নি। রথীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। সুরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোনো কাজই করতেন না। এ দুয়ের সহযোগিতা শান্তিনিকেতন ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বিশ্বভারতীর নিঃসম্বল দিনেও শুধু কর্মদক্ষতার গুণে কত অসম্ভবকে তাঁরা সম্ভব করেছেন।

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। ছাত্র কর্মী অধ্যাপক সকলের যৌথ প্রয়াসেই উৎসবাদি সুসম্পন্ন হত কিন্তু ব্যবস্থাদি সমস্তই করতেন সুরেনবাবু অন্তরাল থেকে। আম্রকুঞ্জে মণ্ডপ-সজ্জায়, মেলাপ্রাঙ্গণের সুব্যবস্থায়, অভিনয়াদির মঞ্চ-সজ্জায়— সর্বত্র তাঁর অদৃশ্য হস্তের ছাপটি ঠিক চেনা যেত। দেশ-বিদেশ থেকে কত সব খ্যাতনামারা আসতেন। তাঁদের অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন, বিনোদন ইত্যাদির সুচারু ব্যবস্থা সুরেনবাবুই করতেন, কিন্তু খ্যাতনামাদের সান্নিধ্যে তাঁকে কখনো দেখা যেত না।

শান্তিনিকেতনের সকল অধ্যাপক কর্মীই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেছেন। তা হলেও এদিক থেকে সুরেন্দ্রনাথকে সবিশেষ ভাগ্যবান বলতে হবে। লাজুক স্বভাব স্বল্পভাষী ছেলেটির প্রতি প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথের একটি স্নেহদৃষ্টি ছিল। ক্রমে তাঁর মধ্যে দেখেছেন একটি নিখাদ খাঁটি মানুষকে, এবং মানুষটি যে একান্তভাবে শান্তিনিকেতন-অন্ত-প্রাণ সেটিও তাঁর চোখে দিনে দিনে পরিস্ফুট হয়েছে। সেজন্যে সুরেনবাবুর প্রতি যেমন ছিল তাঁর অপরিসীম স্নেহ তেমনি ছিল অবিচলিত আস্থা। তাঁকে তিনি শান্তিনিকেতনের অকৃত্রিম সুহৃদ বলে মনে করতেন। আর তাঁর প্রতি যে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ তার প্রমাণ— দুখানি গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন—'রাশিয়ার চিঠি' এবং শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থ 'আরোগ্য'। এক কাদম্বরী দেবীকে বাদ দিলে একাধিক গ্রন্থ খুব কমের নামেই উৎসর্গ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে 'আরোগ্য' কাব্যের উৎসর্গপত্রে যে-ক'টি কথা উচ্চারণ করেছেন সে বড়ো মর্মস্পর্শী—

'বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতুহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।'

আজ গিয়ে-থুয়ে যে কজনা আছেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বলেছেন—

'আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিকবন্ধু,'...

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচটি মাত্র বালককে নিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শুরু। সেই পাঁচজনের একজন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এত ক্ষুদ্র আকারে যার আরম্ভ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে-না-হতেই সে বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল; আর বিদ্যালয়ের সেই প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। আজও মনে পড়ছে উপাচার্য হিসাবে তিনি প্রথম যে সমাবর্তন ভাষণটি দিয়েছিলেন তাতে বিদ্যালয়ের শৈশব থেকে তার ক্রমবিকাশের উল্লেখ করে বলেছিলেন— আমার আজকের এই ভাষণ বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্যরূপে ততখানি নয় যতখানি আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্ররূপে। এই সূত্রে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। রথীন্দ্রনাথ তাঁর সমাবর্তন ভাষণটি দিয়েছিলেন বাংলায়। রথীন্দ্রনাথের পরে বিশ্বভারতীর আর-কোনো উপাচার্য বাংলায় ভাষণ দেন নি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন রবীন্দ্রনাথকে সমাবর্তন ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে ভাষণটি তিনি বাংলায় দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই একবার নতুন ধারায়— বিশ্বভারতীতেও ঐ একটিবার।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক ভাবনাচিন্তার শুরু বলতে গেলে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। ইস্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। বালক বয়সে নিজ স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ছিল, সেজন্যে পুত্রকে আর স্কুলে পাঠান নি। গৃহে রেখে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার সূত্রপাত হল। শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে কবির মনে হয়েছে যে আপন গৃহ-সীমানার মধ্যে থেকে যে শিক্ষালাভ তারও মধ্যে কিছু ঘাটতি থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ না পেলে মনের গড়নে নানা খুঁত থেকে যায়, স্বভাবের সুসমঞ্জস পরিণতিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে অতিরিক্ত লাজুক, ঘরকুনো এবং অসামাজিক হওয়াটা খুব বিচিত্র নয়। এ-সব ভাবনাচিন্তার ফলেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কাজেই বললে খুব ভুল হয় না যে রথীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

বিদ্যালয়টি হবে গুরুগৃহে বাসের ন্যায়। প্রাচীনকালে গুরুরা থাকতেন লোকালয়ের এক প্রান্তে, প্রকৃতির সন্নিধানে। লোকালয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা

করে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে সরল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতেন। বিদ্যাদানের কাজটিকে গার্হস্থ্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হত না। এই বিদ্যালয় হবে সেই সরল সুন্দর জীবনচর্যার সাধনস্থল। গুরুগৃহের স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হবে বিদ্যালয়ের নিয়মনিষ্ঠা। বিদ্যালয়কে ঘিরে একটি আনন্দোজ্জ্বল পারিবারিক পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

আপন গৃহের সংকীর্ণ সীমায় থেকে যে শিক্ষা তা যেমন শীর্ণতাদোষে দুষ্ট, স্কুলের পুঁথিগত শিক্ষাও তেমনি জীর্ণতাদোষে দুষ্ট। একটি একপেশে, অপরটি গতানুগতিক। হাতে-কলমে কোনো রকমের কাজ শিখি না বলে আমাদের বিদ্যাটা বুদ্ধির সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষদের বলতেন 'বোকা-হাতের মানুষ'। আমাদের বিদ্যাচর্চা পোশাকী মনোভাবকে একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়। শিক্ষার যে একটা করিতকর্মা মূর্তি আছে সে কথা আমরা মনেই রাখি না। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে নানারকম হাতের কাজের স্থান রেখেছিলেন— কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, সবজি বাগানের কাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া গান-বাজনা, ছবি আঁকা, অভিনয় ইত্যাদি কলাচর্চারও ব্যবস্থা ছিল।

এর ফলে গতানুগতিক শিক্ষার তুলনায় রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাটা হয়েছিল ঢের বেশি ব্যাপক। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি বিদেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কারুকলার চর্চা করেছেন বালক বয়স থেকেই। জোড়াসাঁকো গৃহে সংগীতচর্চা বংশগত। গানবাজনায় রথীন্দ্রনাথের রুচি ছিল, পারদর্শিতা ছিল এমন কথা বলব না। অভিনয়াদিতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবি আঁকায় হাত ছিল। এঁকেছেনও বরাবর। এ ক্ষেত্রেও খুব মস্ত বড়ো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এমন কথা বলা চলে না। ফুল আঁকতেন ভালো। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ফুল আঁকায় ছেলের কাছে হার মানতে হল। ফুল আঁকায় যেমন পারদর্শিতা ছিল, ফুলের বাগান রচনায় তেমনি দেখিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্ব। গাছপালা এবং নানাজাতীয় ফুল-লতাপাতার সম্ভারে উত্তরায়ণে রথীন্দ্রনাথের বাগান ছিল দেখবার মতো। উদ্যানরচনাকে তিনি একটি শিল্প হিসাবে দেখেছেন। সত্যিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন কারুকলার ক্ষেত্রে। হস্তশিল্পে— কাঠের কাজে, চামড়ার কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় একাধিকবার

তাঁর আঁকা ছবি এবং হাতের কাজের প্রদর্শনী হয়েছে। দিল্লীতেও একবার তাঁর কারুকৃতি এবং চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। স্বয়ং জওহরলাল তার উদ্‌বোধন করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। দেশবিদেশের সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত। ইংরেজি বাংলা— দু ভাষাতেই সমান অধিকার ছিল। যেটুকু লিখেছেন তাতেই সাহিত্যের স্বাদ এনেছেন। তাঁর প্রণীত 'প্রাণতত্ত্ব' এবং 'অভিব্যক্তি' বাংলা ভাষায় সুলিখিত বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে লেখা— *On The Edges of Time*— পিতার সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ। চমৎকার ঝরঝরে ইংরেজি। অনূদিত হয়ে 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংস্কৃতও শিখেছিলেন যত্ন করে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ক্ষমতার তুলনায় লিখেছেন অতি কম। পিতার বিরাট প্রতিভায় এত বেশি অভিভূত ছিলেন যে অসংকোচে আত্মপ্রকাশের ভরসা পান নি। সব-ক'খানা বইই পিতার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

রথীন্দ্রনাথ বহুগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। বাস্তবিকপক্ষে একাধারে এমন বহুবিধ গুণের সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ধারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মনকে বহুমুখী করা। দৃষ্টিকে স্বচ্ছ সতর্ক রাখা, কারুকলার চর্চায় শোভন সুন্দর রুচি গঠন করা। পুত্রের শিক্ষায় সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সার্থক হয়েছে বলতে হবে। রথীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে তাঁর সকল কাজে, আচারে-ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এ-সব গুণের একটি সহজ সুন্দর প্রকাশ দেখা যেত।

বলা আবশ্যক, যে কালে অভিজাত সমাজের ছেলেদের অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে পাঠানোই রেওয়াজ ছিল, সেকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে পাঠালেন আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য। তাও আবার ভবিষ্যৎ জীবনে চাকুরির উদ্দেশ্যে নয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ; রবীন্দ্রনাথ আপন মনে যে স্বদেশী-সমাজের পরিকল্পনা করছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপন পুত্রকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, পরে জামাতা নগেন গাঙ্গুলিকেও। উদ্দেশ্য ছিল ফিরে এসে এঁরা গ্রামাঞ্চলে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করে গ্রাম্য চাষীদের উন্নত প্রণালীতে চাষবাসের শিক্ষা দেবেন।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯০৯ সালে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন শিল্পে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির উদ্যমে জোড়াসাঁকো গৃহ রোমাঞ্চিত-কলেবর। অবনীন্দ্র গগনেন্দ্র দেশে রীতিমত এক শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছেন; স্বদেশী যুগের কাব্যে সংগীতে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশের মন কেড়ে নিয়েছেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখি জোড়াসাঁকো বাড়িতে সাহিত্য ও ললিতকলার মহোৎসব বসে গেছে।' তিনিও সেই মহোৎসবে ভিড়ে গেলেন। অবশ্য হাতে কলমও নিলেন না, তুলিও না। রথীন্দ্রনাথের মনটা ছিল গঠনমূলক। ভাবলেন শিল্পী সাহিত্যিকের মন উপ্‌চে-পড়া মন, সেখানে অপচয় অনিবার্য। এঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে একটা কোনো সংস্থার আওতায় এনে যদি নিয়ম-শৃঙ্খলার বশে রাখা যায় তা হলেই কাজটা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হল জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত বিচিত্রা ক্লাব প্রধানত রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে। কলকাতার জ্ঞানী গুণী সমাজের অনেককেই রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রার আঙিনায় এনে জড়ো করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্প প্রবন্ধ বিচিত্রা ক্লাবে প্রথম পড়ে শুনিয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা লেখা পড়ে শুনিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যের আসর ছাড়া সংগীতের আসরও বসত যথারীতি, অভিনয়াদিও লেগেই থাকত। বিচিত্রা ক্লাবের কার্যক্রম ছিল যথার্থই বিচিত্র। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন— সকাল বেলায় ক্লাব পরিণত হত কলাভবনে— অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর নিজ নিজ স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতেন; মুকুল দে এচিং-এর কাজ করতেন। কিছু ছাত্র-ছাত্রীও জুটে গেল, তাদের জন্যে ছবি আঁকার ক্লাস খুলতে হল। ছাত্রীদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের সদ্য-বিবাহিতা পত্নী প্রতিমা দেবীও ছিলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা হয়েছে। পিতার আহ্বানে রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতে হল। প্রধান উৎসাহী এবং কর্মকর্তার অভাবে বিচিত্রা ক্লাবের কাজ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে গেল এবং এক সময়ে ক্লাব বন্ধ হয়ে গেল। ক্লাবের আর্টিস্টদের মধ্যে অসিত হালদার, নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর একে একে এসে শান্তিনিকেতনের কলাভবন গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন। দেখা যাচ্ছে বিচিত্রা ক্লাবেই শান্তিনিকেতন কলাভবনের সূচনা হয়েছিল।

অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে বিদেশ থেকে তিনি যে বিদ্যা শিখে এসেছিলেন তার কোনো ব্যবহার কি তিনি করেন নি? করেছিলেন বৈকি। শিলাইদহে তিনি একটি ফার্মের পত্তন করেছিলেন। অনেকটা জমি নিয়ে ক্ষেত-খামার তৈরি হল, উন্নত ধরনের লাঙল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করালেন; এমন-কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ছোটোখাটো একটি ল্যাবরেটরিও গড়ে তুলেছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গেই কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু বেশিদিন সে কাজ নিয়ে থাকতে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে পিতার কাজে সাহায্য করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই শিলাইদহ— যার কুঠিবাড়ির চার দিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী ক্ষেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি; সেই পদ্মা নদী··· এই-সব যা-কিছু আমার ভালো লাগত— সেই-সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের ঊষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।'

পতিসরের চাষীদের সঙ্গে কিছু কিছু কাজ করেছেন। কালীগ্রাম পরগনায় ট্র্যাক্টরের সাহায্যে প্রজাদের জমি চাষ করে দিয়েছিলেন। নিজেই ট্র্যাক্টর চালিয়েছেন। যন্ত্রের হল-চালনা দেখে চাষীদের দারুণ উৎসাহ। অবশ্য চাষের দিক থেকে শিলাইদহে যতটা করেছিলেন, পতিসরে ততটা করতে পারেন নি। শিলাইদহে নিজের ফার্ম ছাড়াও চাষীদের মধ্যে আলু টমেটো এবং আখের চাষের প্রবর্তন করেছিলেন।

শান্ত প্রকৃতির লাজুক স্বভাবের মানুষটি— বাইরে থেকে দেখলে বোঝাই যেত না যে রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রকর্মা মানুষ ছিলেন। অনেক কিছু করেছেন, মাথায় নানান রকম খেয়াল খেলত। কলকাতায় থাকতে এক সময়ে ব্যাবসাতেও নেমেছিলেন, মোটরের ব্যাবসা। বেশ ফলাও করে মোটরের কারখানা ফেঁদে বসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্যাবসা বেশিদিন টেকে নি। নিজেই বলেছেন, 'ব্যাবসাতে ফেল পড়া ঠাকুর পরিবারে বংশের ধারা, আমার বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না।' তবে বলেছেন, মোটর চালনা ছিল তাঁর বাতিক বিশেষ। কিছুদিন নূতন নূতন মডেলের গাড়ি কিনে, খুশিমত গাড়ি হাঁকিয়ে শখ মিটিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। যে বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রথম বিদ্যার্থী এখন তারই পরিচর্যা, পরিচালনার দায়িত্ব আংশিক-

ভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে হল। শান্তিনিকেতন তো শুধুই একটি বিদ্যালয় নয়, আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ এক বৃহদাকার সংসার, এর দায়দায়িত্ব বহু বিস্তৃত। তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথ তখন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দেবার কথা ভাবছেন। শুধু সাংসারিক দিকটা দেখবার জন্যে সর্বক্ষণের জন্য একজন লোকের দরকার হল। রথীন্দ্রনাথের উপরে পড়ল সেই ভার। কিছুকাল পরে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল তখন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং রথীন্দ্রনাথ হলেন তার যুগ্ম-সচিব। পরে দীর্ঘকাল একাই সে দায়িত্ব বহন করেছেন। মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ করের কাছে। আমরা এসে দেখেছি রথীবাবু বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন-সচিব— দুয়ে মিলে শান্তিনিকেতনের সংসার প্রতিপালন করেছেন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে। পরে এ দুজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনিলকুমার চন্দ। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় তিনিও অনেকখানি দায়িত্ব বহন করেছেন। আর্থিক দিকটা প্রধানত রথীন্দ্রনাথকেই দেখতে হয়েছে, উদ্‌বেগ ভোগ করতে হয়েছে নিত্যদিন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন— বাবা তো দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন। তাঁরাও একে একে আসতে লাগলেন। এলেন সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিজ, লেজনি; এলেন ফর্মিকি, তুচ্চি; কলিন্স, বেনোয়া, বোগ্‌দানভ, স্টেন কনো। এঁদের আসা যাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করতে সে দুর্দিনে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। দুশ্চিন্তায় ভুগেছি, আবার আনন্দও পেয়েছি— একটা জিনিস গড়ে তোলবার আনন্দ।

এখানে একটি কথা বলব, কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে এ কথাটি আমি বলতে শুনি নি। ১৯২১ সালে যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় তখন এত বড়ো একটা পরিকল্পনার জন্য রবীন্দ্রনাথের আর্থিক সংগতি কিছুই ছিল না। ঋণের দায়ে জমিদারি একরকম হাতছাড়া। কবি তখন তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। ঐ-সব গ্রন্থের রয়ালটিই ছিল বিশ্বভারতীর একমাত্র আর্থিক সংস্থান। পিতার সম্পত্তির উপরে পুত্রের কিছু অধিকার অবশ্যই ছিল; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে পিতা যখন গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন তখন পুত্র'বা পুত্রবধূ তাতে কোনো আপত্তি জানান নি। অবশ্য ১৯২৩-এর পরবর্তী গ্রন্থাদির স্বত্ব রথীন্দ্রনাথ পেয়েছেন কিন্তু কবি আরো কুড়ি

বছর বেঁচে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃজনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এমন কথা কারো জানা থাকবার নয়। রথীন্দ্রনাথের নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত এর আগেও পাওয়া গিয়েছে। নোবেল প্রাইজের টাকা কবি রেখেছিলেন তাঁর জমিদারি মহল্লায় একটি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে— মহাজন-প্রপীড়িত গ্রাম্য চাষীদের উপকারার্থে। আত্মীয়-বন্ধুরা ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু কবি তাতে নিবৃত্ত হন নি। সেবারেও পুত্র এবং পুত্রবধূ সানন্দে পিতার মতেই সায় দিয়েছেন। সকলেই জানেন, কয়েক বৎসর পরে ব্যাঙ্কটি উঠে গিয়ে গচ্ছিত অর্থ নষ্ট হয়েছিল। তবে যে-ক'বছর ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল, সে ক'বছর ঐ সুদের টাকাতেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়েছে।

স্বার্থত্যাগ নানাভাবেই করেছেন। শেষের ক'টি বছর ছাড়া সুদীর্ঘকাল বিনা পারিশ্রমিকে শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। সে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দিয়েছেন যতখানি, নেন নি ততখানি— সেই কথাটি মনে রেখে স্নেহশীল পিতা বলেছিলেন, 'সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন, / ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।'

এখানেও একটি কথা বলা আবশ্যক। অশনে আসনে বসনে গৃহসজ্জায় উদ্যান-রচনায় যে শোভন সুন্দর রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ভোগী পুরুষ ব'লে মনে করা অস্বাভাবিক ছিল না। অনেকে তাই মনে করতেনও। উত্তরায়ণে উদয়ন নামে তিনি যে সুরম্য গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে আশ্রমবাসীরা অনেকেই সুনজরে দেখেন নি, ব্যঙ্গ করে বলতেন রাজবাড়ি। আসলে মানুষটি ছিলেন শৌখিন স্বভাবের। গৃহনির্মাণ-শিল্পের একটি সুরম্য নিদর্শন হিসাবেই গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। নিজ বাসগৃহরূপে সেটিকে বেশি দিন ব্যবহারও করেন নি। উদ্যান-সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি গৃহেই দিন কাটিয়েছেন। কাজেই উদয়ন গৃহ নির্মাণে আমি বলব, ভোগলিপ্সার চাইতে সৌন্দর্যলিপ্সাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কবির মৃত্যুর পরে উদয়ন গৃহ রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালারূপে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। একাংশ বিশ্বভারতীর মহামান্য অতিথিদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হত।

রথীন্দ্রনাথের বহুবিধ গুণপনার কথা আগেই বলেছি। অনেকেই জানেন না যে তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন; অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা কথনো অধ্যয়ন করেন নি। বসে বসে নানারকম বাড়ির ডিজাইন করা তাঁর অন্যতম 'হবি' ছিল। রথীবাবু এবং সুরেনবাবুতে মিলে শান্তিনিকেতনে যে ছোটো ছোটো হস্টেল এবং বাসগৃহের পরিকল্পনা করেছিলেন তার বিশেষ একটা চেহারা এবং চরিত্র ছিল। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে সে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

রথীবাবু সম্পর্কে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে— যা-কিছু করেছেন তাতেই নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন। নতুনত্বের দিকে খুব একটা ঝোঁক ছিল। শ্রীনিকেতনে গ্রাম-সংগঠনের কাজের সঙ্গে শিল্পসদন নামে যে কারুশিল্পবিভাগ স্থাপিত হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবীর সৃষ্টি। গ্রাম্য কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এক সময়ে অল্প মূল্যে নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি, বেড কভার, দরজা-জানলার পর্দা, কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগ, পোড়ামাটির কাপ ডিশ ইত্যাদি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দেশে বিদেশে যখনই ভ্রমণে গিয়েছেন, নানাবিধ কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন এবং ক্রমে সে-সব শিল্প শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের অনুকরণে সে-সব শিল্পসামগ্রী এখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হস্তশিল্পের প্রসারে শ্রীনিকেতন শিল্পসদন এবং শান্তিনিকেতন কলা-ভবন (কারু-বিভাগ)-এর দান অপরিসীম। এ কথা অনেকে ভুলতে বসেছেন যে এ-সব হস্তশিল্পের প্রচলনে রথীন্দ্রনাথের হাত ছিল অনেকখানি।

সর্বোপরি যে কারণে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয়, সেটি হল বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন। এটি একান্তভাবেই রথীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া। বহু বৎসর ধরে বহু শ্রমে বহু যত্নে তিনি ঐ সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করেছেন; কবির লেখা অগণিত চিঠিপত্রের কপি, শত শত ব্যক্তির কাছ থেকে বিনীত আবেদন জানিয়ে সংগ্রহ করেছেন। তারই ফলে অতি মূল্যবান চিঠি-পত্র-সিরিজ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন তখন তিনি যে রাজকীয় সংবর্ধনা লাভ করেছেন, তার বিবরণ এবং তাঁর সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধাদি লেখা

হয়েছে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা থেকে রথীন্দ্রনাথ বহু ব্যয়ে তার 'কাটিং' সংগ্রহ করেছেন। গবেষণাকার্যের জন্য এ-সমস্তই মহামূল্য সম্পদ। এ-সব উপকরণের সদ্‌ব্যবহার হলে তবেই রথীন্দ্রনাথের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

আজীবন নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করেছেন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হিসাবে তিনিই ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ কিন্তু এত নিঃশব্দে কাজ করতেন যে তিনি শান্তিনিকেতনে আছেন কি না আছেন তাও সব সময় টের পাওয়া যেত না। শান্তিনিকেতন জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডেরই পরিকল্পনা করতেন রথীবাবু এবং সুরেনবাবু। উভয়েই নেপথ্যচারী মানুষ। কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে দুজনেই বেমালুম সরে পড়তেন। সুরেনবাবুকে তবু দেখা যেত কারণ তাঁর একটা আপিস ছিল। রথীবাবুর আপিস ছিল না; তিনি আপন ঘরে বসে কাজ করতেন। হাতুড়ি বাটালি নিয়ে কাজ করতেন, তারই ফাঁকে আপিসের কাজও চলতে থাকত, যাকে যা নির্দেশ দেবার দিতেন। উপাচার্যের পদে বসেও এ রীতির কোনো পরিবর্তন করেন নি। কাজ নিয়ে আমাকেও অনেক সময় তাঁর কাছে যেতে হয়েছে। দিব্য র‍্যাদা ঘষতে ঘষতে কাজের কথা বলতেন, একটুও বেখাপ্পা লাগত না। আসল কথা, মানী ব্যক্তিকে সকল কাজেই মানায়। হাতুড়ি হাতেও তাঁকে খাঁটি অভিজাত বলেই মনে হত। একজন বিদেশী সাহিত্যিকের একটি উক্তি মনে পড়ছে— To work for love of the work is aristocratic। রথীবাবু ছিলেন সেই অভিজাত কারিগর। ভালোবেসে কাজ করতেন বলেই যা-কিছু করতেন তারই গৌরব বাড়ত। মনে আছে একবার তাঁর চামড়ার কাজ আর কাঠের কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের; কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের। কথা ক'টি শুনতে বড়ো ভালো লেগেছিল। এমন সুন্দর করে যিনি কথা বলতে পারতেন তাঁর লেখক হবার পথে কোনোই বাধা ছিল না অথচ কত সামান্যই তিনি লিখে গেলেন।

লাজুক স্বভাবের মানুষ বলে খুব একটা মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না। কর্মীদের বেশির ভাগই তাঁকে দূরে থেকে সমীহ করে চলেছেন, আপনজন বলে ভাবতে পারেন নি। তিনি কিন্তু সকলের খবরই রাখতেন, কারো বিপদে-আপদে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন; কিন্তু এতই গোপনে যে অপর

কেউ তা জানতে পারত না। ডান হাতে যা দিয়েছেন, বাঁ হাতও তা জানতে পারে নি। অপর একটি জিনিসও লক্ষ্য করেছি। তাঁর নিজস্ব একটি গাড়ি ছিল। শান্তিনিকেতনে তখন ঐ একটিই গাড়ি। মহামান্য অতিথিদের জন্যেই সেটি ব্যবহৃত হত, নিজে পারতপক্ষে ব্যবহার করতেন না। আশ্রমবাসী কারো বাড়িতে যেতে হলে হেঁটেই যেতেন, কখনো রিক্‌শ করে। এটিও তাঁর সেই স্বভাব-সৌজন্যের নিদর্শন। সকলেই অল্পবিত্ত কর্মী, দরিদ্র সংসারী— পাছে বড়োমানুষি প্রকাশ পায়, এই বোধটি মনে গাঁথা ছিল। আমার দরিদ্র গৃহেও কতদিন তিনি পায়ে হেঁটেই চলে এসেছেন। আমি একটু অতিরিক্ত চা-বিলাসী, এসে দেখেছেন আমি একটি চায়ের কাপ সুমুখে নিয়ে বসে আছি। ঘরে ঢুকেই বলতেন—That inevitable cup of tea! চা খেতে ভালোবাসি বলে যখনই কোনো কাজে আমাকে ডেকেছেন তখনই চা-জলখাবার এসেছে, নিজে হাতে চা করে খাইয়েছেন। শেষ দিকে বছর-তিনেক তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল। তাঁর অসামান্য সৌজন্য, কর্মদক্ষতা এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখে কত সময়ে চমৎকৃত হয়েছি। সত্যি বলতে কি, তাঁর সঙ্গে কাজ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমন আর কখনো পাই নি।

এমন নীরবে, এত কম কথা বলে কোনো মানুষকে আমি কাজ করতে দেখি নি। অতি বৃহৎ কাজও অতি নিঃশব্দে সম্পন্ন হত। হাঁকডাক তো দূরের কথা, তাঁকে কখনো উঁচু গলায় কথা বলতে শুনি নি। এমন নিখুঁত ভদ্রতাও আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখি নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সহজাত সৌজন্য পরিচিত মহলে প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছিল। এই যে স্বভাবের শোভনতা এও তাঁর স্বভাবগত রুচিবোধ এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তারই অঙ্গ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্নেহপ্রীতি-সৌজন্যের কত যে পরিচয় পেয়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। একবার কোনো উপলক্ষে তাঁর একটি ভাষণ আমাকে লিখে দিতে বলেছিলেন। দিয়েছিলাম; দুদিন পরে তাঁর এক চিঠি পেলাম: আপনার দৌলতে অনেক প্রশংসা অর্জন করা গেল। আজ দুদিন ধরে ভাষণটির জন্যে অনেকে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন। আমি যে কী ভয়ানক লজ্জিত বোধ করছি কী বলব। মনে হচ্ছে আপনার প্রাপ্য প্রশংসা আমি অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছি··· ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্তাব্যক্তি এবং কর্মীর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক একমাত্র শান্তিনিকেতনেই

সম্ভব। যাক, এ প্রসঙ্গে অধিক না বলাই ভালো। কারণ আমার স্বভাব রথীন্দ্রনাথের বিপরীত— তিনি আত্মগোপনে সিদ্ধহস্ত, আমি আত্মপ্রচারে।

সর্বময় কর্তা হয়েও কর্তৃত্ব না করা একটা মস্ত বড়ো গুণ। রথীন্দ্রনাথের সে গুণটি ছিল। বিশ্বভারতী ঠিক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়, এখানে বহু বিচিত্র কাজের সমাবেশ। অ্যাকাডেমিক বিভাগ ছাড়াও আছে সংগীত-ভবন, কলাভবন, গ্রাম-সংগঠন, শিল্পসদন, ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। রথীন্দ্রনাথের মস্ত বড়ো সুবিধা ছিল যে এর কোনো ব্যাপারেই তিনি নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন না, কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে বিশেষজ্ঞই বলা যেতে পারত। তথাপি কোনো বিভাগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না।

ছ' বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু দুবছর যেতে-না-যেতেই তিনি কাজে ইস্তফা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যে কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে আসছিলেন স্বেচ্ছাসেবায় বিনা পারিশ্রমিকে এখন বেতনভুক কর্মী হিসাবে সে কাজে আর আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দেখাই যাচ্ছিল কাজ থেকে তাঁর মন উঠে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এর স্বভাবচরিত্রটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছিলেন। কালের পরিবর্তনে বিশ্বভারতীরও পরিবর্তন হবে সেটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। তবে রথীবাবুর সময়ে যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্বভারতীর স্বভাবধর্মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে হচ্ছিল। নবপর্যায়ে যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাজ শুরু হল তখনো বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং জীবনধারা কিভাবে পরিচালিত হবে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ-আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। সে আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়াও তৈরি হয়েছিল কিন্তু বৎসর-কাল যেতে-না-যেতেই পরীক্ষা এবং ডিগ্রি ডিপ্লোমা সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে আর সমস্তই চাপা পড়ে গেল। আমাদের সেই পরিকল্পনা কোথায় গেল ভেসে। পরে উক্ত খসড়ার দুর্গতি নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাস হত। বলা বাহুল্য, সে পরিহাস কিঞ্চিৎ করুণরস মিশ্রিত। এর অনতিকাল পরেই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন। এ কথা আজ আর কারোই বুঝতে বাকি নেই যে তিনি চলে যাওয়াতে শান্তিনিকেতনের অশেষ ক্ষতি হয়েছে। শান্তিনিকেতন

জীবনে ক্রমেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। তিনি কতখানি কর্মদক্ষ এবং বিচক্ষণ অধিনায়ক ছিলেন তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল।

আত্মপ্রচারের যুগে আমাদের বাস। নিজেকে জাহির করবার নির্লজ্জ প্রয়াস সুসভ্য সমাজের এতই গা-সহা, মনে হয় শিক্ষিত মানুষদেরও এ জিনিস তেমন আর শিষ্টাচারে বাধে না। এক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই দেখলাম বহুগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেলেন। পারতপক্ষে লোকসমক্ষে আসেন নি, নিজের কথা বলেন নি, অপর কেউ তাঁর সম্বন্ধে বলে তাও চান নি। নিজেকে এমন ভাবে বিলোপ করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। এক সময়ে আত্মকথা লিখতে বসেছিলেন কিন্তু সেখানেও স্বভাবকুণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। গোড়ার দিকে নিজ বালক বয়সের কথা, ছাত্রজীবনের কথা কিছু বলেছেন, তার পরে সমস্তই পিতার কথা। আত্মকথা হল পিতৃকথা, জীবনস্মৃতি হয়েছে 'পিতৃস্মৃতি'। বাস্তবিক পক্ষে পিতার কাজে নিজেকে এমন একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে নিজস্ব জীবন বলে বলতে গেলে কিছু তাঁর ছিল না। এই আত্মবিলোপের মর্যাদা অপরে কতখানি বুঝেছে জানি না— কিন্তু স্নেহশীল পিতা অবশ্যই তা বুঝেছিলেন। পুত্রের জন্মদিনে যে কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন :

'কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে এক পাশে।'

রবীন্দ্রনাথের চতুষ্পার্শ্বে বহু মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির দীপ্তি সকলের উপরেই অল্পবিস্তর পড়েছে, কিন্তু সব চাইতে কম পড়েছে রথীন্দ্রনাথের উপর। কারণ তিনি থাকতেন সকলের পিছনে, লোকচক্ষুর অগোচরে। পিতৃপরিচয়ের কোনো সুযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনো নেবার চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্রঅনুগামীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন,

'আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।'

রবীন্দ্রনাথ
ও
শান্তিনিকেতন' গৃহ
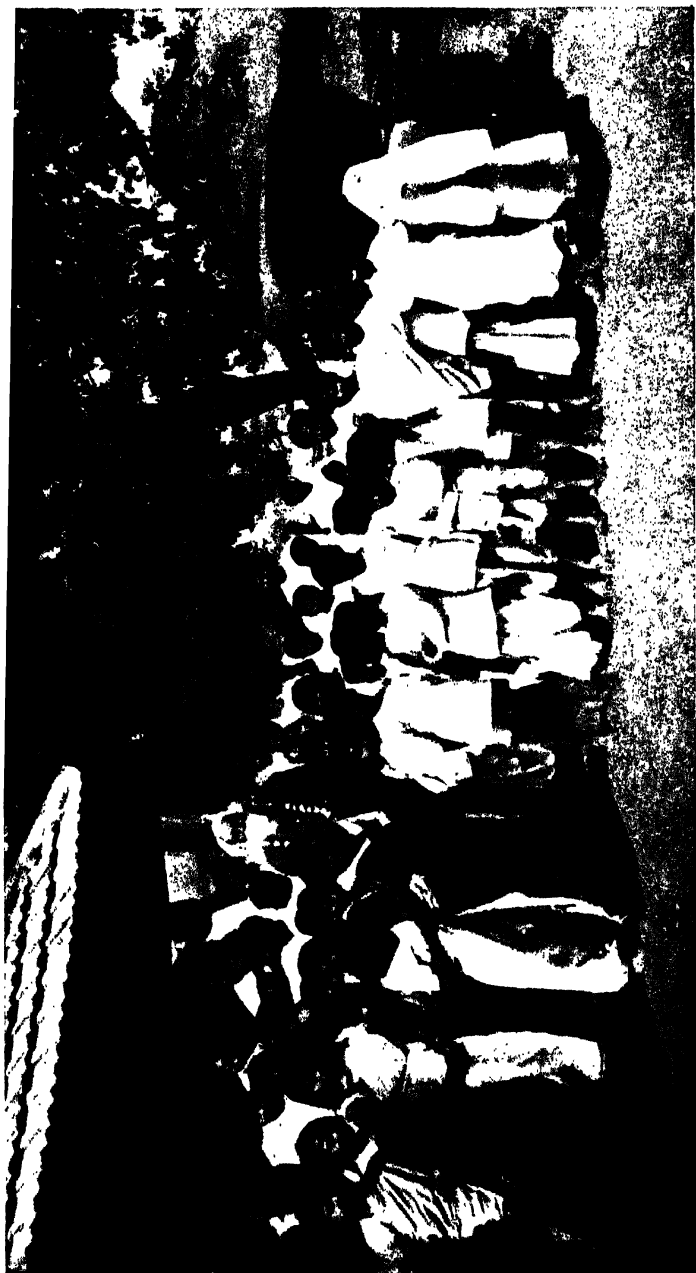
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

গৌরগোপাল ঘোষ

পুরোনো লাইব্রেরি গৃহের সুমুখে যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটি আছে সেটির নাম গৌরপ্রাঙ্গণ। লাইব্রেরির উলটো দিকে সিংহসদন, সিংহসদনের গা ঘেঁষে পূর্ব তোরণ আর পশ্চিম তোরণ, এক পাশে সত্য-কুটির অপর পাশে শমীন্দ্র-কুটির। পেছনের সারিতে সতীশ-কুটির এবং মোহিত-কুটির। সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং কবি-পুত্র শমীন্দ্রনাথের নামে অভিহিত ছাত্রদের এই চারটি আবাসগৃহ। অদূরে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নামাঙ্কিত শিশুদের বাসগৃহ সন্তোষালয়। মাঝখানটিতে গৌরগোপাল ঘোষের স্মৃতি-বিজড়িত গৌর-প্রাঙ্গণ। আজ পর্যন্তও এটিই আশ্রমের কেন্দ্রস্থল। এরই চার পাশে গাছের তলায় তলায় ইস্কুলের ক্লাস বসত, এখনো বসে। এক সময়ে কলেজের ক্লাসও মুক্তাঙ্গনে এরই আশেপাশে বসত। ছাত্রদের সাহিত্যসভা ওখানেই হত, এখনো হয়। বহুদিন পর্যন্ত নাটকাদির অভিনয় ওখানেই হয়েছে। লাইব্রেরির বারান্দাটিকে স্টেজ হিসাবে ব্যবহার করা হত আর গৌরপ্রাঙ্গণ ছিল আমাদের অডিটোরিয়াম। এক কথায় ছাত্র-শিক্ষকদের সকল কর্মকাণ্ডের, বলতে গেলে শান্তিনিকেতন জীবনেরই কেন্দ্রস্থল ছিল এটি। কাজেই যাঁর নামে ঐ স্থানটির নামকরণ হয়েছিল, অনুমান করা যায় এক সময়ে সে মানুষটি ছিলেন আশ্রম জীবনের অন্যতম কেন্দ্র-ব্যক্তি।

কেন্দ্র-ব্যক্তি হওয়া কিছু বিচিত্র নয় কারণ গৌরগোপাল ছিলেন আশ্রমবাসী সকলের অতিশয় প্রিয়পাত্র। চন্দননগরের ছেলে, শান্তিনিকেতনে মানুষ। এখানে এসেছিলেন সাত কি আট বছর বয়সে, বিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র। ফরসা রঙ, ফুটফুটে চেহারা। আসবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরগোপালের নাম হয়ে গেল গোরা। আশ্রমবাসী সকলে তো বটেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে ঐ নামেই ডাকতেন। তখন গোরা উপন্যাস সবে প্রকাশিত হয়েছে; ঐ নামের সঙ্গে গৌরগোপালের নতুন নামকরণের খানিকটা সম্পর্ক থাকতেও বা পারে।

সর্বকনিষ্ঠ বলেই ছাত্র-মাস্টার সকলের আদরের পাত্র— বলা যেত আশ্রম-মৃগ। কিন্তু ঐ বয়সেই কথায় কাজে খুব চৌকস এবং সপ্রতিভ বলে মনে হত। রথীবাবু বলেছেন— সেই তখনই লক্ষ করেছিলাম, ওর চলাফেরার একটা নিজস্ব ভঙ্গি ছিল, ভাবে ভঙ্গিতে বেশ একটু ব্যক্তিত্বের আভাস ফুটে

উঠত। দুদিনেই ছোটোদের সর্দার হয়ে উঠল। পরে প্রমাণিত হয়েছে, ঐ গুণটি অর্থাৎ দলনায়ক হবার ক্ষমতাটি তাঁর স্বভাবজাত। ইস্কুলে যখন একটু উপরের ক্লাসে উঠেছেন তখন গৌরগোপাল হলেন ছাত্রদের ক্যাপটেন বা অধিনায়ক। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় ক্যাপটেনের বেশ খানিকটা দায়িত্ব ছিল। ক্যাপটেনের আদেশ কেউ অমান্য করতে পারত না। গৌরগোপাল এতই যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে, স্কুল-জীবনের শেষ অবধি ঐ পদটি তাঁর বজায় ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরে ঐ ছেলেই মোহনবাগান ক্লাবের ক্যাপটেন নিযুক্ত হয়েছিলেন।

খেলাধুলায় ওস্তাদ ছিলেন। শুধু ফুটবলে নয়, সকল রকম খেলাতেই সহজ নৈপুণ্য ছিল। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বেশির ভাগ পুরস্কার তাঁরই কবলীকৃত হত। নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশলও শিখে নিয়েছিলেন। একবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে এক সার্কাসের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং অদ্ভুত সব কসরত দেখিয়ে আশ্রমবাসী সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সার্কাসের ওস্তাদরা বুকের উপর হাতি তুলে থাকেন। গৌরগোপাল হাতি কোথায় পাবেন? তার বদলে বুকের উপরে একটা মস্ত বড়ো গোরুর গাড়ি তুললেন। দেখে সকলের চক্ষুস্থির।

খেলাধুলায় যেমন মজবুত পড়াশুনায়ও তেমনই ভালো ছিলেন। এখান থেকে স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতার কলেজে পড়তে গেলেন। সেই তখনই মোহনবাগান দলে খেলে কলকাতায় খুব নাম করেছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এসসি. পাস করে ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়টিতে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আহ্বান এল, যদি আপত্তি না থাকে তো শান্তিনিকেতনের কাজে চলে আসতে পারো। আপত্তি তো থাকতেই পারত। শান্তিনিকেতনের দরিদ্র সংসারে আর্থিক আশা-ভরসা তখন কিছুই ছিল না। কাজেই আসতে হলে সরকারী বেসরকারী চাকুরির প্রলোভন, আইন ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি সমস্ত কিছু ছেড়েই তাঁকে আসতে হবে। গৌরগোপাল কিন্তু এক মুহূর্তও ইতস্তত করলেন না। গুরুদেবের আহ্বান পাওয়া মাত্র আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে, এমন-কি, মোহনবাগানের মোহকেও ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। এ দিকে রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন শৈশব থেকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত, এখানকার জীবনে অভ্যস্ত,

তার উপরে এমন প্রাণবন্ত একটি ছেলেকে পেলে বিদ্যালয়ের কাজ তিনি যেমনটি চান ঠিক তেমনটি চলতে পারবে। গৌরগোপালকে পেয়ে বাস্তবিকই খুব খুশি হলেন। অ্যাণ্ড্রুজকে একটি চিঠি লিখে জানাচ্ছেন— আমাদের পুরোনো ছেলে গোরা এসেছে অঙ্কের শিক্ষক হয়ে। 'I am sure he will prove to be a valuable acquisition to us.' গৌরগোপাল তাঁর ঐ আশা সর্বতোভাবে পূরণ করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় যেমন বিদ্যালয়ে সকলের প্রিয় ছিলেন, শিক্ষক হিসাবেও অল্পদিনেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। মোহনবাগানের কল্যাণে ছাত্রদের চোখে তো প্রথম দিন থেকেই হিরো। সেই তখনকার দিনে গৌরগোপাল বুটপায়ে খেলতেন। ছেলেদের চোখে তখন সেটাই একটা অভিনব ব্যাপার। পুরোনো দিনের ছাত্রদের মুখে শুনেছি, 'স্কুল ছুটির পরে সুদর্শন স্বাস্থ্যবান মানুষটি যখন খেলার পোশাক পরে বুট পায়ে গট্‌গট্‌ করে মাঠের দিকে যেতেন তখন ছেলের দল তার পেছন পেছন ছুটতে থাকত। ছেলেরা যাঁর গুণে মুগ্ধ তাঁরই ভক্ত হয়ে ওঠে। তারা সব সময়ে তাঁকে ভালোবাসবে এবং মান্য করে চলবে। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি খুব ভালো করেই জানতেন; সেজন্যে শিক্ষক নিয়োগের সময় সর্বাগ্রে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন মানুষটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী কি না।

স্কুলে অধ্যয়নকালে যেমন ছাত্রদের অধিনায়ক ছিলেন, অধ্যাপনাকালেও তেমনই ছাত্রদের যাবতীয় ব্যাপারে গৌরবাবুই ছিলেন প্রধান নায়ক। বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও আশ্রম সংক্রান্ত সকল কাজেই তাঁর ডাক পড়ত; কারণ সব কাজে তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। এক সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেছেন। পরে ঐ পদটির নাম হয়েছিল শান্তিনিকেতন সচিব। আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন, যখনই কোনো নতুন কাজের সূচনা হয়েছে তখনই পরম উৎসাহে তাতে এসে যোগ দিয়েছেন। এলম্‌হার্স্ট এসে যখন শ্রীনিকেতনে গ্রাম-সংগঠনের কাজ শুরু করলেন তখন গৌরগোপাল হলেন তাঁর অন্যতম সহযোগী। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সর্বাধিনায়ক এলম্‌হার্স্টের অধীনে তিন সেনানায়ক ছিলেন— সন্তোষ, কালীমোহন এবং গোরা। এলম্‌হার্স্ট এঁদের তিনজনের কাছ থেকেই অতি মূল্যবান সহযোগিতা লাভ করেছেন। পরে যখন শ্রীনিকেতনে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয় তখন গৌরবাবু

হলেন তার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। এ কাজটিও তিনি অতি সুচারু-রূপে সম্পাদন করেছেন। ক্রমে শ্রীনিকেতনের কাজ যখন নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করল, কর্মীসংখ্যা বাড়ল এবং ধীরে ধীরে একটি জনপদ গড়ে উঠল তখন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সেতু বন্ধন করে দপ্তর পরিচালনার জন্য একজন কর্মাধ্যক্ষের প্রয়োজন হল। গৌরবাবু নিযুক্ত হলেন শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ। যখন যে কাজ করেছেন তাই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বালক বয়সে যেমন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবেও তেমনি তাঁর আস্থাভাজন হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁর মধ্যে কোনো শক্তির সম্ভাবনা দেখেছেন তাঁকেই নানাভাবে শক্তি বিকাশের এবং প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। বিদেশে যখনই যেতেন তখনই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক-কর্মীদের মধ্যে দু-একজনকে নিয়ে যেতেন। উদ্দেশ্য ছিল বহির্জগতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া; তাতে তাঁদের মনের প্রসার বাড়বে আর সেইসঙ্গে তাঁরা যদি নিজ নিজ কাজের উপযোগী কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ নিতে পারেন তা হলে সেটা হবে শান্তিনিকেতনের পক্ষে মস্ত লাভ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে গৌরবাবুকেও একবার তিনি বিলাত-ভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গৌরগোপালের ছাত্রজীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে, কর্মজীবনের শুরু শান্তিনিকেতনে, বিয়ে করে সংসারীও হলেন শান্তিনিকেতনে। গৌরবাবু যখন শ্রীনিকেতনের কাজে নিযুক্ত তখন শিল্পী মুকুল দে-র ভগ্নী, রানী চন্দর দিদি অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সেই বিবাহ উৎসবটাও শান্তিনিকেতনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। গল্পটা বলবার মতো। গৌরবাবু থাকেন শ্রীনিকেতনে গ্রাম-সংগঠনের কাজে অর্থাৎ কিনা গাঁয়ের ছেলে, কাজ করছেন গাঁয়ের, কাজেই বিয়ের বর হিসাবে আসবেন তো আসতে হবে ঠিক গাঁয়ের ছেলেটির মতো। আবার বিয়ে করছেন কাকে? না অন্নপূর্ণাকে। আর অন্নপূর্ণাকে যিনি বিয়ে করছেন তিনি তো স্বয়ং শিবশংকর। শিবের বাহন হল ষাঁড়, অতএব বরকে আসতে হবে গোরুর গাড়িতে চেপে। এ সবই নন্দলাল বসু সুরেন্দ্রনাথ কর এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনা। তখনকার দিনে যে-কোনো আশ্রম-বাসীর পারিবারিক অনুষ্ঠানও সমস্ত আশ্রমেরই উৎসব বলে গণ্য হত এবং সকলে সমবেতভাবে তাতে যোগ দিতেন। গৌরগোপালের পিতামাতা দুজনেই

গত, বরকর্তা হলেন রথীবাবু। প্রতিমা দেবী নিজ হাতে সাজিয়ে তত্ত্ব পাঠালেন কনের বাড়িতে। তত্ত্ব নিয়ে এল সাঁওতাল মেয়েদের মস্ত বড়ো এক দল— পরনে বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়ি, গায়ে ঝক্‌ঝকে রুপোর গহনা, খোঁপায় লাল জবা। সন্ধ্যাবেলায় বর এলেন সুসজ্জিত গোরুর গাড়িতে চেপে। সে কি যে-সে গাড়ি? সুরেনবাবু রীতিমত একটি রথ তৈরি করে দিয়েছিলেন, রথের এক পাশে চলেছে সাঁওতাল যুবকের দল বাসন্তী রঙের ধুতি-পাগড়িতে সেজে কাঁসর মাদল বাঁশি বাজিয়ে, অপর পাশে সুসজ্জিতা সাঁওতাল মেয়েরা চলেছে নেচে নেচে। এমন অপূর্ব বিয়ের শোভাযাত্রা শান্তিনিকেতনেও আর কখনো দেখা যায় নি।

এই বিবাহোৎসবের বিবরণটি দেওয়া হল দুটি কারণে। প্রথমত স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এক সময়ে শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের মধ্যে একটি একাত্ম-বর্তিতার ভাব ছিল। অথচ যখনকার কথা বলছি তখন শান্তিনিকেতন তার আশ্রম-বিদ্যালয়ের যুগ পার হয়ে এসেছে, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনে বিস্তার লাভ করেছে, লোকসংখ্যাও বেড়েছে কিন্তু আশ্রম পরিবারটি ভেঙে যায় নি। দ্বিতীয়ত লক্ষ করবার বিষয় যে শান্তিনিকেতনে কারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজকেও সৌন্দর্যময় এবং আনন্দময় করে তোলবার প্রয়াসটি তখনো অব্যাহত ছিল। সে কাজে শিল্পাচার্য, সংগীতাচার্য এবং আচার্য গৃহিণীরা সকলে এসে হাত লাগাতেন। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের সস্নেহ উৎসাহ এবং প্রেরণা তো থাকতই।

গৌরগোপাল ঘোষ সকল কাজে যেমন উৎসাহী তেমনি আবার পরিশ্রমীও ছিলেন। খুব নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলেন বলে নানা সময়ে নানা কাজের ভার পড়েছে। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন— পর পর দুটি প্রতিষ্ঠানেই অধ্যক্ষ পদে কাজ করেছেন। দুটিই দায়িত্বপূর্ণ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। তাঁর ন্যায় স্বাস্থ্যবান মানুষের পক্ষেও বোধ করি একটু অতিরিক্ত হয়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত মনে হত, গৌরগোপালের গৌর বর্ণ একটু যেন তামাটে হয়ে গিয়েছে। এদিকে আবার নতুন কাজে তাঁর ডাক পড়ল। শ্রীনিকেতনের কাজ থেকে নিয়ে আসা হল বিশ্বভারতী সচিবালয়ে কর্মসচিবের সহকারী পদে। রথীবাবু বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, গৌরবাবু সহকারী কর্মসচিব। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিন্তু দায়িত্বপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নি। তবে খুব কাজের

মানুষেরও কাজ কখনো শেষ হয় না; সংসারে সকল মানুষেরই সকল কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রাণপ্রাচুর্যে এক সময়ে যিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন, ভেতরে ভেতরে তাঁর প্রাণশক্তি যে নিঃশেষ হয়ে আসছিল বাইরে থেকে তা বোঝা যায় নি, নিজেও তা বুঝতে পারেন নি। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মানুষ, অকস্মাৎ গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে দু-তিন দিনের মধ্যে তাঁর জীবনান্ত ঘটল। বয়স তখন কিছুই নয়, পঞ্চাশও হয় নি।

কাজের মানুষ তো বটেই, আবার কল্পনাপ্রবণ মানুষও ছিলেন। গৌর-বাবুর মৃত্যুর পরে রথীবাবু একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে বলেছিলেন— তখন শ্রীনিকেতনের সবে সূচনা হয়েছে, কাজটার গোড়াপত্তন করতে কয়েকদিন খুব খাটুনি গিয়েছে। এলম্‌হার্স্ট বললেন, এবারে একটু ফুরসত নেওয়া যাক, পরবর্তী পর্যায়ের কথাটা ভেবে দেখতে হবে। একটা পুরোনো ঝরঝরে ফোর্ড গাড়ি ছিল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল দুমকা পাহাড়ের দিকে। রাতটা কাটিয়ে-ছিলেন সেই পাহাড়েই। খাবার-দাবার সঙ্গে ছিল, জোছনা রাতে আকাশের তলায় খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে কত কথার আলোচনা হল। বলেছেন— সেদিন দেখেছিলাম গোরার সে কী উৎসাহ, ভবিষ্যতের কত জল্পনা-কল্পনা! এমন মন খুলে কখনো ওকে কথা কইতে শুনি নি। সেদিন যেন গোরাকে নতুন করে দেখলাম, জানলাম।

গৌরগোপালের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর কর্মনিষ্ঠায় কতখানি প্রীত ছিলেন তারও প্রমাণ আবার নতুন করে পাওয়া গেল। গৌরবাবু চারটি শিশুসন্তান রেখে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনই লিখিতভাবে এই নির্দেশ-দিয়েছিলেন যে গৌরগোপালের সন্তানদের শিক্ষার ভার বিশ্বভারতীকেই গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বভারতী তাঁর সেই অনুজ্ঞা পালন করেছে।

সন্তোষ মজুমদার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথকে তথা শান্তিনিকেতনকে কেউ যদি গুরুদক্ষিণা দিয়ে থাকেন তো সন্তোষবাবুই দিয়েছেন। এখানে স্বীকার করতে হবে যে শুধু সন্তোষবাবু নয়, গৌরবাবুও গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন। আর গুরুদক্ষিণা বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন সে কথাটাও বহুদিন পূর্বে গৌরবাবু যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষা সমাপ্ত করে চলে যান তখন একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমাদের কাছে

গুরুদক্ষিণা চাহিবার অধিকার আমার আছে। সেই দক্ষিণা আর কিছু নহে, চরিত্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলো যাহাতে তোমাদের জীবনের মধ্য দিয়া আমরা গৌরব লাভ করি। তোমাদিগকে দেখিয়া সকলেই যেন আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনাকে সার্থক বলিয়া জানিতে পারে।'

এই সূত্রে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হবে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন একদিন যে অধিকার দাবি করতে পেরেছে আজকের শান্তিনিকেতন কি তার শিক্ষার্থীদের কাছে সে অধিকার দাবি করতে পারে? অধিকার তো কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার অর্জন করতে হয়।

লেনার্ড নাইট এলম্‌হার্স্ট

শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে যে-ক'জন বিদেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সারা ভারতবর্ষেরই সেবা করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আর-একজন ইংরেজ যিনি একই সময়ে এদেশের জন্যে যথেষ্ট করেছেন তাঁর কথা আমাদের শিক্ষিত মহলেও সকলে ভালো করে জানেন না। তার কারণ তিনি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের মধ্যে বাস করেছেন, নিজের হাতে চাষের কাজ করেছেন। ইনি লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট। অ্যাণ্ড্রুজ ভারতবর্ষকেই আপন দেশ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সুখদুঃখের এবং রাজনৈতিক জীবনে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমান শরিক ছিলেন। জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলে সর্বক্ষণ তাঁকে লোকসমক্ষে থাকতে হয়েছে। এলম্‌হার্স্ট ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। কাজ নিয়ে থাকতেন, রাজনীতির ধার ধারতেন না। এজন্যে অ্যাণ্ড্রুজের মতো তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন'নি। তবে একটি বিষয়ে দুজনেই সমান ছিলেন—দুজনেই সমান রবীন্দ্রভক্ত। এঁদের দুজনের মতো এমন সর্বান্তঃকরণে রবীন্দ্রপ্রেমিক মানুষ এদেশেও বিরল।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে এলম্‌হার্স্ট আর্মিতে যোগদান করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে বেধেছে কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুন আর্মি ছাড়তে হল। তা হলেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা কাজে সাধ্যমত সহায়তা করেছেন। সে সূত্রে নানান দেশে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। যুদ্ধ শেষে যান আমেরিকায় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা ভ্রমণে যান তখন কবির সঙ্গে এলম্‌হার্স্টের প্রথম সাক্ষাৎ নিউইয়র্কে। তিনি তখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট-টাইম অধ্যাপনায় এবং সেইসঙ্গে কৃষিবিদ্যার পাঠ নিচ্ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্মধারাকে সম্প্রসারিত করে তাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দেবার কথা ভাবছিলেন। কেবল-মাত্র পরীক্ষা পাসের কেন্দ্র না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে জাতিগঠনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্যে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে অন্যবিধ নানা চর্চার

পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগের যোগসাধন হলে তবেই শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কবি তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন যে একটি ইংরেজ যুবক ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে থেকে সেখানকার কৃষিক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজ করতে ইচ্ছুক। শুনে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে যুবকটিকে সুযোগমত কখনো এসে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অনুরোধ জানান। ছাত্রাবস্থায় গীতাঞ্জলি পাঠের পর থেকেই এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। সেই কবির কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে তিনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করেন নি। ছুটে এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরিচয়ের সূত্রপাতেই কবিও যুবকটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে রবীন্দ্রনাথ এলম্‌হার্স্টকে বলেছিলেন— আমার একটি বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়ের কাজ প্রধানত অ্যাকাডেমিক অর্থাৎ পুঁথিগত। চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে তার খুব একটা যোগ নেই। বিদ্যালয়ের আশেপাশে যে-সব গ্রামগঞ্জ আছে সেগুলো ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফসলের জমিতে ফসল নেই, জলাশয়ে জল নেই, লোকালয়ে লোক নেই— ম্যালেরিয়ায় মরছে, নয়তো গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। বিদ্যালয় লোকালয়েরই অংশ। লোকালয় যদি মরণদশায় পড়ে তবে বিদ্যালয়েরও সেই দশাই ঘটবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তা হলে সে শিক্ষা প্রাণহীন হতে বাধ্য। আমি বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে এ কাজ আনাড়ি মানুষকে দিয়ে হবে না। এর জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা চাই। শুধু শিক্ষা থাকলেও চলবে না; মনটিও এ কাজের উপযোগী হওয়া চাই। গ্রামবাসীকে ভালোবাসতে হবে, তাদের জীবনের শরিক হতে হবে। চাষীর কথা চাষী শুনবে, বাবু-ভূঞার কথা শুনবে না। অগতির গতি করবার মতলব নিয়ে পরোপকার করতে গেলে বাধা পাবে। যদি বুঝতে পারে যে এ আমাদেরই একজন তা হলে আর বাধা-ব্যবধান থাকবে না, তাদের সমস্যা যখন তোমারও সমস্যা হবে তখনই আলাপ-আলোচনার পথ খুলে যাবে। তখন এদের দিয়েও আধুনিক রীতি-পদ্ধতিতে চাষ করানো যাবে। এলম্‌হার্স্টকে বললেন— আমি এ কাজের জন্যে একজন উৎসাহী নিষ্ঠাবান কর্মী খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি যদি ইচ্ছুক থাক তা

হলে আমার ঐ কাজের ভার নেবার জন্যে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এলম্‌হার্স্ট তৎক্ষণাৎ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ হতে কয়েক মাস বাকি ছিল। স্থির হল, অধ্যয়ন শেষ হলেই তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করবেন। পাঠ সমাপ্ত করে এলম্‌হার্স্ট আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু কালবিলম্ব না করে কবিকে লিখে জানালেন যে তিনি প্রস্তুত আছেন, তাঁর নির্দেশ পেলেই রওনা হবেন। এ চিঠির জবাবে অ্যাণ্ড্রুজের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পেলেন— টাকার জোগাড় হয় নি, এক্ষুনি আসবার প্রয়োজন নেই। এলম্‌হার্স্ট ফিরে তারযোগে জানালেন— টাকার জোগাড় আছে, আসতে পারি। রবীন্দ্রনাথ খুব অবাক হলেন; নিজেই লিখে পাঠালেন: স্বচ্ছন্দে আসতে পারো। রওনা হবার আগে পিতা জিজ্ঞেস করেছিলেন— চাকরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছ, পোষাবে তো? মাইনে কত? ছেলে বললে: মাইনে নেই। শুনে পিতা হতবাক।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে এলম্‌হার্স্ট শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন চলছে, এক মাস পরেই প্রতিষ্ঠা উৎসব। সিলভাঁ লেভি ও মাদাম লেভি ইতিমধ্যে এসে পৌঁচেছেন। এলম্‌হার্স্ট গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছেন, বিশ্বভারতীর ব্যাপারে কবির যতখানি উৎসাহ, গ্রামোদ্যোগ কর্মে তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কবির সঙ্গে আলোচনা শুরু হল পরদিন থেকেই। মৃতপ্রায় গ্রামকে কিভাবে সঞ্জীবিত করা যায় সে বিষয়ে মত-বিনিময় হতে লাগল দিনের পর দিন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষ মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষ মিত্র— এঁদের পাঁচজনকে জুড়ে দিলেন এলম্‌হার্স্টের সঙ্গে। বললেন— এঁদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলোর অবস্থা আগে বুঝে নাও। শুরু হল গ্রামে ঘোরাঘুরি, ক্রমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে কাসাহারা নামে একজন জাপানী কারিগর এলেন অবনীন্দ্রনাথের সুপারিশপত্র নিয়ে। নানা কাজে এঁর দক্ষতা ছিল। গাছপালার তত্ত্বাবধানে, ফুলের বাগান, সবজি বাগানের পরিচর্যায় পারদর্শী ছিলেন, কাঠের কাজে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল এবং হাঁস-মুরগি পালনে প্রচুর উৎসাহ ছিল। এ সমস্তই গ্রামের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; কাজেই এঁকেও এলম্‌হার্স্টের দলভুক্ত করে দেওয়া হল।

শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সুরুল গ্রামে লর্ড সিংহ পরিবারের একটি কুঠিবাড়ি ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সেই কুঠিবাড়িটি এবং কুঠি-সংলগ্ন কিছু জমি কিনে রেখেছিলেন। এখন সে স্থানটিকে কেন্দ্র করেই গ্রামোন্নোগ পর্বের সূচনা হল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ কোনো কাজই ঝোঁকের মাথায় করেন নি। কোনো চিন্তাকে দীর্ঘকাল ধরে মনে মনে লালন করেছেন, ভেঙেছেন, গড়েছেন— ক্রমে সেটি যখন তাঁর মনে একটি বিশেষ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে তখনই তাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তার আগে নয়। জমিদারি পরিচালনার সময়ে যখন গ্রামবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের অভাব-অভিযোগ সমস্যাদি নিয়ে ভেবেছেন এবং শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হন নি, পতিসর অঞ্চলে গ্রামের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য দূরী-করণে, রাস্তাঘাট নির্মাণে, জলাশয়ের সংস্কারে, জমিজমা-সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করে তিনি পল্লীজীবনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি যে স্বদেশী-সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন তাও সে পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করে পল্লী-প্রধান দেশের কথা ভেবেই। এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীনিকেতনের সূচনা সেই তখন থেকেই হয়েছে। পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হ'লে তবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি। বলেছেন, 'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এখানেই প্রাণের নিকেতন, লক্ষ্মী এখানেই তাঁর আসন সন্ধান করেন।'

সুরুলের কুঠিবাড়ি এবং কুঠিসংলগ্ন জমি কেনাটা যে নিতান্ত একটা খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয় বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ, এখন সেটি প্রমাণিত হল। গ্রাম-পরিক্রমা এবং পর্যবেক্ষণে মাস-দুই কাটল। রবীন্দ্রনাথ বললেন— চাষবাসের কাজে উৎসাহী, এমন জনদশেক ছেলে তোমাকে দিচ্ছি। এবার এদের নিয়ে কাজ শুরু করতে পারো। এলম্‌হার্স্টের ইচ্ছা ছিল আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে আর-একটু দেখেশুনে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তবে কাজে হাত দেবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর তর সয় না। তাঁর অধীর আগ্রহের কথা ভেবে এলম্‌হার্স্ট আর কালবিলম্ব না করে কাজে নামবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

কাজ শুরু হল ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে। ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে এলম্‌হার্স্ট তাঁর ছাত্রের দল নিয়ে সুরুল গ্রামে গিয়ে সংসার পাতলেন। হাতে-কলমে কাজ শেখার শুরু প্রথম দিন থেকেই। থাকবার জন্যে খড়ের ঘর তৈরি থেকে

কাঠ কাটা, জল তোলা, রান্নাবান্না ঝাড়পোঁছ— সব কাজেরই বেশির ভাগটা ছেলেদের নিজ হাতে করতে হয়েছে। সব কাজে সর্বাগ্রে নিজে হাত দিয়েছেন বলেই অপরকে দিয়ে কাজ করাতে পেরেছেন। আর-সব কাজ তো না-হয় করানো গেল, কিন্তু জমাদার মেথরের ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানা সাফও নিজেদেরই করতে হয়েছে। করানো সহজ হয় নি। প্রথমে ছেলেরা এগোতে চায় নি; অপরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি একাই সে কাজ করেছেন। দৈহিক শ্রমের প্রতি আমাদের বিমুখতা স্বভাবজাত, তার উপরে আছে নানা ব্যাপারে আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার। তা ছাড়া ডিসিপ্লিনের অভাবে আমাদের স্বভাবে একটা ঢিলেঢালা ভাবও আছে। সেটা সকল কাজের পরিপন্থী। এলম্‌হার্স্ট নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছাত্র-কর্মীদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন এনে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কখনো কখনো তাঁকে খুব কঠোর হতে হয়েছে।

এদিকে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের হিন্দুমুসলমান চাষীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। চাষবাসের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা জেনে নিচ্ছেন। এদের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর শিক্ষালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রণালীর কতখানি মিল ঘটানো যায় তাই নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন। সরকারী কৃষি-বিভাগের সঙ্গেও প্রয়োজনমত আলাপ-আলোচনা করেছেন। বিভাগীয় কর্মচারীরাও এই ইংরেজ চাষীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেদের নিয়ে শ্রীনিকেতনের ঘর-সংসার গুছিয়ে যখন চাষের কাজে নামলেন তখন নিজ হাতে মাটি কুপিয়েছেন, লাঙল ধরেছেন (পরে অবশ্য ট্র্যাক্টর এসেছে— তাও তাঁর নিজের সংগৃহীত অর্থে)। 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই'— এলম্‌হার্স্টই সর্বপ্রথম সব কাজে নিজে হাত লাগিয়ে এ গানকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। নিজেকে সব সময়ে বলতেন চাষা (আমি নিজেই তাঁকে বলতে শুনেছি: আই অ্যাম এ চাষা)। রবীন্দ্রনাথ এলম্‌হার্স্ট এবং তাঁর চাষী ছেলেদের জন্যেই গান লিখে দিয়েছিলেন, 'আমরা চাষ করি আনন্দে।' ধানের গোলা হল, গোলা ধানে ভর্তি থাকত। গাই-গোরু কেনা হল, ডেয়ারির পত্তন হল। পোলট্রির কাজ আগে থেকেই ধীরে ধীরে শুরু করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে মিস গ্রেসেন গ্রীন নামে এক আমেরিকান মহিলা এসে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন। তিনি এখানে

একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। পরে কালীমোহন ঘোষের চেষ্টায় চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামকেই ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতায় আনা হয়। গ্রামবাসীরা নামমাত্র ব্যয়ে চিকিৎসা এবং ঔষধপত্রের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে এলম্‌হার্স্টের বেশ একটা সৌহার্দ্য জন্মেছিল। সাহেবকে এসে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাত। কখনো কখনো বুদ্ধি-পরামর্শের জন্যেও আসত। এলম্‌হার্স্ট সমবায়ে বিশ্বাসী ছিলেন। সমবায় প্রথায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলে মাছের চাষের চেষ্টাও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটি হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সমবায় আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যতদূর জানি বীরভূম জেলার প্রথম সমবায় ভাণ্ডারটি শান্তিনিকেতনে এবং প্রথম কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হয়েছিল।

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস রীতিমত রোমাঞ্চকর। ভাবলে অবাক লাগে সাত সমুদ্র পার হয়ে কোথাকার মানুষ কোথায় এসে চাষী মজুর মেথরের কাজ করে গেলেন, বীরভূমের রোদে বৃষ্টিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেন! রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রীনিকেতনের স্থান কোথায় এবং কেন সে কথা যেমন আজও অনেকের কাছে অস্পষ্ট, তেমনি ভিন্‌দেশী এক কবির আহ্বানে, বিদেশী এই যুবকের ত্যাগ নিষ্ঠা শ্রম, অনেকের কাছেই রহস্যজনক মনে হবে। মনে রাখতে হবে যে অনাত্মীয়ের আত্মদানের দ্বারাই যে-কোনো উদ্যমের সত্যমূল্য প্রমাণিত হয়। অ্যাণ্ড্রুজ-পিয়ারসনের আত্মনিবেদন যেমন শান্তিনিকেতনকে একটি সুষমা দিয়েছে, তেমনি এলম্‌হার্স্টের আদর্শনিষ্ঠা শ্রীনিকেতনের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। এলম্‌হার্স্ট-লিখিত *Poet and Plowman* নামক গ্রন্থে তাঁর শ্রীনিকেতনের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছে। সে দিনলিপি পাঠ করলে বোঝা যাবে দিনের পর দিন কী কঠোর পরিশ্রম তিনি করেছেন এবং কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটিকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

এলম্‌হার্স্টের কাহিনীতে রোমাঞ্চের সঙ্গে রোমান্সেরও কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটেছে। সে কথাটিরও উল্লেখ প্রয়োজন। এলম্‌হার্স্ট যখন কর্নেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পার্ট-টাইম অধ্যাপনা এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন তখন মিসেস ডরোথি স্ট্রেইট নাম্নী এক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল; পরে সে পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। স্বামীর অকাল-

মৃত্যুতে মিসেস স্ট্রেইট বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন। অর্থের ব্যাপারে মুক্তহস্ত ছিলেন। নানা সৎ কার্যে, নানা প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ-দান করেছেন। আগেই বলেছি আর্থিক সংগতির অভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীনিকেতন-পরিকল্পনা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখবার কথা ভাবছিলেন। বলা বাহুল্য, মিসেস স্ট্রেইটের কাছে আশ্বাস পেয়েই এলম্‌হার্স্ট কবিকে তার-যোগে জানিয়েছিলেন যে অর্থের জন্যে ভাবতে হবে না। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীমতী ডরোথি -প্রেরিত বিশ হাজার ডলার (তখনকার মূল্যে এক লক্ষ টাকা) নিয়েই এলম্‌হার্স্ট শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু করেছিলেন। মিস গ্রীন নামে যে মহিলাটি এসে স্কুলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন তাঁকেও ডরোথিই এলম্‌হার্স্টের কাজে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এলম্‌হার্স্ট একনাগাড়ে দু'বৎসর শ্রীনিকেতনে ছিলেন। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসারী হলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শ্রীমতী ডরোথি স্ট্রেইটের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এঁদের দুজনের পূর্ব-পরিচয় এবং সম্পর্কের কথা এখানে অনেকেই জানতেন না। কাজেই এখানে থাকাকালে এমন একটি সুপাত্রের জন্যে প্রায়ই পাত্রীর সন্ধান হত। এলম্‌হার্স্টের দিনলিপিতে এর কৌতুকাবহ উল্লেখ আছে। মাদাম লেভি তাঁকে দেখলেই বলতেন— আহা আমার একটি কন্যা থাকলে এমন পাত্রটিকে আমি কখনোই হাতছাড়া করতাম না। এটা অবশ্য নিতান্তই স্নেহের উক্তি। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অন্যান্য বর্ষীয়সী মহিলারা এই সুশিক্ষিত, সুদর্শন, গুণবান যুবকটির একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে প্রায়ই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা চলত। যা হোক, শ্রীনিকেতনের মূল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথই জুগিয়েছেন সে কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু এলম্‌হার্স্টের মনে প্রেরণার আর-একটি উৎসও যে ছিল সে কথাও স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা, এলম্‌হার্স্ট তার নির্মাতা। একান্ত-ভাবেই তাঁর নিজের হাতে গড়া জিনিস। সূচনায় যেমন, পরেও তেমনি এর আর্থিক দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বিবাহের পরে পত্নীর বিপুল অর্থে এলম্‌হার্স্ট-ট্রাস্ট গঠিত হয়। শ্রীনিকেতনের সমুদয় ব্যয়ভার প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল ঐ ট্রাস্টই বহন করেছে। গোড়ার দিকে কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে— কাজের যেমন যেমন বিস্তার হয়েছে সে অনুযায়ী বার্ষিক

সাহায্যের পরিমাণ শেষ দিকে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ হাজারে উঠেছে। মোট অর্থের পরিমাণ বহু লক্ষ টাকা হবে।

দু'বছরেই কাজটিকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিছু কর্মীও তৈরি করে দিয়েছিলেন। বেশিদিন আর একনাগাড়ে এসে থাকা হয় নি। কিন্তু নিজের হাতে-গড়া শ্রীনিকেতনকে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় ভালোবেসেছেন। দু-এক বছর পরে পরেই এসে দেখে গিয়েছেন। যখনই এসেছেন কিছুদিন থেকে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় ঝালিয়ে নিয়েছেন। বয়স যখন সত্তরের কাছাকাছি তখনো তাঁকে গ্রাম-পরিক্রমায় যেতে দেখেছি।

কর্মযোগে মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এলম্‌হার্স্টের কর্মকুশলতায় শ্রীনিকেতনের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তেমনি আবার এলম্‌হার্স্টেরও যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি বলতে গেলে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ক্রমে পরিচয়ের বৃত্ত প্রসারিত হয়েছে, নাম প্রচারিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সে কাজে সহায়তা করেছেন। কলকাতায় সভার আয়োজন হয়েছে— বিষয় দেশের কৃষি-সমস্যা— বক্তা লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট— সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। লেনার্ডের লিখিত বক্তৃতা নিজে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছে, সরকারী উচ্চ মহলেরও। প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে পরে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার গ্রামজীবন এবং অর্থনীতির কাঠামো যখন একেবারে ভেঙে পড়েছে তখন আমাদের কৃষি এবং গ্রামজীবনকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে সেদিনের (ইংরেজ আমলের) বাংলার লাটসাহেব পরামর্শের জন্যে এলম্‌হার্স্টকে দেশ থেকে ডেকে এনেছিলেন। আবার স্বাধীনতা লাভের পরে নেহরু সরকার যখন কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট বা গ্রামোন্নয়ন-পর্বের সূচনা করেন তখনো এলম্‌হার্স্টকেই আবার উপদেষ্টা হিসাবে আহ্বান করা হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং এলম্‌হার্স্ট-প্রবর্তিত শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনাটিই কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টের কাঠামো হিসাবে অনেকাংশে ব্যবহার করা হয়েছে।

বেশ কিছুসংখ্যক বিদেশী খুব ন্যায্যভাবেই ভারতবন্ধু হিসাবে সমাদৃত। সে সমাদর নিঃসন্দেহে এলম্‌হার্স্টেরও প্রাপ্য। কিন্তু এলম্‌হার্স্টের নাম

লোকমুখে খুব একটা শোনা যায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করেছেন, কাজেই জনসাধারণের গোচরে আসেন নি। সংবাদপত্রে নাম জাহির করেন নি। আমাদের পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখালেখি, আলোচনাও তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু তাই বলে তাঁকে ভুলে গেলে আমাদেরই অপরাধ হবে। বলা বাহুল্য, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন তাঁকে ভোলে নি, ভুলবেও না। এই সেদিনও বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম বা ডি-লিট্‌ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অবশ্য এলম্‌হার্স্ট নিজে বিশ্বভারতীকে এরও চাইতে বড়ো সম্মান দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের প্রতি অটুট আস্থা। তার প্রমাণ, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সংগীত, চারুকলা, নানাপ্রকার হস্তশিল্প এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিবাহের পর এলম্‌হার্স্ট-দম্পতি বসবাসের জন্য ইংলণ্ডের ডিভনশায়ার অঞ্চলে ডার্টিংটন হল নামে একটি সুরম্য সুপ্রাচীন অট্টালিকা এবং তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। চুয়ান্ন বৎসর পূর্বে ১৯২৬ সালে এখানেই তাঁর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৭৬-এর গোড়ায় ডার্টিংটন হল বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হল। এলম্‌হার্স্ট এবং ডরোথি কেউ আজ ইহজগতে নেই। শ্রীনিকেতন এবং ডার্টিংটন হল তাঁদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। কিন্তু, বহন করলেই হয় না। কীর্তিকে রক্ষা করতে পারলে তবেই স্মৃতিরক্ষা হয়।

এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁকে স্নেহ করেছেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করেছেন। শ্রীনিকেতনের কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে, তখন কবি উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন— জীবনে দুটি আকাঙ্ক্ষা ছিল— এক, প্রথম শ্রেণীর একটি চারুকলা বিভাগ, অপরটি একটি আদর্শ গ্রাম-সংগঠন বিভাগ। এতদিনে দুটি আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হল— সব চাইতে বড়ো কথা, দুটি বিভাগেই কর্ণধাররূপে দুটি প্রতিভাবান ব্যক্তিকে পেয়েছি [নন্দলাল এবং এলম্‌হার্স্ট]।

দেশবিদেশে ভ্রমণকালে স্নেহভাজন লেনার্ডকে সঙ্গে নিয়েছেন। চীন-ভ্রমণে এলম্‌হার্স্ট তাঁর সঙ্গী ছিলেন। আর্জেন্টিনায় কবি যখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর গৃহে অতিথি তখন এলম্‌হার্স্ট সঙ্গে ছিলেন তাঁর সেক্রেটারিরূপে।

জীবনের অন্তিমপর্বেও লেনার্ডের প্রতি স্নেহ ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'এলম্‌হার্স্ট এসেছে— লাগছে ভালো— এমন বন্ধু দুর্লভ। ওর সঙ্গে দেশবিদেশে অনেক দিনরাত্রি কাটিয়েছি— মনে পড়লে মন কেমন করে। nostalgiaর বাংলা কি? একসঙ্গে ভ্রমণে বন্ধুত্বের সেতারে যেন সুর বাঁধা হয়ে যায়।··· তা ছাড়া ওর কাছ থেকে আমরা যেরকম সাহায্য পেয়েছি, এমন আর কারো কাছ থেকে নয়।'

প্রতিটি কথার মধ্যে নস্টালজিয়ার অশ্রুবাষ্প যেন চিক্‌চিক্‌ করছে।

তেজেশচন্দ্র সেন

তেজেশচন্দ্র সেন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন অতি অল্প বয়সে। ইস্কুলের ছাত্র, পড়ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। ভালো ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করবেন, আত্মীয়স্বজনদের এই আশা; কিন্তু পরীক্ষার আগেই পালিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। অভিভাবকরা এসে সেবারের মতো ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গিয়ে পরীক্ষা দিলেন, পাসও করলেন প্রথম বিভাগে। কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হল কিন্তু কিছুদিন পরেই কলেজ ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। আর সেই যে এলেন জীবনের বাকি বাহান্ন বছর কাল শান্তিনিকেতনেই কাটিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছেন ইস্কুল-পালানো ছেলে। ভাবলে খুব অবাক লাগে যে সেই ইস্কুল-পালানো ছেলে নিজেই একদিন এক ইস্কুল খুলে বসলেন। নিশ্চয় মনে ছিল, এমন মজার ইস্কুল করে দেবেন যে ছেলেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে ইস্কুলে চলে আসবে। ঘরমুখো ছেলেরা ইস্কুলমুখো হবে। সত্যি সত্যি তাই হয়েছে, বিদ্যানিকেতন হয়েছে আনন্দনিকেতন। আর শান্তিনিকেতনকে যদি বলি ইস্কুল-পালানো ছেলের ইস্কুল তা হলে তেজেশবাবুকে বলব সে ইস্কুলের ঘর-পালানো মাস্টার।

সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে। অতিথি বালক, শান্তিনিকেতন তাকে ঘরের ছেলে করে নিলে। কিন্তু অতিশয় লাজুক স্বভাবের মানুষ, আপন মনে থাকেন, পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলেন না। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে অন্যদের বলতেন— ওকে দিয়ে কথা বলাতে পারলে? শান্তিনিকেতনে কাউকেই বিনা কাজে বসে থাকতে দেওয়া হয় না। ক'দিন পরে তেজেশচন্দ্রকেও ক্লাস-পড়ানোর কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। ছোটোদের বাংলা পড়াতেন, কখনো ইতিহাস ভূগোল। এই দিয়ে আরম্ভ কিন্তু পরে তাঁর প্রধান কাজ হয়েছিল প্রকৃতি পরিচয়ের ক্লাস নেওয়া। ছোটোদের নিয়ে আশ্রমের চার পাশে ঘুরে বেড়াতেন— গাছপালা ফুলফল চিনিয়ে দিতেন, পোকামাকড় পাখি সব-কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন— কোন্ পাখির কী নাম, কেমন দেখতে, কোন্ পাখির ডাক কী রকম, বাসা তৈরি করে

কোথায় কিভাবে— এ-সব তাদের দেখাতেন, বুঝিয়ে বলতেন; এ ক্লাসের প্রধান উদ্দেশ্য— চোখ মেলে দেখতে শেখানো আর সব বিষয়ে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাভাবনায় এ জিনিসটিকে মস্ত বড়ো স্থান দিয়েছেন। তাঁর এই প্রিয় কাজটি তেজেশবাবু বহু বৎসর ধরে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করে গিয়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতাও অর্জন করেছিলেন। নানা পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর দুটি-চারটি প্রবন্ধ আমি ছেলেবেলায় তখনকার দিনের মাসিক পত্রিকায় পড়েছি। এখানে এসে তাঁকে পড়তেই দেখেছি, লেখার কাজ করতে খুব একটা দেখি নি। ছেলেদের উপযোগী দুখানি ফরাসী বই তিনি অনুবাদ করেছিলেন; একখানি আঁরি এক্তর মালো -রচিত 'সাঁ ফামী'— 'কুড়ানো ছেলে' নামে প্রকাশিত; অন্যটি আলফঁাস দোদে -রচিত একটি কাহিনী— পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন— পারেন তো একটু মেরামত করে দেবেন। বলা বাহুল্য, মেরামতের তেমন প্রয়োজন হয় নি। 'হারানো ছেলে' নামে বইটি পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি 'চন্দ্রসূর্যের কাহিনী' নামে ছেলেমেয়েদের জন্যে আরো একখানি বই লিখেছিলেন।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কাজে তেজেশবাবু নিজে যেমন আনন্দ পেয়েছেন ছেলেমেয়েদেরও তেমনি আনন্দ দিয়েছেন। গুটিপোকা থেকে প্রজাপতির উদ্ভব শিশুচিত্তে যে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করত শিশুদের পিতা-মাতারাও তাতে ভাগ বসাতেন। প্রকৃতিরাজ্যের কত বিচিত্র রহস্য তেজেশবাবু শিশুদের চোখের সুমুখে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। আমাদের পাঠক্রমে তখনো প্রকৃতি পাঠের কথা কোথাও কেউ ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এটিকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জগদানন্দবাবু এবং তেজেশবাবুকে বলা চলে এ দেশে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষার পথিকৃৎ। শান্তি-নিকেতনের শিক্ষায় এ দুজনেরই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এঁদের এ কাজটির উপরে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই একটি স্নেহদৃষ্টি ছিল এবং নানা উপলক্ষে এঁদের কাজের যথেষ্ট তারিফও করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে অপর-একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের মুখেও আমরা তেজেশবাবুর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনেছি। ১৯৫৪ সালে মহাবিজ্ঞানী লর্ড হল্‌ডেন্ এসেছিলেন

-শান্তিনিকেতনে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন— এখানে যে জিনিসটি আমাকে সব চেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে সেটি হল পাঠভবনের অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তিনি জন-কুড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তারা শুঁয়োপোকা এবং প্রজাপতির chrysalis বা কোষাশ্রিত রূপ এবং তার বিভিন্ন অবস্থার ছবি নিজেদের হাতে এঁকে নিয়ে এসেছিল। দেখে বড়ো ভালো লাগল। প্রাণীজগতের অপার রহস্যে প্রবেশের এ-ই যথার্থ পথ। ইনি ছেলেমেয়েদের ঠিক পথটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু কীট পতঙ্গ পাখি নয়, গাছপালাও ভালোবাসতেন। বাগানের শখ ছিল, ছেলেদের নিয়ে ফুলের বাগান, সবজি বাগান করতেন। আশ্রমে তখন গাছপালা খুব বেশি ছিল না। আম্রকুঞ্জ শালবীথি এবং নিচু বাংলার খানিকটা ছাড়া চতুর্দিকটা ছিল তরুপল্লবহীন। সবুজের অভাবটা একটু পীড়াদায়ক মনে হত। চারি দিকে গাছ লাগিয়ে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করার দিকে অনেকেরই নজর এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই চাইতেন— ছাত্র-শিক্ষকরা নিজেরাই আশ্রমকে শুধু বাসযোগ্য নয়, দর্শনযোগ্য করে তুলবেন। এ ব্যাপারে তেজেশবাবু ছিলেন সব চাইতে উৎসাহী। এক সময়ে আশ্রমের বহু বৃক্ষের রোপণ লালন-পালন তাঁর হাতেই হয়েছে। 'অতিথি বালক তরুদলের' সেবা করেছেন পরম স্নেহে। রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসে তাঁকে 'তরুবিলাসী' আখ্যা দিয়েছিলেন।

এ অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন করলেন। এখন সারা দেশেই বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথমবারে যখন এখানে বৃক্ষরোপণ উৎসব হল তখন বৃক্ষ-শিশু রোপণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে তেজেশবাবুর বৃক্ষপ্রীতির কথা মনে রেখে উৎসব মণ্ডপে তেজেশবাবুকে জোড় দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। এখানে তেজেশবাবুকে কেউ কোনোদিন ধুতি-চাদর পরতে দেখেন নি। পাজামা এবং হাফ সার্ট ছিল তাঁর চিরাচরিত পোশাক। সেই একটি দিন ধুতি-চাদরে তাঁর প্রসন্ন মূর্তিটি আশ্রমবাসীদের চোখে বড়ো ভালো লেগেছিল।

গাছপালার প্রতি তাঁর প্রীতি কতখানি ছিল আমি নিজেই একদিন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম। বেড়াতে বেরিয়েছি, দূর থেকে দেখছিলাম তেজেশবাবু বেশ খানিকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছেন।

কাছে এসে দেখি ঠিক একভাবেই তাকিয়ে আছেন। বললাম— কী দেখছেন অত? আমার দিকে ফিরে একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন —দেখেছেন, ঠিক যেন কনেবউটি সেজে বসে আছে। তাই তো, দেখে আমিও অবাক। কচি কচি লালচে নতুন পাতা বেরিয়েছে, সোনালী রঙের যেন ঝালর ঝুলছে, অপূর্ব দেখতে হয়েছে। উনি যেমন তরু-বিলাসী, আমি আবার এ-সব বিষয়ে তেমনি উদাসী; উনি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে এ জিনিস কখনোই আমার চোখে পড়ত না। অন্ধে আর চক্ষুষ্মানে এই তফাত।

ছোটোদের নিয়ে ক্লাস, গাছপালার তত্ত্বাবধান, বাগানের তদারকি— এ-সব ছিল নিত্যকর্মপদ্ধতি। স্বল্পভাষী মানুষ, গল্পগুজবের আসরে খুব একটা দেখা যেত না। তবে চা-চক্রে হাজির থাকতেন নিত্য, কারণ চা-চক্রের তিনিই ছিলেন কর্মকর্তা। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু ছিলেন চক্রাধিপতি। তেজেশবাবুর উপর যে দিনান্তিকা চা-চক্রের ভার অর্পণ করা হয়েছিল সেটি খুবই সংগত হয়েছিল। দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তেজেশবাবুর খুব একটি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। দিনুবাবুর মজলিসী সভায় তিনি ছিলেন প্রধান সভাসদ, গানের আসরে শুধু শ্রোতা নন, গাইয়ে। গানের গলা ছিল, রবীন্দ্রনাথ এবং দিনু-বাবু দুজনের কাছেই গান শিখতেন। এক সময়ে তিনি নিয়মিত গানের ক্লাসও নিয়েছেন। বেহালা বাজাতেন, সেটা বেশির ভাগ ঘরে বসে আপন মনে। দিনুবাবু এবং তেজেশবাবুকে কখনো কখনো আশ্রমের পথে একসঙ্গে চলতে দেখা যেত। বিশালকায় দিনুবাবুর পাশে অতি ক্ষুদ্রকায় তেজেশবাবুকে দেখে স্বভাবতই কৌতুকের সঞ্চার হত, ঠাট্টা-তামাশাও চলত। তেজেশবাবু নিজেই সে কথার উল্লেখ করেছেন একটি প্রবন্ধে। দিনুবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু হিসাবে তেজেশবাবু দিনেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করে অতি সুন্দর ঐ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

আমরা এসে দিনুবাবুকে দেখি নি। আমাদের সময়ে তেজেশবাবুকে দেখেছি সন্ধ্যার দিকে নন্দলালবাবুর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রত। চা-চক্রের মজলিস শেষ হলে সভ্যরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে নানান দিকে বেড়াতে চলে যেতেন। চক্রের সভাপতি এবং সম্পাদক এসে বসতেন তেজুবাবুর বারান্দায়। পাশাপাশি দুটি ইজিচেয়ারে বসে মৃদুকণ্ঠে দুজনের কথাবার্তা হত। দুজনেই স্বল্পভাষী, আলাপ-আলোচনা কী বিষয়ে হত জানি না। অবশ্য অবসর

সময়ের বেশির ভাগ কাটত পড়াশোনায়। খুব পড়ুয়া মানুষ ছিলেন। কত রকমের বই যে পড়তেন! তবে বিজ্ঞান-বিষয়ক ম্যাগাজিন ইত্যাদির দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর ঐ পড়ার নেশার কথা রবীন্দ্রনাথেরও জানা ছিল। শেষ দিকে যখন তাঁর পীড়া খুব বৃদ্ধি পেয়েছে তখন অধ্যাপক কর্মীরা প্রতি রাত্রেই শুশ্রূষাদির জন্য পালা করে রাত জাগতেন। রাত্তিরে কে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন তাঁর খোঁজ নিতেন। তেজেশবাবুর পালা এলে বলতেন, তেজেশ পড়তে ভালোবাসেন; ওঁর জন্যে কিছু বই ম্যাগাজিন এনে রেখো নইলে সারা রাত কাটাবেন কি করে? নিজের বাড়িতেও সারাক্ষণই বই নিয়ে থাকতেন। বই পড়ায় ক্লান্তি এলে বাজনা নিয়ে বসতেন।

তেজেশবাবু বিয়ে করেন নি, সংসারী হন নি। কিন্তু এখানকার আশ্রম-সংসারটিতে তিনি ছিলেন সর্বজনের প্রিয়। প্রবীণেরা ডাকতেন তেজুবাবু বলে, নবীনেরা তেজেশদা, ছোটোরা বলত তেজিশদা। সকলের ডাকেই সাড়া দিতেন কিন্তু দেখলে মনে হত ধরা দেন নি কারো কাছেই। গাছ-পালার বন্ধু, গাছপালার সঙ্গে স্বভাবেরও একটু মিল ছিল। গাছের যেমন মুখে কথা নেই কিন্তু ফুলে ফলে শাখার আন্দোলনে আনন্দের প্রকাশ তেজেশবাবুরও ছিল তেমনি। আনন্দের ইঙ্গিত পাওয়া যেত ভাবে-ভঙ্গিতে অর্থাৎ আভাসে যতখানি ভাষায় ততখানি নয়।

মন্দিরের কাছে পথের ধারটিতে মনের মতো করে একটি কুটির বেঁধে-ছিলেন। এ কুটিরটি শান্তিনিকেতনের একটি দর্শনীয় বস্তু। একটি তাল-গাছের চরণ বেষ্টন করে গোলাকৃতি এই ঘরটি রচিত। রচনাই বলা উচিত। শিল্পীমন না হলে এমনটি করা সম্ভব হত না। গাছের গুঁড়িটি আছে ঘরের মাঝখানে, মাথাটি খড়ের চাল ভেদ করে উঁকি মারছে আকাশে। ভাবতে ভালো লাগে যে বৃক্ষ এবং বৃক্ষপ্রেমিক একই গৃহের অধিবাসী ছিলেন। শাস্ত্রীমশায় বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন তালধ্বজ, তেজেশবাবুকে বলতেন: রাজা তালধ্বজ। এমন ঘর দেখলেই লোভ হয়। তেজেশবাবুকে মনে মনে ঈর্ষা করেন নি, এমন মানুষ শান্তিনিকেতনে কমই ছিলেন। সকলেই ভাবতেন, আহা, এমন একটি ঘর পেলে হত। 'মৌচাকের মতো, নিভৃত-বাসের মধু দিয়ে ভরা।' বনবাণী কাব্যে তেজেশবাবুকে উদ্দেশ করে রচিত 'কুটিরবাসী' নামে যে কবিতাটি আছে, তারই সূচনায় কবি ঐ উক্তিটি

করেছেন। লোভনীয় তো বটেই কিন্তু সেইসঙ্গে বলেছেন, 'বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।' খুব খাঁটি কথা, আমাদের সেই যোগ্যতা ছিল না। 'তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি' কিন্তু 'হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে, অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।' তবে অনেকেই দেখেছেন, মন্দিরে উপাসনার আগে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এসে তালধ্বজের বারান্দাটিতে চুপ করে খানিকক্ষণ বসতেন। এ কবিতা বোধ করি সেই সময়ে লেখা।

তালধ্বজের ইতিহাসে একটি হাস্যমিশ্রিত ইণ্টারলিউড্ আছে। কর্ম-জীবনের শেষ দিকে, যখন নিজের দেহ দুর্বল এবং তালধ্বজেরও জীর্ণ দশা তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁর কুটির ছেড়ে বিশ্বভারতীর একটি বাড়িতে উঠে যান। বলেছিলেন— আমি আর এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছি না। সকলেই খুব দুঃখিত হলেন। তেজেশবাবুকে ছাড়া তালধ্বজের কথা ভাবাই যেত না। তালধ্বজ কি শেষে বেতালের অর্থাৎ মৃতদেহাশ্রিত প্রেতের আস্তানা হবে? অবিলম্বে দুর্ভাবনা দূর হল। ক'টি দিন মাত্র, বোধ করি দু সপ্তাহের বেশি হবে না। একদিন দেখা গেল একটি গোরুর গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে তেজেশবাবু আবার তালধ্বজে ফিরে এসেছেন। সকলে বললেন —কেমন, শিক্ষা হল তো? তেজেশবাবু করুণ মুখে বললেন—কি করব, কিছুতেই মন টিকল না। ঐ নিয়ে ক'দিন বন্ধুমহলে খুব হাসি-রগড় হল। কিন্তু মনে মনে সবাই খুশি— ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এসেছেন। সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজা তালধ্বজ তালধ্বজেই রাজমহিমায় বাস করে গিয়েছেন।

সুখের বিষয় রাজা অন্তর্ধান করলেও তালধ্বজের মহিমা অন্তর্হিত হয় নি। তেজেশবাবুর কুটিরে ইদানীং কারুসংঘ নামে কুটিরশিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতনের নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকারা সেখানে নিজের হাতে নয়ন-লোভন রুচি-রোচন অতি সুন্দর পরিচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জার নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করে থাকেন। ইতিমধ্যেই কারুসংঘের সুনাম দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছে। সংঘমিত্রাদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা যদি সকলে হাত মিলিয়ে তালধ্বজের প্রাঙ্গণে কয়েকটি ফুলের গাছ রোপণ করেন এবং নিজ

হাতে তাদের যত্ন নেন তা হলে বাগানবিলাসী কুটিরবাসীকে নিত্য স্মরণ করা হবে এবং তাঁদের নিজেদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। শেষ দিনের কথাটি আজও মনে আছে। তেজেশবাবুর দেহটি বারান্দায় রেখে আমরা বসেছিলাম তাল-ধ্বজের প্রাঙ্গণে। 'কুটিরবাসী' কবিতার সেই লাইন ক'টি ঘুরে ঘুরেই আমার মনে আসছিল—

এ কথা কারো মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

তেজেশবাবু যেমন ছিলেন এক পড়ুয়া মানুষ তেমনি আর-একজন ছিলেন গোঁসাইজি। তেজেশবাবুর পড়াশোনা ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা ধরনের, গোঁসাইজি ছিলেন তত্ত্বান্বেষী মানুষ। অধ্যয়ন, অনুশীলন ছিল শাস্ত্রাদি গ্রন্থে, তা হলেও কাব্যে সাহিত্যে অরুচি তো ছিলই না বরং রীতিমত রসগ্রাহী পাঠক ছিলেন। বলে দেওয়া ভালো যে পড়ুয়া মানুষ বলতে আমি পড়ুয়া পণ্ডিতদের কথা বলছি না। শেষোক্তরা পড়েন, পণ্ডিতও হন। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য শেষ পর্যন্ত জীবনের কাজে খুব একটা লাগে না। বইয়ের জগৎ মানুষকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; ফলে জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এঁরা নিজেদের ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। দৃষ্টি থাকে বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ, গাছের পাতার দিকে চোখ তুলে তাকান না, পাখির ডাক কানে যায় না, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে লাগে না। এ জাতীয় মন কখনো তাজা থাকে না, সতেজ হয় না, সরস হয় না। সুখের বিষয় গোঁসাইজি পড়ুয়া ছিলেন এবং পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু পড়ুয়া-পণ্ডিত ছিলেন না।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ছাত্র শিক্ষক আশ্রমবাসী সকলের কাছে গোঁসাইজি নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর, বৈষ্ণব সমাজে বিরাট প্রতিপত্তি। গোঁসাইজি অবশ্য বংশগৌরবের ধার ধারতেন না। ধর্ম নিয়েও খুব একটা মাথা ঘামাতেন বলে মনে হত না, যদিচ শাস্ত্রগ্রন্থাদি সম্পর্কে আগ্রহ ছিল সুপ্রচুর এবং জ্ঞান ছিল সুগভীর। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য তেমনি শক্তি-সাধনা সম্পর্কেও আগ্রহ এবং কৌতূহলের অন্ত ছিল না। শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম দিকে চর্চা করেছেন বৌদ্ধশাস্ত্রের। বাইবেল সম্পর্কেও তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি। দেখেশুনে মনে হত ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহটা ছিল অ্যাকাডেমিক। অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা যতখানি বিশ্বাস ততখানি ছিল না। ধর্মীয় মতামত ছিল অত্যন্ত উদার; সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত এবং এ-সব নিয়ে আলোচনা করতেও ভালোবাসতেন কিন্তু বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি নিজস্ব কোনো আকর্ষণ ছিল কিনা তা বোঝা যেত না।

শৈশব কেটেছে বৃন্দাবনে। সেখানেই বিদ্যারম্ভ। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে আসেন কাশীতে, সেখানে কুইন্স্ কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। অধ্যক্ষ ভেনিস্ সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কাশী থেকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া ন্যায় স্মৃতি এবং বৌদ্ধ ত্রিপিটকের সূত্র অংশ পাঠ করেন। পালি প্রাকৃতের চর্চাও সেখানেই করেছিলেন।

জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য। শান্তিনিকেতনে তখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। সেখানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে শুনে স্বভাবতই আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। সামান্য একটি গবেষণাবৃত্তি নিয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২০ সালে। বিধুশেখর শাস্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করেন। সিংহলের ধর্মাধিকার মহাস্থবির তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর কাছে অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী এবং মহাস্থবিরের সহায়তায় চলে যান সিংহলে। সেখানকার বৌদ্ধ শাস্ত্রীদের সাহায্যে নিজ জ্ঞানভাণ্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিলেন। সিংহল থেকে সোজা দেশে না ফিরে কিছুদিনের জন্যে যান ব্রহ্মদেশে। বিভিন্ন দেশে একই ধর্মের কী রূপভেদ ঘটেছে তা লক্ষ্য করাই বোধ করি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা ধর্মীয় আলোচনায় কয়েক মাস কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

এবারে স্থায়িভাবে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করা হল। পাঠভবনে বাংলা এবং সংস্কৃত পড়াবার ভার পড়ল। পরে কখনো কখনো কলেজ বিভাগে সংস্কৃতের কিছু ক্লাস নিতেন। কিন্তু স্কুলের অধ্যাপনাতেই আনন্দ ছিল বেশি। অধ্যাপক হিসাবে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে 'সপ্তপর্ণী' নামে একখানা সহজপাঠ্য সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন ; তার কিছুটা সংকলন, কিছুটা নিজ রচনা। এ ছাড়া 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংগ্রহের শখ ছিল। ছোটোদের ক্লাসে সে-সব ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতেন ; ছেলে-মেয়েরা খুব আমোদ পেত। ছড়ার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটোদের নিয়েই থাকতেন সেজন্যে বড়োদের জন্যে লেখার কথা তেমন করে কোনোদিনই ভাবেন নি। বোধ করি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই সাধারণের উপযোগী করে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় বাংলা সাহিত্যের একখান

ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পাণ্ডিত্যের অনুপাতে লিখেছেন অতি সামান্য। অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই সময় কাটিয়েছেন। মৌখিক আলোচনায় যতখানি উৎসাহ ছিল, লেখনী চালনায় ততখানি নয়। ছোটোদের ভালোবাসতেন, তাদের জন্যেও কিছু লিখতে পারতেন কিন্তু তাও করেন নি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' নামক অতি সুখপাঠ্য বইখানা গোঁসাইজির অনুরোধে লেখা। সহজেই অনুমান করা যায় যে কবির কাছে গোঁসাইজি এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে ছেলেমেয়েদের জন্যে কবিতা যদিবা কিছু লিখেছেন গদ্যে তাদের জন্যে বিশেষ কিছু তিনি লেখেন নি। সেজন্যেই ছোটোদের তরফ থেকে তিনি ঐ দাবিটি করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেটি মেনেও নিয়েছিলেন। এদিক থেকে গোঁসাইজি নিজে ছোটো বড়ো কারো দাবিই পূরণ করেন নি। জীবনের অন্তিমপর্বে যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল-কক্ষে দিন কাটিয়েছেন তখন একটি খাতায় বিক্ষিপ্তভাবে নানা বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। চমকপ্রদ সব কথা। মনটি যে কী পরিমাণ সংস্কারমুক্ত ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। ভাষাটি তীক্ষ্ণ, কৌতুকে ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল। একটু নমুনা দিচ্ছি— 'পৃথিবীতে যত-রকম গল্প আছে তার মধ্যে রাজা হল ভূতের গল্প। তার দুই রানী। একটি হল গোয়েন্দাকাহিনী আর-একটি হল ডাকাতের কাহিনী। লোককে গল্প শুনিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারেন যদি ঠিক বলার মতো করে এই কাহিনীত্রয় বলতে পারেন। মধ্যে মধ্যে গল্পগুলির মধ্যে একটু নিজেকে ঢুকিয়ে দেবেন, তাতে গল্পের স্বাদ ও বিশ্বাস বাড়বে। ভূতের গল্প, গোয়েন্দার গল্প, ডাকাতের গল্প এক পাতে ঢেলে পাঞ্চ করলে হয় পৌরাণিক কাহিনী। তাতে একটু মুনিঋষির সম্বরা দিতে হয়।' ভূতের গল্পের 'দুই রানী' না বলে দুই মাসতুত ভাই বললে বোধ করি ভালো হত। দুঃখের কথা যে বেশি লিখে যেতে পারেন নি। আরো আগে যদি এই খেয়ালটি হত তা হলে অনেক মূল্যবান জিনিস পাওয়া যেত। তাও যেটুকু রেখে গিয়েছেন তাই প্রকাশযোগ্য। অনেক জানবার শিখবার ভাববার কথা আছে।

এরূপ জিজ্ঞাসু মন সচরাচর দেখা যায় না। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকে লেভি, তুচ্চি, উইন্‌টারনিজ্‌ প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা যখন এখানে এসে জড়ো হলেন তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা সকলেই

ছাত্র হিসাবে তাঁদের ক্লাসে যোগদান করতেন। গোঁসাইজি এবং হরিদাস মিত্র ছিলেন এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহী। জানবার শিখবার স্পৃহা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নিজে যেমন সর্বক্ষণ বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকতেন তেমনি আবার অপরকেও বিদ্যাচর্চায় প্রেরণা জোগাতেন। অধ্যয়ন অনুশীলন ছিল বহু বিষয়ে। সেজন্যে অন্যান্য অধ্যাপকরা নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণার কাজে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হতেন, নানা তথ্যের উদ্‌ঘাটন এবং নানা তত্ত্বের বিশ্লেষণ সম্ভব হত। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাঁর কাছে নানাভাবে ঋণী। আমি যদিচ গবেষণার ধার ধারি না, তা হলেও হাস্যে কৌতুকে কত সময় কত বিষয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তার কিছু কিছু কৌতুক-কণা আমার কোনো কোনো লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এই সূত্রে শান্তিনিকেতন জীবনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিকেলের দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দলে দলে ঘুরে বেড়ানো এখানকার অনেকেরই অভ্যাস ছিল। পদচারণার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা একসঙ্গেই চলত। সেই গোড়ার দিকে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ আলোচনার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। কাঁকরের পথে চলতে চলতে কত দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা করে দিয়েছেন উপাধ্যায়মশায়। মোহিত সেনের সঙ্গেও ঐরূপ আলোচনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। শালবীথির পথে পদচারণা করে কত সন্ধ্যা কেটেছে সতীশ রায়ের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায়। এই অভ্যাসটি বহুকাল ধরে এখানকার বিদ্যানুরাগীদের অশেষ কল্যাণ করেছে। এক সময়ে ক্ষিতিমোহনবাবু প্রতিদিন দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করতেন; তাঁর বৈকালিক ভ্রমণে নিত্যসঙ্গী থাকতেন কয়েকজন অধ্যাপক ও কর্মী। নানা বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হত। সেই ট্র্যাডিশনটি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন গোঁসাইজি। সুরসিক মানুষ, চা-চক্রের আসর গল্পে জমিয়ে রাখতেন। চা-পর্ব শেষ হওয়া মাত্র শুরু হত ভ্রমণ-পর্ব। হরিদাস মিত্র সমেত আরো পাঁচ-ছ জন গোঁসাইজির নিত্যসঙ্গী ছিলেন। হরিদাসবাবুও পণ্ডিত ব্যক্তি। এঁদের সঙ্গ যে কতখানি উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ ছিল সে কথা তাঁদের গুণমুগ্ধ ভক্তদের কাছে প্রায় শুনতাম। ক্ষিতিমোহনবাবুর ন্যায় গোঁসাইজিরও পাণ্ডিত্য ছিল অতিশয় সরস। পরিবেশনের গুণ না থাকলে কেবল বিদ্যার দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় না।

শান্তিনিকেতনে এসে অবধি লক্ষ্য করেছিলাম যে শান্তিনিকেতন জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এখানকার জমাট আড্ডা। আড্ডার আবহাওয়াটি তৈরি করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। শান্তিনিকেতনে যখন থাকতেন তখন আড্ডা বসত তাঁকে ঘিরেই। প্রতি সন্ধ্যায় জমায়েত হতেন শাস্ত্রীমশায়, ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দলালবাবু, গোঁসাইজি, প্রমদারঞ্জন ঘোষ এবং অধ্যাপক কর্মীদের মধ্যে আরো অনেকে। কত বিষয়ের যে আলোচনা হত, হাসি-গল্পও হত। সে আড্ডা যে কতখানি উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর সেই আড্ডা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে একান্ন পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। গোঁসাইজি ছিলেন তারই একটির যাকে বলা যায় মোহান্ত যদিচ আমরা জানি ঐ মোহান্ত কথাটি শুনলে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানাতেন। আসল কথা তিনি ছিলেন ঐ আড্ডার গোষ্ঠীপতি। কৌতুক করে বলতেন— আড্ডা ছাড়া অধ্যাপক হয় না। অধ্যাপক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— আড্ডাপক্ব।

জীবনের শেষ দশ-বারো বছর তিনি আর চলাফেরা করতে পারেন নি একেবারেই শয্যাশায়ী ছিলেন। পিয়ারসন হাসপাতালের একটি কক্ষে তাঁকে রাখা হয়েছিল। যখনই গিয়েছি দেখেছি উঁচুকরা বালিশে ঠেসান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় বই হাতে পড়ছেন। বিছানার পাশে একগাদা বই সাজানো থাকত। লাইব্রেরি থেকে সর্বদা বইয়ের জোগান দেওয়া হত। আর সন্ধ্যার দিকে তাঁর ভক্ত ভ্রমণ-সঙ্গীরা প্রতিদিনই হাসপাতালের সেই কক্ষে এসে হাজির হতেন এবং পূর্ববৎ নানা বিষয়ের আলোচনা হত। গোঁসাইজির মৃত্যুর ক'দিন পরে হরিদাস মিত্র মশায়ের সঙ্গে পথে দেখা। হাসপাতালের দিক থেকে ফিরছেন। ঈষৎ হেসে বললেন— গোঁসাইজি যে নেই সেটা এখনো মনে ঠিক রপ্ত হয় নি। ভুলে ওঁর ঘরের দিকে চলে গিয়েছিলাম।

গোঁসাইজি চলে যাবার পর থেকে শান্তিনিকেতনে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সদলে পথ-পরিক্রমা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মস্ত বড়ো একটা জিনিস চলে গিয়েছে বলতে হবে। শান্তিনিকেতনের পথ ঘাট মাঠ শান্তিনিকেতনকে অনেক কিছু দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন— আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ— শান্তিনিকেতন তেমনি বলেছে— আমার এই পথ-চলাতেই আনন্দ। শান্তি-নিকেতনের পথে পথে আমরা এসেও কিছু কম পাই নি। অনেক হাসি,

অনেক গল্প, অনেক গানের সঙ্গে— কিছু বোধ-বুদ্ধি— কিছু জ্ঞানগম্যিও জুটেছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব।

গোঁসাইজি জীবনে শোক তাপ পেয়েছেন অথচ দেখলেই মনে হত যেন এক আনন্দময় পুরুষ। একমাত্র পুত্রসন্তানটিকে হারিয়েছেন অকালে। দুটি শিশুকন্যা রেখে পত্নীও চলে গিয়েছেন বহুকাল আগে। কন্যা দুটি প্রতিপালিত হয়েছে প্রতিবেশী গৃহে। থাকতেন যেন এক গৃহী-সন্ন্যাসী। মনের মধ্যে প্রজ্ঞালব্ধ কিছু আনন্দের সঞ্চয় ছিল বলেই মন তাঁর অবসাদগ্রস্ত হয় নি। অবসাদের প্রশ্নই ওঠে না। আশ্রমের সকল উৎসবে ব্যসনে তিনি সানন্দে যোগ দিতেন। সংগীতরসজ্ঞ ছিলেন, বাজনায় হাত ছিল। অতিশয় কুশলী অভিনেতাও ছিলেন। যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাতেই অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছেলেরা যাত্রায় পালা জমাত, তিনি তাতেও পরম উৎসাহে যোগ দিতেন। প্রমথ বিশীর লেখা 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' এবং 'ঘোষ যাত্রা' পালায় তিনি যে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন পুরোনোরা এখনো সে কথা বলেন।

তাঁকে বলেছি গৃহী-সন্ন্যাসী। পোশাকটিও ছিল সন্ন্যাসীসুলভ। একটি রঙিন লুঙ্গি, গায়ে একটি আলখাল্লা ধরনের লম্বা জামা। সেটিও রঙিন, কখনো তাতে একাধিক রঙ থাকত— Pied Piper-এর পোশাকের মতো। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি অনিল চন্দ গোঁসাইজিকে বলতেন— Santiniketan's most colourful personality। ঠিক কথাই বলেছেন, তবে সেটা শুধু তাঁর বর্ণ-বহুল পোশাকের জন্যে নয়। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের গুণেই তাঁকে সকলের চোখে 'কালারফুল' মনে হত।

প্রমদারঞ্জন ঘোষ

শান্তিনিকেতনের জীবনে প্রথমাবধিই খুব একটি ঘরোয়া ভাব ছিল। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র এবং অধ্যাপক নিয়ে যখন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল তখন থেকেই এটিকে একটি আশ্রম-পরিবার হিসাবে দেখা হয়েছে। ছাত্র শিক্ষক একই ঘরে থেকেছেন, একই রান্নাঘরে খেয়েছেন। একসঙ্গে হেসেছেন, গেয়েছেন, বেড়িয়েছেন, খেলাধুলা করেছেন। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটিকে যথা-সম্ভব সহজ করে নেবার জন্যে ডাকা-খোঁজার ব্যাপারেও সেই ঘরোয়া ভাবটি রক্ষা করা হয়েছিল। ছেলেরা মাস্টারমশায়দের দেখেছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে, ডেকেছে 'দাদা' বলে। ইংরেজি মতে 'স্যার' সম্বোধনটার মধ্যে যে একটা ভদ্রতাসূচক ব্যবধানের ভাব আছে তাকে এখানে কোনোকালেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া দাদা সম্বোধনটি শুধু ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরাও জ্যেষ্ঠদের দাদা বলেই ডাকতেন। এরই মধ্যে আবার বয়সে যাঁরা একটু প্রবীণ কিংবা গুণে গরীয়ান তাঁদের দাদা সম্বোধন না করে বলা হত 'মশায়'। পণ্ডিত বিধুশেখর বয়সে প্রবীণ না হয়েও বোধ করি পাণ্ডিত্যের বলেই শাস্ত্রীমশায় নামে পরিচিত ছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু কী কারণে জানি না কাশীতে থাকতে বন্ধুমহলে ঠাকুরদা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি যদিচ যৌবনকালেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তথাপি আসামাত্রই সেই ঠাকুরদা নামটি এখানেও চালু হয়ে গেল। সেই সুবাদে ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে অতি অল্প বয়সে ঠান্‌দি সাজতে হয়েছিল। সুখের বিষয় এখন তিনি সত্যিকারের ঠান্‌দি হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। শান্তিনিকেতনবাসী ছোটো বড়ো সকলেই তাঁর স্নেহধন্য। দু-চার জন প্রবীণ অধ্যাপক কর্মী নন্দলাল বসুকে নন্দবাবু বলে ডাকতেন। এ ছাড়া ছাত্র শিক্ষক আশ্রমবাসী সকলের কাছেই তিনি ছিলেন মাস্টারমশায়। এখন আর বয়সকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। বয়সের দরুন এখন আর দাদাদের পদোন্নতি হয় না— কেউ ঠাকুরদাও হন না, দাদামশায়ও হন না, দাদাই থেকে যান।

প্রমদারঞ্জন ঘোষও অন্যান্যদের ন্যায় যৌবনকালেই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু আমি যখন এসেছি তখন অধ্যাপকদের মধ্যে তিনিই প্রবীণতম এবং শুধু

ছাত্রছাত্রী নয় আশ্রমবাসী সকলের কাছেই তিনি মশায়জি নামে পরিচিত। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মশায় সম্বোধনটি এখানে লোপ পেয়েছে বলতে হবে। বোধ হয় ঠিকই হয়েছে। কারণ মশায়জির ন্যায় এমন মহদাশয় মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এখন সে মানুষও আর নেই, সে সম্বোধনও আর কাউকে মানাবে না।

প্রমদারঞ্জনবাবু বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন সে যুগের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মহর্ষি-ভক্তদের অন্যতম। মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান-পাঠ ছিল তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতি। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ার দরুন নিজে পড়তে পারতেন না, অপর কেউ পড়ে শোনাতেন। প্রমদাবাবু তখন স্কুলের ছাত্র, তিনিও মাঝে মাঝে মাতামহকে ঐ ব্যাখ্যান পড়ে শুনিয়েছেন। মাতামহ এবং তাঁর বন্ধুবর্গের মুখে তিনি প্রায়ই মহর্ষি, জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবার এবং উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কৌতূহল সেই তখন থেকে। পরে যখন কলকাতার কলেজে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করছেন তখন ছোটো ছোটো খণ্ডে প্রকাশিত শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ তাঁর হাতে আসে। ঐ-সব ভাষণ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মনে পড়ছে আমিও ছেলেবেলায় শান্তিনিকেতন ভাষণের সেই প্রথম সংস্করণের ছোটো ছোটো খণ্ড ক'খানা আমার পিতার পুস্তক সংগ্রহে দেখেছি।

ছাত্রজীবনে নানা সভাসমিতিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে কিন্তু পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তখন মাঝে মাঝেই কলকাতার নানা সভাগৃহে প্রবন্ধাদি পাঠ করে শোনাতেন। প্রমদাবাবু তার প্রত্যেকটিতেই উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ এভাবেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি গভর্নমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যখন শিক্ষকতা করছেন তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তাঁর কাছে বসে শান্তিনিকেতনের গল্প শুনতেন; এমনি করেই মনটি তাঁর শান্তিনিকেতনের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এ সময়টিতে খবর এল রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সমস্ত দেশ উল্লসিত, প্রমদারঞ্জন রোমাঞ্চিত। আবেগপ্রবণ মানুষ, সরকারী কাজে আর তিনি মন বসাতে

পারছিলেন না। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনের একটি কাজ পেলে তিনি বর্তে যান। শান্তিনিকেতনের বন্ধুটিকে ধরে বসলেন একটা উপায় করে দিতে। বন্ধুটি প্রমদারঞ্জনের মনোবাসনা গুরুদেবকে লিখে জানালেন। রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠালেন— তোমার বন্ধুকে বলো কিছুদিন এখানে এসে থাকতে। দেখেশুনে যদি তাঁর ভালো লাগে তা হলে তাঁকে রাখবার ব্যবস্থা করা যাবে। প্রমদারঞ্জনকে আর রোখে কে? এই বার্তা পেয়ে তিনি আর কালবিলম্ব না করে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। গেস্ট হাউসে থাকেন, ঘুরে-ফিরে সব দেখেন। গাছতলায় ছেলেদের ক্লাস; তাদের বৈতালিক, তাদের খেলাধুলা— যা দেখেন, শোনেন তাতেই চমৎকৃত। ঠিক ঐ সময়েই একটা নাটকের অভিনয়ও হল। বলেছেন— এমনটি তিনি আগে কখনো দেখেন নি। ক্ষিতিমোহনবাবু, কালীমোহনবাবু প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল; সকলের সৌজন্যে সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ। সরকারী কাজে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনেই থেকে গেলেন। এটা ১৯১৪ সালের কথা।

যথাসময়ে প্রমদাবাবুকে বিদ্যালয়ের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন কাজেই যোগ্যতা প্রকাশে বিলম্ব হয় নি। স্কুল বিভাগে ইংরেজি এবং ইতিহাসের ক্লাস নিতেন। পরে যখন কলেজ বিভাগ স্থাপিত হল তখন স্কুলের কাজের সঙ্গে কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন। নিষ্ঠাবান কর্মী হলে যা হয় নানা সময়ে নানা কাজের ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। কখনো স্কুল বিভাগের অধ্যক্ষ, কখনো কলেজ বিভাগের। শান্তিনিকেতন-সচিব হিসাবেও কখনো কখনো কাজ করেছেন এবং যোগ্যতার সঙ্গেই করেছেন। আমি এসে তাঁকে পাঠভবনের কাজেই লিপ্ত দেখেছি; সে কাজে তিনি যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন সেজন্যেই তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ক্লাসের পড়ায় বিশেষ করে ইংরেজিতে যে-সব ছেলে ছিল অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, শুনেছি তাদের প্রতি প্রমদাবাবুর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। আলাদা করে নিয়ে খেটে খুটে তাদের ঘাটতি পূরণ করবার চেষ্টা করতেন। ছাত্রকল্যাণকামী শিক্ষক হিসাবে প্রাক্তনদের মুখে এখনো তাঁর সুখ্যাতি শোনা যায়।

শান্তিনিকেতনকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা নিষ্ঠার বলেই পেয়েছেন। প্রমদারঞ্জন সেই পরম নিষ্ঠাবানদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, শান্তিনিকেতন শিক্ষাদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি

অপরিসীম স্নেহ— সব মিলিয়ে যে স্বল্পসংখ্যককে আমরা খাঁটি শান্তিনিকেতন-প্রেমিক বলে জানি তাঁদের মধ্যে প্রমদারঞ্জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন-প্রেমিক হিসাবেই শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তাঁর একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকবে।

প্রমদাবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন ছিল সুবিস্তৃত। এক সময়ে বিদ্যাচর্চার পক্ষে শান্তিনিকেতন ছিল আদর্শ স্থান। গাড়ি ঘোড়া, হৈচৈ, সিনেমা থিয়েটার, রাজনৈতিক উত্তেজনা ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকারী ব্যাপার ছিল না বলে শান্ত পরিবেশে লেখাপড়ার প্রচুর অবকাশ পাওয়া যেত। আমিও এসে দেখেছি অধিকাংশ অধ্যাপকের মধ্যে অধ্যয়নস্পৃহা ছিল মজ্জাগত। এরও চাইতে বড়ো কথা, নানা বিষয়ের আলোচনায় স্থানটি ছিল মুখর। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, গোঁসাইজি, হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, হরিদাস মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্বদাই নানা-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। তাতেই একটি বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া সৃষ্টি হত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই আবহাওয়াটি অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীরা নিশ্বাস গ্রহণের ন্যায় অতি সহজে ঐ পরিবেশ থেকে অনেকখানি জ্ঞানগম্যি সংগ্রহ করতে পারে। সর্বোপরি প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে একটি সান্ধ্য আসর বসত। সেখানে যে-সব আলোচনা হত তাতেই বিশ্ববিদ্যার পরিবেশটি পূর্ণতা লাভ করত। অপর দিকে ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথও কখনো কখনো তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধাদি পাঠ করে শোনাতেন। সবরকমের আসরেই প্রমদাবাবু ছিলেন অত্যুৎসাহী শ্রোতা। ক্ষিতিমোহনবাবু বা গোঁসাইজির ন্যায় তিনি বাক্‌পটু ছিলেন না। আলোচনায় বড়ো একটা যোগ দিতেন না ; তিনি ছিলেন নিবিষ্ট শ্রোতা। তাঁর বিদ্যাচর্চা প্রধানত একান্তে অধ্যয়নেই আবদ্ধ ছিল।

অধ্যয়নে এত বেশি নিমগ্ন ছিলেন যে লেখার কথা তেমন করে আগে ভাবেন নি। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পরে দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। মনে হয় শেষ দিকে লেখার দিকে একটু নজর এসেছিল। খান তিন-চার বই লিখে গিয়েছেন ; তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনায় তা যৎকিঞ্চিৎ বলতে হবে। 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' অতিশয় সুলিখিত গ্রন্থ। দিব্যি ঝরঝরে ভাষায় আপন ভাবনা-চিন্তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল। দুঃখের বিষয় সে ক্ষমতার যথোপযুক্ত ব্যবহার তিনি করেন নি।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও একখানা বই লিখেছেন। 'বর্তমান জগৎ' নামে ছাত্রপাঠ্য একখানা বইও লিখেছিলেন। শেষ দিকে 'অরবিন্দের জীবন ও দর্শন' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তা হলেও বলব তাঁর কাছ থেকে যতখানি আমাদের প্রাপ্য ছিল ততখানি তিনি আমাদের দিয়ে যান নি। তবে তিনি যে আমাদের মধ্যে ছিলেন তাতেই তিনি অনেকখানি দিয়েছেন। এরূপ মানুষ যেখানে থাকেন সেখানকার সমাজজীবন আপনিই উন্নত এবং শ্রীমন্ত হয়।

দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। নব্বুই বৎসর বয়সে এই সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের সহযোগীরা একে একে সকলেই চলে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের একমাত্র প্রতিভূ ছিলেন মশায়জি। তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে একযুগের অবসান হল। নির্মল চরিত্র, সরল প্রাণ, উদার হৃদয় মানুষটিকে হারিয়ে শান্তিনিকেতন জীবনের দৈন্যদশা কতখানি বেড়েছে— যাঁরা একদা তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরাই তা বুঝবেন।

গুরদিয়াল মালিক

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যন্ত সীমায়, বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত, ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে জন্ম। গুরদিয়াল মালিক বুক ফুলিয়ে বলতেন— আমি পাঠান। অবশ্য পাঠানদের মতো লম্বা চওড়া বিশালকায় মানুষ ছিলেন না। বেঁটেখাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ সুদর্শন কান্তি। চোখে মুখে হাসি লেগেই আছে, দেখলেই মন প্রসন্ন হয়। বাঙালির হাতে পড়ে পাঠান সর্দারের অন্যবিধ রূপান্তরও ঘটেছিল— গুরদিয়াল মালিক হলেন গুরুদয়াল মল্লিক। সবাই ডাকত মল্লিকজি বলে। আমি এসে যখন তাঁকে দেখেছি তখন তাঁর বয়স বোধ করি পঞ্চাশে পৌঁছয় নি। চমৎকার স্বাস্থ্য কিন্তু তখনই গোঁফ দাড়ি চুল আদ্ধেক পাকা। পরনে ধবধবে সাদা খদ্দরের পাজামা পাঞ্জাবি। সমস্তটা মিলিয়ে একটি শুচিশুভ্র সহাস্য প্রসন্ন মূর্তি।

আমিও তখন ছিলাম খদ্দরধারী। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছি, পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি চাদর। দিনান্তিকা চা-চক্রে মল্লিকজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। চা-চক্রের অতি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আমার পোশাকের প্রতি এক নজর তাকিয়ে হাসিতে কৌতুকে উদ্ভাসিত মুখে সম্ভাষণ জানালেন —Ah, suits you well— the livery of liberty। লৌকিক পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না, নিজেই পরিচয় করে নিতে জানতেন। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গেও মুহূর্তে ভাব করে নিতেন। আশ্রমে ছোটো বড়ো সকলের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব। ইস্কুলে কলেজে দু বিভাগেই ইংরেজির ক্লাস নিতেন। থাকতেন কলাভবন প্রাঙ্গণে একটি খড়ের কুটিরে। সেখানে তাঁর প্রতিবেশী কলাভবন এবং সংগীতভবনের ছাত্র অধ্যাপক সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন ভালো। শিল্পরসিক মানুষ নন্দলাল বসুর পরম ভক্ত। তাঁর সঙ্গে শিল্পালোচনায় আনন্দ পেতেন। আবার সংগীত-প্রেমিকও; গানের গলা ছিল, খেয়াল হলে খুব জোর গলায় গান ধরতেন; কখনো চাপা গলায় ভজন গাইতেন, বেশ লাগত শুনতে।

শান্তিনিকেতনের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন অল্প বয়সেই। ছাত্রজীবন থেকেই রবীন্দ্রভক্ত। ইংরেজি অনুবাদ মারফত রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে প্রথম

পরিচয়। তখনই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতনে আসবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— আগে কিছুদিন এখানে এসে থাকো, জায়গাটা ভালো লাগলে তবে তো। ছাত্রজীবন শেষ করে করাচিতে এক সওদাগরি আপিসে কাজ নিয়েছিলেন। কিন্তু মন হয়ে আছে শান্তিনিকেতন-মুখো। কদিনের ছুটি নিয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে, তাঁকে প্রণাম জানাতে। কিন্তু এসে দেখেন কবি শান্তিনিকেতনে নেই, কলকাতায় গিয়েছেন, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এত দূর থেকে এসে একবার দর্শন না করেই ফিরে যাবেন? স্থির করলেন, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখবেন, এর মধ্যে কবি যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন আশ্রমে। বছর-দুই আগে ভাগ্যক্রমে অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে বম্বেতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সামান্য দু-চার মিনিটের মাত্র কথাবার্তা। সেই সূত্র ধরে এখন অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। অ্যাণ্ড্রুজও স্নেহপরবশ হয়ে অতিথি যুবকটিকে কাছে রেখে, সঙ্গ দিয়ে যথাসম্ভব আনন্দেই রাখলেন। গুরুদয়ালের অ্যাণ্ড্রুজ-ভক্তি যে পরিমাণে বাড়ল সে পরিমাণে বাড়ল শান্তিনিকেতন-প্রীতি। স্থানটি তাঁর কাছে অতি মনোরম বলে মনে হল। একমাত্র দুঃখ কবি-সন্দর্শন এ যাত্রায় হল না। ফিরে যাবার দিন স্থির করেছেন, সুখের বিষয় ঠিক তার আগের দিনটিতেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরে এলেন। অ্যাণ্ড্রুজ কালবিলম্ব না করে দর্শনপ্রার্থীকে কবি-সন্নিধানে নিয়ে হাজির; বললেন— গুরুদেব, এই দেখুন আপনার ডাক শুনে, শান্তিনিকেতনের ডাক শুনে এই তীর্থযাত্রীটি এসেছেন সুদূর বালুচিস্তান থেকে! রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে সহাস্যে গ্রহণ করলেন গুরুদয়ালকে। গুরুদেবের দেহ তখনো দুর্বল, কথাবার্তা খুব বেশি হতে পারে নি। তা হলেও গুরুদয়াল পরিতৃপ্ত। খুশি মনে পদধূলি নিয়ে ফিরে গেলেন নিজ কার্যস্থলে।

করাচিতে ফিরে এসে আবার সেই সওদাগরি আপিসের কাজে লেগেছেন, কিন্তু কদিন না যেতেই হঠাৎ অ্যাণ্ড্রুজের কাছ থেকে এক তারবার্তা পেলেন— অবিলম্বে লাহোরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। গুরুদয়াল তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন লাহোরে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং তার পরেও ইংরেজ সরকার পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল তারই তথ্যানুসন্ধানের জন্যে অ্যাণ্ড্রুজ গিয়েছেন লাহোরে। এ কাজে তাঁকে

সাহায্য করবার জন্যই তিনি মল্লিকজিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে দুজনে পাঞ্জাবের নানা অঞ্চল ঘুরে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অ্যাণ্ড্রুজের মহানুভবতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন তার প্রভাব তাঁর জীবনে গভীরভাবে অঙ্কিত ছিল। ইংরেজের পাশবিক অত্যাচারে লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কাছে অ্যাণ্ড্রুজ নতজানু হয়ে তাঁর স্বদেশবাসীদের পক্ষ থেকে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করছিলেন। অ্যাণ্ড্রুজের মৃত্যুর পরে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধে মল্লিকজি সে সময়কার নানা ঘটনার অতি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছিলেন। সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ নামের আদ্যক্ষর কটি বিশ্লেষণ করে নতুন নামকরণ করেছিলেন ক্রাইস্টস্ ফেইথফুল অ্যাপস্‌ল্। পরে অ্যাণ্ড্রুজের কথা বলতে গিয়ে অনেকে মল্লিকজির দেওয়া ঐ নামটি ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই চিঠিপত্রে যোগরক্ষা করেছিলেন। কিছুদিন পরে যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েই তাঁকে অবিলম্বে আসবার জন্যে লিখে দিলেন। এটা ১৯২০-২১ সালের কথা, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব চলছে। এসেই স্কুল বিভাগে অধ্যাপনার কাজে লেগে গেলেন। অল্পদিনেই শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করলেন এবং সদাপ্রফুল্ল স্বভাবগুণে আশ্রমবাসী সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠলেন। যে-মানুষ বহু গুণের অধিকারী, মানুষের মন অধিকার করতে তাঁর বেশিদিন লাগে না। গানের কথা তো আগেই বলেছি, খেলাধুলায়ও মল্লিকজির যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, খুব ভালো টেনিস খেলতেন। ভাষাবিদ্ ছিলেন—ভারতীয় অনেক ভাষাই জানতেন। হিন্দী উর্দু পুশ্‌তু সিন্ধি গুজরাটী মারাঠী সব ভাষাই অনর্গল বলতে পরতেন। বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন এলে দিব্যি জমিয়ে গল্প করতেন। ফারসী ভাষাও এক-আধটু জানতেন, হাফেজের বয়েত মাঝে মাঝেই আওড়াতেন। খুব ভালো ইংরেজি লিখতেন, বলতেনও চমৎকার। হিন্দী এবং গুজরাটীতে দু-একখানা বইও লিখেছেন। এখানে এসে বাংলাও শিখে নিয়েছিলেন, সকলের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতেন।

মানুষটি মূলত ছিলেন সেবাধর্মী। সংসারধর্ম করেন নি, চিরকুমার। অ্যাণ্ড্রুজের মতো যখন যেখান থেকে ডাক আসত সেখানেই ছুটে যেতেন। কাজেই স্থির হয়ে কোথাও বেশি দিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

শান্তিনিকেতনে একটানা দু-তিন বছরের বেশি কোনোবারেই থাকেন নি। আসা-যাওয়ার মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু যখনই এসেছেন, যতদিনই থেকেছেন একেবারে কায়মনোবাক্যে আশ্রমবাসী হয়ে থেকেছেন। কাজেকর্মে এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি হত না; তার উপরে হাস্যে কৌতুকে গানে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। ছেলেদের সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপে তাঁর সক্রিয় প্রশ্রয় ছিল। একবার ছেলেদের শখ হল ঘোড়ার অভাবে গাধার পিঠে চেপে তারা পোলো খেলবে। বোলপুর থেকে ধোপারা গাধার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ভুবনডাঙার বাঁধে আসত কাপড় কাচতে। তাদের কাছ থেকে এক দঙ্গল গাধা জোগাড় করে নিয়ে খেলার আয়োজন করা হল। খেলায় আবার একজন রেফারির প্রয়োজন কিন্তু সেজন্যে মোটেই ভাবতে হয় নি। মালিকজিকে বলামাত্রই তিনি রাজি। তিনিও একটি গাধার পিঠে চেপে মাঠে অবতীর্ণ হলেন। সেদিনের সেই পোলো খেলার রগড়টি এখনো অনেকের মনে আছে। শান্তিনিকেতনের বহু কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনীর সঙ্গে অধ্যাপকমশায়দের নাম জড়িয়ে আছে। তাঁরা যে ছাত্রদের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে বাস করতেন এ-সব তারই দৃষ্টান্ত।

যখনই শান্তিনিকেতনে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে লিখেছেন— আসবে বৈকি, এখানে সকলেই তোমাকে চান। তোমার হাসিতে গানেতে আমাদের আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠবে সে আশায় আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। চলে গেলে আর-সকলের মতো রবীন্দ্রনাথও দুঃখিত হতেন। প্রথমবারে বছর-দুই থেকে যখন চলে গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড্রুজকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— গুরুদয়াল চলে গেল। আশা করছি ঘুরে ফিরে ও আবার আসবে। ও এখানকার জীবনটিকে ঠিক বুঝেছে, এর মর্মমূলে পৌঁচেছে। সন্ধ্যাবেলায় ওর ঘরটির পাশ দিয়ে যেতে আমি যেন একটি প্রগাঢ় শান্তির স্পর্শ পাই।

দু-একবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ১৯২৮ সালে প্রশান্ত মহলানবিশকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'তুমি জানো, গুরুদয়াল সকল দিক থেকেই আমাদের কাজের উপযুক্ত। অনেকদিন যাবৎ এঁকে পাব বলে আমরা অপেক্ষা করেছি। ইংরেজি বেশ ভালো জানেন… এঁর লেখবার শক্তি আছে। অত্যন্ত কর্তব্যভীরু spiritual মানুষটি।… এঁকে যদি লিখে

পাঠাও তো ভালো হয়... যদি কোনো কারণে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে আমাকে জানিয়ো— আমি লিখে দেব।' তখন কলেজ বিভাগ স্থাপিত হয়েছে, বোধ করি কলেজে অধ্যাপনার কাজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মল্লিকজির কাজ ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; বেতন নিতেন না। নিজের খরচ নিজেই কোনো রকমে চালিয়ে নিতেন। শেষ দিকে যখন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা তখনই মুখ ফুটে বলেছিলেন যে আর চালাতে পারছেন না। সেই তখন থেকে একটা মাসোহারা ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল, সেও তেমন কিছু নয়। একেবারেই আদর্শবাদী মানুষ, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছিলেন। একবার মল্লিকজি যখন শান্তিনিকেতন থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে নন্দিতার (মীরা দেবীর কন্যা) সঙ্গে কৃষ্ণর (কৃপালনী) বিবাহ স্থির হয়েছে। চিঠি পেয়ে মল্লিকজি খুব মজা করে লিখেছিলেন— গুরুদেব, এবারে আমারও একটি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন-না। অবশ্য আমার মনের মতো পাত্রীটি আমি নিজেই পছন্দ করে রেখেছি। এখন দুহাত মিলিয়ে দিলেই হয়। নামটি বললেই পাত্রীটিকে আপনি চিনতে পারবেন। নাম Lady Poverty— whom I have wooed ever since I set my foot on the sacred soil of Santiniketan in 1919.

প্রথমে বিনা বেতনে, পরে সামান্য বেতনে কাজ করা ছাড়াও বিশ্বভারতীর কথা কত ভাবে ভাবতেন, একটি ঘটনায় তা প্রমাণিত হবে। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর পুস্তক সংগ্রহে তিনখানা মূল্যবান ফারসী পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। একজন ইংরেজ dealer বেশ মোটা টাকায় ঐ পাণ্ডুলিপি কখানা কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও মল্লিকজি তা বিক্রি করতে রাজি হন নি। বিশ্বভারতীর কাজে লাগতে পারে এই ভেবে পাণ্ডুলিপি কখানা ডাকযোগে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়ে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন।

শেষবারে এসে বোধ করি পাঁচ-ছ বছর এক নাগাড়ে ছিলেন। সেই তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। স্কুল এবং কলেজ দু বিভাগেই ক্লাস নিতে দেখেছি। শেষ দু বছর অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে তাঁকে রবীন্দ্রভবনের

দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদনার কাজটিও করেছেন। অধ্যাপনার কাজে যেমন নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এ কাজেও তেমনি। কিন্তু এর পরে সেই যে চলে গেলেন আর শান্তি-নিকেতনের কাজে ফিরে আসেন নি। বেড়াবার জন্যে এসেছেন, ক'দিন থেকে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে, হাসি গল্পে আসর জমিয়ে আবার চলে গিয়েছেন। শেষবারে যখন দেখেছি তখন শরীর কাতর কিন্তু সেই সদা-প্রফুল্ল ভাবটি পূর্ববৎ অম্লান।

এখান থেকে গিয়ে গান্ধীজির প্রতিষ্ঠিত হরিজন আশ্রমে অনেকদিন কাটিয়েছেন আমেদাবাদে। অবশ্য ঐটিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষেই ঘুরে বেড়াতেন। আর্তসেবার কাজে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে সেখানেই ছুটে গিয়েছেন। এমন নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। মল্লিকজির মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে দু-এক খানা বই লেখা হয়েছে, তাতে দেখলাম, মল্লিকজিকে তাঁরা একেবারে সন্তজি বানিয়ে তুলেছেন। একজন সাধুপুরুষ হিসাবে তিনি অবশ্যই কোনো সাধু-সন্তর চাইতে খাটো ছিলেন না কিন্তু তাই বলে তিনি কোনোরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীকে হাতের স্পর্শেই রোগমুক্ত করতে পারতেন— এমন কথা কখনো আমরা শুনি নি। মল্লিকজি নিজে শুনে থাকলে কতখানি কৌতুক বোধ করেছেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। যা হোক, যিনি যে ভাবে দেখে তৃপ্তি পান তিনি সে ভাবেই দেখুন ; তবে আমরা মল্লিকজিকে সন্তজি হিসাবে দেখতে চাই না। আমরা যে হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকপরায়ণ, আনন্দময় পুরুষটিকে দেখেছি তিনিই শান্তিনিকেতনের মল্লিকজি।

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

শান্তিনিকেতনকে যার মনে ধরেছে, শান্তিনিকেতন তাকেই মনে করে রেখেছে। যে তার মন পায় নি, সে তাকে মনে রাখে নি। শান্তিনিকেতনের কাজকে যাঁরা আপন ঘরের, আপনজনের কাজ বলে মনে করেছেন তাঁরাই শান্তিনিকেতনের আপনজন বলে পরিগণিত হয়েছেন। শান্তিনিকেতনের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত লোক এসেছেন গিয়েছেন, শন্তিনিকেতনে বাস করেও তাঁদের অনেকের কথা আমরা জানি নে। এর কারণটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গিয়েছেন। বলেছেন— অনেকেই এসেছেন থেকেছেন কাজও করেছেন কিন্তু সে কাজের কোনো রূপ ছিল না, সেজন্যে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। খুব খাঁটি কথা। শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটি ভাব-রূপ আছে, সেটি বুঝতে পারলে তবে তো আমার কাজটি যথোচিত রূপ পাবে।

জিয়াউদ্দিন খুব দীর্ঘদিন এখানে ছিলেন না। আয়ুতেই কুলোয় নি, যৌবনেই জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল। কিন্তু অতি অল্প দিনেই শান্তিনিকেতনের হৃদয়টিকে তিনি অধিকার করে নিয়েছিলেন। বাধা ছিল প্রচুর— ভাষার বাধা, ধর্মের বাধা, আচার-অভ্যাসের বাধা। পাঞ্জাবের অধিবাসী, এসেছেন অমৃতসর থেকে। তাও বলতে গেলে বালক বয়সে, সবে ইস্কুলের চৌকাট পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছিলেন। যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন সে তুলনায় এখানকার পরিবেশ এতই ভিন্ন ধরনের যে এর সঙ্গে নিজেকে থাপ খাইয়ে নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে সকল বাধা অতিক্রম করে জিয়াউদ্দিন এখানকার ঘরের মানুষটি হয়ে গেলেন।

মুষ্টিমেয় যে-ক'টি ছাত্রকে নিয়ে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়েছিল জিয়াউদ্দিন তাঁদের অন্যতম। শিক্ষা-বিষয়ক কোনো নতুন উদ্যোগের পক্ষে সময়টা খুব অনুকূল ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন চলছে, সারা দেশ তোলপাড়। ইস্কুল কলেজ ছেড়ে ছাত্ররা সব বেরিয়ে এসেছে। জিয়াউদ্দিনও তাঁর কলেজ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। ধুয়া উঠেছে— পাশ্চাত্য বিদ্যা তথা বিজাতীয় শিক্ষা বর্জন করতে হবে। ঠিক সেই সময়টিতে বিশ্বভারতীর জন্ম একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বিশ্বভারতী বললে— বিদ্যার কোনো জাত নেই। দেশের

হোক বিদেশের হোক যা শিক্ষণীয় তা সকলের কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তা ছাড়া মুখে স্বদেশী এবং স্বজাতীয় শিক্ষার বুলি আওড়ালে কী হবে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার তেমন কোনো উদ্যোগ আয়োজন কি দেশের কোথাও তখন ছিল? আমাদের হিন্দু বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে কতটুকু আমাদের অনুসন্ধিৎসা? অবিভক্ত ভারত তখন পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম সমাজের বাসভূমি। সেই ইসলামিক সংস্কৃতির চর্চাই বা দেশে কোথায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার একটি সমবায় ভাণ্ডার গড়ে তুললেন। দেশবিদেশ থেকে নামজাদা সব পণ্ডিত এসে জড়ো হলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রুশ পণ্ডিত বগদানফ। আরবী ফারসী দুই ভাষাতেই তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি; বিশেষ করে ফারসী কাব্য-সাহিত্যের তিনি অতি রসজ্ঞ সমঝদার। জিয়াউদ্দিন ছিলেন বগদানফ সাহেবের অতি প্রিয় ছাত্র। তাঁর সহপাঠী ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। ফারসী ভাষায় জিয়াউদ্দিন এতটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে তিনি পরে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এর আগে উর্দুতেও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যথার্থ সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। কাব্যপাঠে প্রচুর আনন্দ পেতেন; নিজেও কাব্য রচনা করতেন। উর্দু এবং ফারসী ভাষায় বেশ কিছু কবিতা এবং গান রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষাটিও দিব্যি শিখে নিয়েছিলেন। গানের গলা ছিল। রবীন্দ্রসংগীতে খুব রস পেয়েছিলেন এবং অনেক গান শিখেও নিয়েছিলেন।

বিশ্বভারতীর শিক্ষা সমাপ্ত করে জিয়াউদ্দিন কিছুদিনের জন্য আফগান সরকারের চাকুরি নিয়ে কাবুলে গিয়েছিলেন। বাদশাহ আমানউল্লা তখন আফগানিস্তানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমানউল্লা দেশবিদেশ থেকে কিছু বিদ্বান পণ্ডিত সংগ্রহ করছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তিনিকেতনের দুই অধ্যাপক— একজন হলেন ফারসী ভাষার পণ্ডিত বগদানফ, অপরজন ফরাসী ভাষার অধ্যাপক বেনোয়া সাহেব। এঁরা যাবার কিছু কাল পরে কাবুলে গিয়ে হাজির হলেন এঁদেরই দুই ছাত্র —প্রথমে সৈয়দ মুজতবা আলী, পরে মৌলানা জিয়াউদ্দিন। একে অন্যকে পেয়ে চারজনেই বেজায় খুশি। আলী সাহেব তাঁর 'দেশে বিদেশে' নামক গ্রন্থে বলেছেন— শান্তিনিকেতনের দুই গুরু এবং দুই শিষ্য মিলে সুদূর আফগান

মুলুকে তাঁদের 'চার-ইয়ারী' জমে উঠল। জিয়াউদ্দিন ভালো ফারসী জানতেন বলে কাবুলী সমাজেও তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর গানের গলাটিকেও তিনি ওখানে কাজে লাগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গান তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শান্তি-নিকেতনের সাহিত্যসভায় সে-সব গান মূল রবীন্দ্রসংগীতের সুরে গেয়ে শোনাতেন, সভা খুব জমে উঠত। কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজে সে-সব গান শুনিয়ে তিনি দুদিনেই সেখানেও খুব জমিয়ে নিলেন। মানুষটি ছিলেন বড়ো ফুর্তিবাজ। কাবুলের প্রচণ্ড শীতে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতে হিহি করে কাঁপছেন তখন গলা ছেড়ে গান ধরতেন— দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে।

এদিকে কিন্তু 'চার-ইয়ারী'তে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। বগদানফ চলে যাওয়াতে বেনোয়া সাহেব বড্ড দমে গেলেন। কাবুল প্রথমাবধিই তাঁর খুব একটা ভালো লাগে নি। তার উপরে আবার ভদ্রলোক অতিমাত্রায় শান্তিনিকেতন-ভক্ত। সারাক্ষণ শান্তিনিকেতনের কথা বলেন আর মন-মরা হয়ে থাকেন। এরই মধ্যে আফগান মুলুকে লেগে গেল এক বিষম বিভ্রাট। বাদশা আমানউল্লা ছিলেন সুশিক্ষিত সংস্কার-প্রয়াসী মানুষ, তিনি আফগান সমাজকে আধুনিক কেতায় ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু রক্ষণশীল মোল্লার দল দেশসুদ্ধ মানুষকে বাদশার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল দেশময়। আমানউল্লাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল। বিদেশী আগন্তুকরা সকলেই নিজ নিজ দূতাবাসের সাহায্যে আফগানিস্তান ত্যাগ করলেন, সেইসঙ্গে বেনোয়া সাহেবও। আটকা পড়ে গেলেন শুধু দুই ভারতীয় অধ্যাপক— মৌলানা জিয়াউদ্দিন এবং সৈয়দ মুজতবা। ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনাহারে অর্ধাহারে থেকে বহু দুর্ভোগ ভুগে কাবুল যখন বিদ্রোহীদের কবলে পড়তে যাচ্ছে তার পূর্ব মুহূর্তটিতে দুই বন্ধু কোনো প্রকারে কাবুল ত্যাগ করে ভারতভূমিতে এসে পৌঁছান।

জিয়াউদ্দিন ঘুরে-ফিরে আবার শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। বিশ্ব-ভারতীতে ইসলামিক সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি বিভাগ স্থাপনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই ভেবে আসছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে তা হয়ে উঠছিল না। ১৯২৭

সালে নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ অর্থে ইসলামিক বিভাগটি স্থাপিত হল। মৌলানা জিয়াউদ্দিন উক্ত বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এর কিছুকাল পরে প্রসিদ্ধ হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত জুলিয়াস্ গেরমানুস্ ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন। ইসলামিক তত্ত্বাচার্য হিসাবে ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরূপ একজন পণ্ডিতকে কাজে পেয়ে মৌলানা তাঁর নিজ পাণ্ডিত্যে শান দিয়ে নেবার মস্ত বড়ো সুযোগ পেলেন। অধ্যাপনা-কার্যের সঙ্গে সঙ্গে জিয়াউদ্দিন ঐ সময়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সে-সব প্রকাশিত হয়। 'মোসলেম ক্যালিগ্রাফি' নামক একটি গবেষণামূলক আলোচনা পুস্তকাকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। নানা বিষয়েই আগ্রহ ছিল। ব্রজভাষার একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ সম্পাদনা করে ফারসী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

পণ্ডিত ব্যক্তি হয়েও মানুষটি মূলত ছিলেন কবিস্বভাবের এবং যথার্থ সাহিত্যরসিক। আয়ুতে কুলোয় নি বলে খুব বেশি কিছু লিখে যেতে পারেন নি। 'কিষাণ কন্যা' নামে উর্দু ভাষায় একটি কাহিনী রচনা করেছিলেন, সেটি অবলম্বনে একটি ছায়াছবি তৈরি হয়েছিল। সে ছবির গান-ক'টিও তাঁরই রচিত। ছবিটি বম্বে এবং করাচীতে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। একখানা উপন্যাস রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯৩৮ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে গেলেন দেশে— অমৃতসরে। সেখান থেকে আর ফিরে আসা হল না। টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে জীবনান্ত ঘটল। অল্প দিনের জীবন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক আরোই স্বল্প কালের। ছাত্র-জীবন এবং শিক্ষক-জীবন মিলিয়ে বোধ করি বারো-তেরো বছরের বেশি নয়। কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই চরিত্রের মাধুর্যে, হৃদয়ের ঔদার্যে এবং বিদ্যার গভীরতায় তিনি সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন।

এ গ্রন্থে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্যই পরিণত মন নিয়েই এসেছিলেন, তাঁরা অনেকটা নিজগুণেই এখানকার জীবন থেকে রস আহরণ করতে পেরেছেন। আবার অনেকে এসেছেন খুব অল্প বয়সে; তাঁদের সম্বন্ধে বলতে বাধা নেই যে তাঁরা শান্তিনিকেতনের নিজের হাতে-গড়া মানুষ। জিয়াউদ্দিন এঁদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক

কেবলমাত্র আকস্মিক পরিচয়ের বা পারস্পরিক আকর্ষণের সম্পর্ক নয়। সম্পর্কটা গভীরতর কারণ এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন, এখানকার রোদে জলে হাওয়ায় এবং মাটির রস সম্পদে, এখানকার সৌহার্দ্যে তাঁর হৃদয় মন পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের বেলায় এটি হয় না, গ্রহণ করবার শক্তি চাই, নেবার মতো মনের আগ্রহ চাই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মৌলানা জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে বলতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্কতা আহরণ করতে পারেন। এ আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়ার শক্তি।

জিয়াউদ্দিনের অকালমৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে গিয়েছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। আমার নিজের দিক থেকে কেবল এইটুকু বলতে পারি যে এমন বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে— এ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল।

মানবসমাজের ইতিহাসে একটি অতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আছে। কত কত মানুষ প্রতিদিন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যায়; এমন কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ রেখে যায় না যা তাদের স্মৃতিকে সঞ্জীবিত রাখতে পারে। এরা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অথচ এদেরই মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁরা মানুষ হিসাবে অসাধারণ। সরল সরস, সচ্চরিত্র সহৃদয়— কোমলে মধুরে মিশিয়ে এরা দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। সমাজের মূল্যবোধটা একটু মোটা ধরনের; হাঁক ডাক জাঁক নেই বলে এঁরা তার চোখেই পড়ে না। যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন জেনেছেন বুঝেছেন এঁদের পরিচয় তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বড়ো রকমের কোনো কৃতিত্ব নেই, বড়োদরের কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব নেই যে এঁদের পরিচয়কে সর্বসমক্ষে তুলে ধরবে। আপনজন আর বন্ধুজন ছাড়া কেউ তাঁদের মনে রাখবে না। কাজেই মৌলানাকে মনে রাখলে শান্তিনিকেতনই রাখবে। জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁকে উদ্দেশ

করে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে এই কথাটিই বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন। তবে বন্ধুজনের স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা পাওয়াটাও কিছু কম পাওয়া নয়, সে কথাটি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন:

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

আমাদের ভাষায় মহীয়সী মহিলা বলে একটা কথা আছে। ভাষায় যা আছে জীবনেও তা থাকবার কথা। কিন্তু আজকের জীবন এতই কুঞ্চিত কুন্ঠিত খণ্ডিত যে বৃহৎকে এবং মহৎকে ধারণ করবার মতো যথেষ্ট পরিসর সেখানে নেই। শতবর্ষ পূর্বে ঠিক এমনটা ছিল না। শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগসুবিধা অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ছিল তথাপি জীবনের প্রসার ছিল অধিকতর বিস্তৃত, কর্মকাণ্ড ছিল বৃহদাকারের, ভাবনাচিন্তা কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তখন যে-সব শুভ সূচনা হয়েছিল আজ সে-সব বাসি এবং মলিন হয়ে এসেছে। নবযুগের সূচনাকালে যে সমারোহ, যে ঔজ্জ্বল্য, যে জৌলুস জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে পরবর্তী জেনারেশান তার ভাগ পায় না। অনেক জিনিসই মিইয়ে যায়; আমরা সেই মিয়োনো জেনারেশান। আজকের সমাজে সবই খুদে আকারের; সেদিনের পুরুষসিংহ এবং রমণীয়ত্ব দুই-ই আজ সমান বিরল। কাজেই মহীয়সী মহিলা কথাটা এখন নিতান্তই একটা কথার কথায় দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যবশত কখনো যদি তেমন কোনো নারীর দর্শন পাওয়া যায় তা হলে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। আমাদের মস্ত বড়ো গর্ব যে সেই পরম সৌভাগ্যটি আমাদের জীবনে ঘটেছে। এক যুগ আগের মহীয়সী মহিলা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে খুব কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। শুধু তাঁর দর্শন লাভ করেছি এমন নয়, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, তাঁকে ঘিরে বসেছি, তাঁর কথা শুনেছি, হাসিগল্পে, মধুর ভাষণে দিনের পর দিন তিনি আমাদের আপ্যায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে দুই দশককাল ইন্দিরা দেবী শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে আশ্রম জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করা কারো পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে যথাসাধ্য করেছেন কিন্তু দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেই দুর্দিনে আশ্রমবাসীরা ইন্দিরা দেবীকেই প্রধান আশ্রয় এবং সহায়, এক কথায় অভিভাবিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে অভিভাবিকা বলতে যা বোঝায় তিনি সর্বতোভাবে তাই ছিলেন। সকলের ভালোমন্দ সুখদুঃখের খবর রাখতেন। 'আলাপিনী' নামে একটি

মহিলা সমিতি স্থাপন করে গৃহিণীদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতেন। ওদিকে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে যখন যে কাজে ডাক পড়েছে তাতেই সাগ্রহে সাড়া দিয়েছেন। সংগীত ভবনের প্র-নেত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। আজীবন সংগীতানুরাগিণী, সংগীত-শিক্ষাদানে কখনো ক্লান্তি ছিল না। ফরাসী ভাষায় পারদর্শিনী ছিলেন। ফরাসী ভাষা শিক্ষায় কেউ উৎসাহ প্রকাশ করলে তাকেও সাগ্রহে সাহায্য করতেন। এ ছাড়া আশ্রমের নানা সভা-সমিতিতে ডাক পড়ত। কখনো কখনো বিদেশী অতিথিরা এলে আলাপ-পরিচয় আপ্যায়নের জন্যেও তাঁকে প্রয়োজন হত। সকল কাজে এমন নিরলস উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় আজকের দিনে বড়ো একটা দেখা যায় না। পরে এক সময়ে বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যের পদেও কাজ করতে হয়েছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্স্টিটিউশন, ইন্দিরা দেবী ছিলেন তাই। তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান, বলা উচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে যা বুঝতেন ইন্দিরা দেবী তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। শিক্ষা বলতে শুধু তো কেতাবী বিদ্যা নয়, যদিচ ইন্দিরা দেবীর কেতাবী বিদ্যা যথেষ্টই ছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার সৌকর্য প্রকাশ পেত পোশাকে পরিচ্ছদে, চলনে বলনে, আলাপে পরিচয়ে, আচারে ব্যবহারে। প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কথায়, মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে শোভন রুচি এবং মাধুর্য বিকীর্ণ হত।

ঠাকুর-পরিবারের প্রতিভার দীপ্তি যখন সব চাইতে সমুজ্জ্বল, জোড়াসাঁকো গৃহ যখন শিল্প সাহিত্য, শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান সেই শুভলগ্নে একটি অতি অসামান্য পরিবেশে ইন্দিরা দেবীর কৈশোর যৌবন বিকাশলাভ করেছে। কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সঙ্গী' আখ্যা দিয়েছেন, সে আখ্যা ইন্দিরা দেবীকেও দেওয়া যায়। প্রভাতসংগীত কাব্যগ্রন্থ প্রাণাধিকা ইন্দিরাকে উৎসর্গ করেছিলেন; তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ কিংবা এগারো। কড়ি ও কোমল-এর অনেক কবিতা ইন্দিরাকে উদ্দেশ করে লেখা। রবীন্দ্রপ্রতিভার সব চাইতে যে ঝলমলে রূপ— মানসী, সোনার তরী, গল্পগুচ্ছে বিশেষ করে

ছিন্নপত্রে, যার অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ ইন্দিরা দেবী পরোক্ষভাবে তার অংশীদার। শেষোক্ত গ্রন্থের তিনিই অদৃশ্য নায়িকা। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের জন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতখানি ঋণী, ইন্দিরা দেবীর কাছে ততখানি। ছিন্নপত্রের ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। অসামান্যা গুণবতী মহিলা না হলে এমন-সব চিঠি তাঁকে উদ্দেশ করে লেখা হতে পারত না। রবীন্দ্রপ্রতিভার ঝলমলে রূপের কথা বলছিলাম; দেহমনের লাবণ্যে, বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তিতে তরুণী ইন্দিরাও তখন রূপময়ী। যেমন গুণবতী তেমনি রূপবতী। আমরা তাঁর যৌবনের সে রূপ দেখি নি, বার্ধক্যে তাঁকে দেখেছি অপরূপা— এক শুচিস্মিতা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ অনেকেই লাভ করেছেন কিন্তু ইন্দিরা দেবী যতখানি পেয়েছেন এমন আর কেউ নয়। শুধু স্নেহ নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যতখানি সম্মান দেখিয়েছেন এমন আর কাকে? ছিন্নপত্রের চিঠিতে যে বলেছেন, "তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিংবা ভুল বুঝবি কিংবা বিশ্বাস করবি নে, কিংবা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্য-কথা বলে মনে করবি।... তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে।"— এমন কথা তিনি আর কারো সম্বন্ধেই কখনো বলেন নি। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এমন অচলা ভক্তিও আর কারো মধ্যে দেখি নি। 'রবিকা' কথাটি সর্বক্ষণ মুখে লেগেই থাকত। যখন যে প্রসঙ্গই উত্থাপিত হত উপসংহারটি হত একই ভাবে— 'রবিকা বলতেন'— ইত্যাদি ইত্যাদি।

অশেষ গুণের অধিকারিণী তথাপি এমন বিনয়ী মানুষ সংসারে দেখা যায় না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে গুণে গরিমায় তাঁর তুলনায় আমরা ছিলাম নগণ্য। কিন্তু আলাপে ব্যবহারে এতটুকু তার আভাস দিতেন না, প্রায় সমকক্ষ বলেই ধরে নিতেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথাটি মনে পড়ছে। অনিলকুমার চন্দ আমাকে নবাগত অধ্যাপক হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার আবছা

অন্ধকারে ছোট্টখাট্ট মানুষটিকে দেখে তিনি আমাকে সদ্য পাস-করা এক নবীন যুবক বলে মনে করেছিলেন। আমি প্রণাম করতেই হেসে বললেন— অর্বাচীন, অর্বাচীন—। আজকাল যত সব অর্বাচীনরা অধ্যাপক হয়ে আসচেন। অবশ্য আমি তখন যৌবনসীমা প্রায় অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিতে চলেছি। পরে যখনই তাঁর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তখন এমন সবিনয়ে কথা বলতেন যে আমার সংকোচের অবধি থাকত না। একদিন বলে ফেলেছিলাম— আপনি সব ভুলে যাচ্ছেন, আমাকে প্রথম দিনটিতে দেখেই ঠিক চিনেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন অর্বাচীন; আমি আজও সেই অর্বাচীনই আছি। শুনে তিনি খুব হেসেছিলেন। সে হাসি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই তার মর্ম বুঝবেন— অপূর্ব নেই হাসি।

অত্যধিক বিনয়বশত নিজের প্রতি অবিচার করেছেন যথেষ্ট। শেষ বয়সে আত্মকাহিনী (এখনো অপ্রকাশিত, পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত) লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু সেটি এতই সংক্ষিপ্ত যে অনেক কথাই অনুক্ত থেকে গিয়েছে। যে মানুষের এত দরাজ মন, উজাড় করে সকলকে সব দিয়েছেন, সে মানুষ নিজের বেলায় এতখানি কার্পণ্য করতে পারেন ভাবলে অবাক হতে হয়। আসল কথা, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর অতিমাত্রায় সংকোচবোধ ছিল; পাছে বিন্দুমাত্র অহমিকা প্রকাশ পায় এই ভয়ে অনেক কথাই অকথিত রেখেছেন। তাও সে কাহিনীর ছেদ টেনেছেন জীবন অবসানের ঢের আগে।

বাংলাদেশের এক অতি গৌরবময় যুগের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, কোনো কোনো আন্দোলনের সঙ্গে, বিশেষ করে এদেশের নারী-আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত— অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স-এর তিনি সভানেত্রী, সবুজ পত্র পরিচালনায় স্বামীর সুযোগ্যা সহযোগিনী, নিজে সুলেখিকা, একাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী ('রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য), দিশি বিলিতি দু'ধারার সংগীতেই অসাধারণ পারদর্শিতা— এত-সব সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে কোনো কথাই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেন নি।

আত্মপ্রচারে রুচি ছিল না; অপরে প্রচার করল কি করল না সে বিষয়েও উদাসীন ছিলেন। বলা বাহুল্য, ভারত সরকার ভারতরত্ন উপাধি দেন নি কিন্তু নিজগুণেই ভারত-নারী-রত্ন রূপে দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান লাভ করেছেন।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

এ কথা আগেই বলেছি যে সেই প্রথম যুগেও রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যাঁরা শান্তিনিকেতনের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই কিছু মহা মনীষী ব্যক্তি ছিলেন না। কয়েকজন অবশ্যই ছিলেন যাঁদের নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান বলা চলে। বাকিরা সকলেই আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ। কিন্তু ঐ-সব সাধারণ মানুষরাই এমন কিছু কাজ করে গিয়েছেন যাকে অসাধারণ বলতে হবে। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, এ প্রতিষ্ঠানের যিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনো মানুষই নির্গুণ নয়, প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো গুণের অধিকারী। তবে বেশির ভাগ মানুষই নিজ গুণ সম্বন্ধে সজ্ঞান নয়। গুণটিকে ধরিয়ে দিতে হয়, উৎসাহ প্রেরণা দ্বারা তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। এ কাজ যিনি করেন তিনি মানুষের জীবনকে নতুন করে গড়ে দেন। মানুষটি তখন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে, নিজের শক্তিতে নিজেই বিস্মিত হয় এবং কখনো কখনো অসাধ্য সাধন করে।

এ জিনিসটি শান্তিনিকেতনে বার বার ঘটেছে। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যে সব সময়ে ডেকে ডেকে বলে বলে একে তাকে এ কাজে সে কাজে নিয়োজিত করেছেন এমন নয়। তিনি নিজে যে সারাক্ষণ সৃষ্টির কাজে মগ্ন, সেটাই সকলের কাছে এক মস্ত বড়ো প্রেরণা ছিল। তা ছাড়া যে যেভাবে পারুক নিজেকে প্রকাশ করুক তাঁর এই ইচ্ছাটি কারোই অজানা ছিল না। এটিই সকলের মনে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী নানা প্রয়াসের প্রেরণা এনে দিয়েছে। অপর দিকে কোথাও কারো কোনো গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তো তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী তাঁর উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে। প্রদীপের শিখাটিকে যেমন মাঝে মাঝে উসকিয়ে দিতে হয় মানুষের গুণও তেমনি ঠিক ভাবে উসকানি পেলে তবেই আগুনের মতো দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু এর চাইতেও বড়ো কথা, শান্তিনিকেতনের জীবনটিকেই তিনি এমন তারে বেঁধে দিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের হয়ে শান্তিনিকেতনই একদিন তাগিদ দিতে এবং নিজের দাবি পেশ করতে শিখেছে। যে এসেছে তাকেই বলেছে— তুমি এসেছ, খুব ভালো করেছ। এখন তোমার যা ভালোটুকু

আছে, যে গুণটুকু আছে সেটুকু আমাকে দাও আর আমার যেটুকু আছে সেটুকু তুমি নাও। এক কথায় বলতে গেলে এইটুকুই শান্তিনিকেতন জীবনের রহস্য, বলতে পারেন রস। যাঁরা ঐ রসের সন্ধান পেয়েছেন তাঁদেরই জীবনে নতুন স্বাদ এসেছে, এসেছে নতুন সাধ, সেইসঙ্গে এসেছে সাধ্যশক্তি, এসেছে নিষ্ঠা, সব শেষে সিদ্ধিলাভ। গোটা মানুষটাই বদলে গিয়েছে। কখন কী ভাবে যে এঁদের জীবনে এমন রূপান্তর ঘটেছে তাঁরা নিজেরাই তা জানতে পারেন নি। আমি একে বলি শান্তিনিকেতন জীবনের অ্যালকেমি। শান্তিনিকেতন এঁদের নিয়েই গর্ব করে কারণ এঁদের সে নিজ হাতে গড়ে নিয়েছে।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী সম্পূর্ণরূপে শান্তিনিকেতনের হাতে-গড়া মানুষ। ইতিপূর্বে যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের অনেকে নিজ মুখেই বলেছেন যে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়েছে। এখানে আসবার পরে কারো কারো জীবনের ধারা এমন ভাবে বদলে গিয়েছে যে আগের সে মানুষকে আর চেনাই যায় নি। দ্বিবেদীজি এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। প্রথম যখন এলেন তখন আচারে বিচারে রীতিমত গোঁড়া এক ব্রাহ্মণ সন্তান; পোশাকে আশাকে চলনে বলনে নিতান্তই দেহাতী ধরনের। পুরোনোদের মুখে শুনেছি, প্রথম প্রথম তাঁর গ্রাম্য চালচলন এবং রক্ষণশীল ভাবভঙ্গি দেখে কিঞ্চিৎ কৌতুকের সঞ্চারও হয়েছিল। আমি এসেছি তাঁর বেশ কয়েক বছর পরে। কিন্তু প্রথম আলাপে সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই অতিশয় মার্জিত রুচি এবং পরিশীলিত একটি মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অবশ্য পোশাকে পরিচ্ছদে তখনো তিনি আগের মতোই সাদাসিধে কিন্তু গ্রামবাসী-সুলভ স্বচ্ছ সরল মনটি তখন গ্রাম্যতা দোষ থেকে তো বটেই সম্পূর্ণ বহুবিধ সংস্কার থেকে মুক্ত। ভাবান্তরে মানুষের যে কতখানি রূপান্তর ঘটতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়।

দ্বিবেদীজির প্রাণখোলা হাসিটির মধ্যেই একটি উদার-প্রাণ মানুষের পরিচয় পাওয়া যেত। শান্তিনিকেতন নানা রসের রসিক কিন্তু তার অন্যতম প্রধান রস হল হাস্যরস। হাস্যরস প্রাণশক্তির পরিচায়ক। সেটির প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস তাঁর লেগেই থাকত। এ ছাড়া অফুরন্ত হাসির খোরাক জোগাতেন ক্ষিতিমোহনবাবু;

হাস্যরসের অপর-এক ভাণ্ডারী ছিলেন গোঁসাইজি। প্রচুর পাণ্ডিত্যের গুরুভারও এঁদের হাসির ফোয়ারাটিকে চেপে রাখতে পারে নি। দ্বিবেদীজি ছিলেন এঁদের দোশর। পাণ্ডিত্যেও তিনি এঁদের সমকক্ষ। গোড়ার দিকে দিনুবাবু থেকে আরম্ভ করে ইদানীং কালের অনিলবাবু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে হাস্যরসিকের অন্ত ছিল না। নিছক বিদ্যাচর্চার স্থান হলে শান্তিনিকেতন একটি বিদ্যাপীঠ হত, জীবনচর্চার পীঠস্থান হত না।

হাজারীপ্রসাদ বাল্যাবধি মেধাবী ছাত্র; তবে শিক্ষায়-দীক্ষায় হাল আমলের ইংরেজিনবিশ ছিলেন না। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে শাস্ত্রী উপাধি এবং জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য শাস্ত্রাচার্য উপাধি লাভ করেছিলেন। খুব অল্প বয়সে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এ ব্যাপারে কাশীতে শিক্ষা লাভ করেছেন এরূপ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহনবাবু দুজনেই কাশীতে শিক্ষিত। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণা নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই অধ্যাপনার কাজে আর-একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়েছিল। হাজারীপ্রসাদজি এলেন সেই পদটিতে, শুনেছি মালব্যজির সুপারিশপত্র নিয়ে এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের কাজে প্রথমাবধিই একটি অলিখিত বিধি প্রচলিত ছিল— রুটিন-গত নিত্যকর্ম ছাড়িয়ে অতিরিক্ত যতটুকু যিনি দিতে পারতেন তাই দিয়ে অধ্যাপকদের মূল্য নির্ধারিত হত। কাউকে কিছু বলে দিতে হত না। খানিকটা শান্তিনিকেতন জীবনের দাবিতেই দেখা যেত প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো কাজ নিয়ে মজে গিয়েছেন। এই মজে যাওয়াটাকেই বলা চলে শান্তিনিকেতন জীবনে দীক্ষা লাভ। দ্বিবেদীজির এই দীক্ষা লাভ করতে খুব একটা বিলম্ব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণে জ্ঞানী গুণী বিদ্বান পণ্ডিতদের তো বটেই, তা ছাড়াও মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন— এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ। উৎসুকচিত্ত, আনন্দিত প্রাণ বলতে সর্বাগ্রে মনে হয় দিনুবাবু, গোঁসাইজি, দ্বিবেদীজি, হরিদাস মিত্র প্রমুখর কথা। সকলেই বিদ্বান পণ্ডিত মানুষ কিন্তু তারও চাইতে বড়ো কথা হল, এঁদের দেখলেই মনে হত এঁরা সব সময়েই যেন কী এক আনন্দে মশগুল হয়ে আছেন। এঁরাই

আসল রসিকজন, শান্তিনিকেতনকে পণ্ডিতজনদের চাইতেও বেশি করে পেয়েছেন রসিকজনেরা। বুঝহ রসিকজন যে জান সন্ধান— দ্বিবেদীজি অতি অল্পদিনেই রসের সন্ধানটি পেয়ে গিয়েছিলেন। আড্ডা দিয়েছেন, গল্প করেছেন, হাস্য-পরিহাসে অপরকে আনন্দ দিয়েছেন, অপরের রসিকতায় প্রাণভরে হেসেছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত সারাক্ষণ বুঝি এঁরা গল্প করে আড্ডা দিয়েই কাটাচ্ছেন। কিন্তু গল্প আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে এঁরা যে কী পরিমাণ পড়াশোনা এবং লেখাপড়ার কাজ করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আসল কথা, মনটা যদি তাজা থাকে তা হলে মাথাটা খেলে ভালো। তা ছাড়া এঁদের আড্ডাটাও নিতান্ত নিষ্ফলা আড্ডা ছিল না। হাসি গল্প রসিকতা অবশ্যই হত কিন্তু সেইসঙ্গে বহু দুরূহ তত্ত্বেরও আলোচনা হত। এক সময়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে বৈকালিক পরিক্রমায় বেরোতেন বিদ্যোৎসাহীদের এক দল। পরে দেখেছি চা-চক্রের রসচক্র সমাধা করে বেড়াতে বেরোতেন গোঁসাইজি, দ্বিবেদীজি এবং হরিদাসবাবু। অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে থাকতেন প্রহ্লাদ প্রধান, উপেন্দ্রকুমার দাস, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। এ জাতীয় বৈকালিক পরিভ্রমণ এবং নানাবিধ আড্ডা শান্তিনিকেতন জীবনকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন আড্ডার অধিপতি। বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে প্রতি সন্ধ্যায় যে আড্ডা জমত দুঃখের বিষয় কেউ তার ইতিহাস লিখে রাখেন নি। সত্যি বলতে কি, এই আড্ডা জাতীয় জিনিসটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। একে বিশ্ববিদ্যালয়ের একস্টেনশন সার্ভিস বলা চলত। বিদ্যোৎসাহীরা এর দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে আড্ডাগত আলোচনা সূত্রে প্রাপ্ত বহু তত্ত্ব, তথ্য তাঁদের গ্রন্থাদিতে স্থান পেয়েছে। প্রচুর পরিমাণে আড্ডা দিয়েও দ্বিবেদীজি লেখাপড়ার কতখানি সময় পেয়েছেন তা অনুমান করা যাবে তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা দেখে। সব মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা বোধ করি পঞ্চাশের বেশি ছাড়া কম হবে না।

দ্বিবেদীজিকে এখানে অনেকেই পণ্ডিতজি বলে ডাকতেন। পণ্ডিত ব্যক্তি তো বটেই সংস্কৃত এবং হিন্দী সাহিত্যে জ্ঞান ছিল সুগভীর। বাংলা ভাষায়ও যথেষ্ট অধিকার জন্মেছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক ছিলেন

এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকখানা বই তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দী সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর স্থান বোধ করি সর্বাগ্রগণ্য। শুধু হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা নয়, সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদি নিয়েও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। মৌলিক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন-কি, উপন্যাসও লিখেছেন। বাণভট্টের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করে তিনি প্রচুর খ্যাতি এবং আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর অপর উপন্যাস 'চারুচন্দ্র লেখা'ও পাঠক সমাজে সমাদৃত। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি—'বাণভট্টকী আত্মকথা' ভারতীয় বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও হাজারীপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। হিন্দী ভাষা এবং সাহিত্যচর্চার একটি কেন্দ্র এখানে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক বানারসীদাস চতুর্বেদী। অর্থসাহায্য এসেছিল কলকাতার দুই বিদ্যোৎসাহী এবং রবীন্দ্রানুরাগী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এঁরা হলেন শ্রীভগীরথ কানোড়িয়া ও শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়া। চতুর্বেদীজি এঁদের দুজনের সঙ্গে দ্বিবেদীজির আলাপ করিয়ে দেন। পরে অর্থ সংগ্রহের কাজটি দ্বিবেদীজিই করেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছুদিন তাঁকে কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়েছে। অর্থসংগ্রহের কাজে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন পাকা ওস্তাদ। সেজন্যে গোড়ার দিকে দু-একবার অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন।

হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার পর থেকে শান্তিনিকেতনে যতদিন ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন হিন্দীভবনের সর্বময় কর্তা। এটিকে তাঁর হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। সেজন্যে এর প্রতি তাঁর মমতা ছিল প্রচুর। শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাবার পরেও এর সঙ্গে তিনি যোগ রক্ষা করেছেন। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বভারতী পত্রিকাটিও তিনিই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। এ কাজেও বারাণসীদাস চতুর্বেদী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে থাকতেই দ্বিবেদীজির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই আচার্য নরেন্দ্রদেবের আহ্বানে তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর কাল তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন। যতদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একান্তভাবে একাত্ম হয়েই ছিলেন। চলে যাবার পরেও যোগ ছিন্ন হয় নি। বিশ্বভারতীর কোনো কোনো সমিতির সদস্য হিসাবে মাঝে মাঝে তাঁকে আসতে হয়েছে। তবে কর্মসূত্রের সম্পর্কের চাইতে আত্মীয়তার সম্পর্কটি ছিল ঢের বেশি গভীর। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগ রক্ষা করতেন। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার পরেও আমরা তাঁকে শান্তিনিকেতনবাসী বলেই জানতাম। এই কারণে কয়েক মাস পূর্বে যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল তখন আশ্রমবাসী অনেকেই যথার্থ আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছেন।

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ

ক্ষিতিমোহনবাবু পরিহাস করে বলতেন—যুগের বদল হলে কেমন হয় দেখ। এককালে আমাদের দেশে নাম হত— জনক, একালের নাম হল— তনয়। বাপ-পিতামহের যুগ গিয়েছে, এখন ছেলেছোকরাদের যুগ— তনয় নামটা তারই প্রতীক। শুনে আমার মনে হয়েছিল, শান্তিনিকেতন ছেলেমেয়েদেরই রাজ্য, সেখানে জনক রাজাকে মানাবে কেন, তনয়-রাজাকেই বরং মানায়। আর রাজা বলতেও বাধা নেই। তনয়বাবু ছিলেন ছোটোদের সর্দার, তাদের নিয়েই তাঁর জীবন। শুধু তো লেখাপড়াটুকু নয়, তাদের সঙ্গেই থাকা, রান্নাঘরে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া, তাদের নিয়ে খেলা, তাদের সঙ্গে বেড়ানো, খেয়াল হলে চড়ুইভাতি করা। তিনি ছিলেন তাদের তরুমূলের রাজা। তনয়-রাজার মাথায় মুকুট ছিল না, কিন্তু তাই বলে একেবারে মুকুটবিহীন ছিলেন না; থাকতেন 'মুকুট ঘরে'। শিশুবিভাগের ছাত্রাবাস— সন্তোষালয়ের গা ঘেঁষে, মুকুট ঘর। ঘরটি যখন তৈরি হয় তখন শিশুবিভাগের ছেলেরা ওখানে 'মুকুট' নাটকের অভিনয় করেছিল, সেই থেকেই ঘরটির ঐ নাম হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন জীবনের স্বাদ একবার পেলে যা হয়। তনয়বাবুরও তাই হয়েছিল। শান্তিনিকেতনকেই মনপ্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে এসেছিলেন, সেই থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল শান্তিনিকেতনেই কাটিয়ে দিলেন। লোকে বলে এই দীর্ঘকালের মধ্যে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে তিনি নাকি পাদমেকং কোথাও যান নি। আমি আগে যে লিজেণ্ডের কথা বলেছি, তনয়বাবু সম্বন্ধেও সেরকম লিজেণ্ড কিছু কিছু প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, এ-সব কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু অত্যুক্তি থাকেই। এ কিংবদন্তীটিও পুরোপুরি ঠিক নয়। আগের কথা ঠিক বলতে পারি নে, আমি এসে তাঁকে ষোলো-সতেরো বছর এখানে দেখেছি। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি একটিবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন, সেটি আমাদের কারো কারো জানা আছে। কিন্তু সেও এক গল্প, করুণে মধুরে মিলিয়ে সে কাহিনী শুনবার মতো। তনয়বাবুর এক ভ্রাতা রেল কোম্পানির চাকুরে, তখন ছিলেন চিত্তরঞ্জনে। সে খবরটিও তনয়বাবুর জানা ছিল না। হঠাৎ নাবালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছ থেকে চিঠি

এল— জেঠু, তোমার কথা কেবল শুনেইছি, কোনোদিন তো দেখি নি। আমরা তো কাছেই আছি। একবার এসে আমাদের একটু দেখা দিয়ে যাও-না। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। চিঠি পেয়ে তনয়বাবু খুব খুশি। চায়ের দোকানে বসে গল্প করতে করতে চিঠির কথা বললেন, পড়েও শোনালেন। দেখুন তো, এমন করে লিখেছে একবারটি না গেলে আর চলছে না। সেই কবে বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, কারো আর খবরবার্তা নিই নি। এবার একবার যেতেই হবে। আমরাও বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবেন বৈকি, নিশ্চয় যাবেন। ছেলেমানুষ, অমন করে লিখেছে—। এর পরেও দেখা হলেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছি— কই কবে যাচ্ছেন? তিনি প্রতিবারেই বলেছেন, হ্যাঁ ভাবছি তো, একটা সুযোগ পেলেই যাব। এ-সব ব্যাপারে ওঁর গড়িমসি স্বভাবের কথা আমাদের জানা ছিল, কাজেই কিছু অবাক হই নি। পরে কখন আমরাও গিয়েছি ভুলে। বহুদিন ও কথা আর হয় নি। বোধ করি বছরখানেক পরে একদিন কি কথায় মনে পড়ে যাওয়াতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, চিত্তরঞ্জনে আপনার সেই ভাইঝির কাছে আপনি গিয়েছিলেন? শুনে তনয়বাবু খুব হাসতে লাগলেন, বললেন, বললে বিশ্বাস করবেন না তো, কিন্তু সত্যি সত্যি গিয়েছিলাম। তবে যাওয়াটা বৃথা হয়েছে, ওদের সঙ্গে দেখা হয় নি। আমার ভাই কদিন আগে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে; কোথায় গিয়েছে তারও হদিস পাওয়া গেল না। কী আর করব, ফিরতি ট্রেনে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। ব'লে আবার এক চোট খুব হাসতে লাগলেন। বুঝলাম, মনের দুঃখটা চাপবার জন্যেই জোর করে ঐ হাসি।

সংসারী মানুষ ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়েই তাঁর ঘর-সংসার। লৌকিক অর্থে সংসার করা তাঁর হয়ে ওঠে নি। বিয়ে করেছিলেন। একটি শিশুকন্যা রেখে পত্নী ইহলোক ত্যাগ করে গিয়েছেন সেই কতকাল আগে। দ্বিতীয়বার আর দার-পরিগ্রহ করেন নি। নিজের দেশ খুলনা জেলার একটি গ্রামের স্কুলে কাজ করছিলেন। পত্নীবিয়োগের পরে মনে বোধ করি একটু অবসাদের ভাব এসেছিল। সেটাকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে এখানে একটি কাজের জন্যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে কাজটি হয়ে গেল। প্রথমটায় একটু বোধ করি দোমনা ছিলেন। ছেলে-

পিলের প্রতি যাঁর স্বভাবগত টান তাঁর পক্ষে গ্রামের সেই ছেলেগুলোর মায়া কাটিয়ে আসা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে তিনি যে নিয়োগপত্রটি পেলেন তা এতই অভিনব যে সেটি পেয়ে তিনি চমৎকৃত। নিয়োগপত্র যে এমন ধারার হতে পারে সে ধারণা তাঁর ছিল না। সে মুহূর্তেই স্থির করে ফেললেন যে কাজ যদি করতেই হয় তো এমন একটি প্রতিষ্ঠানেই করা উচিত। সুরেন্দ্রনাথ কর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি নিজের যে অভিজ্ঞতাটির কথা বলেছি দেখা যাচ্ছে তনয়বাবুরও সে অভিজ্ঞতাই হয়েছিল।

তনয়বাবু আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমহলে সাড়া পড়ে গেল। তার কারণ তিনি ফুটবল খেলতেন খুব ভালো। কাজে যোগ দেবার দু-চার দিনের মধ্যেই বাইরে থেকে একটি ফুটবল টিম এসেছিল। শান্তিনিকেতনের টিম তৈরি হত ছাত্র-মাস্টার মিলে। ইতিমধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল যে নতুন মাস্টারমশায়ের নাকি ফুটবল খেলার অভ্যাস আছে। ছেলেরা এসে বলতেই তনয়বাবু খেলতে রাজি হলেন। ওরা তাতে খুব খুশি। তার উপরে আবার খেলতে নেমে এতই ভালো খেললেন যে ছেলেরা বিস্মিত, চমৎকৃত। ব্যস্, সেদিন থেকেই তনয়দা ছেলেদের চোখে হিরো হয়ে গেলেন। এক সময়ে এখানকার ছাত্র এবং অধ্যাপক গৌরগোপাল ঘোষও ছিলেন ছেলেদের হিরো। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তনয়বাবুকে কখনো-সখনো খেলতে দেখেছি। এমন-কি, তার পরেও কখনো বয়স্কদের নিয়ে একটি টিম খাড়া করে শিশুবিভাগের ছেলেদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতেন। খেলার শেষে সবাইকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়াতেন। ছেলেদের সকল খেলাতেই তিনি ছিলেন সঙ্গী। ছেলেরা মারবেল খেলছে তো তাদের সঙ্গেই জুটে গেলেন; ডাণ্ডাগুলি খেলছে তো তাও একহাত খেলে নিলেন, না-হয় তো তাদের সঙ্গে লাট্টু ঘোরাতে লাগলেন।

ক্লাসের বাইরে ছেলেদের খেলাধুলায় দস্যিপনায় প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ক্লাসের পড়ার বেলায় এতটুকু ফাঁকি দেওয়া চলত না। সেখানে তিনি কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নিতেন। শিক্ষক হিসাবে তনয়েন্দ্রনাথের তুলনা মেলা ভার। ক্লাসে প্রতিটি ছাত্রের মনোযোগকে সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারতেন। পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সকলের মনোযোগকে এমনভাবে নিবিষ্ট রাখতেন এবং চোখের দৃষ্টি প্রত্যেকের উপরে এমনভাবে নিবদ্ধ থাকত যে মুহূর্তের

জন্যও অমনোযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। ছেলেমেয়েরা ভয় করত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর ক্লাসটা যে ঠিক অন্য ক্লাসের মতো নয়, একটু আলাদা ধরনের সেটাও বুঝতে পারত, অর্থাৎ ভয় যেমন ছিল তেমনি মজাও ছিল। ছেলেমেয়েরা বেশ গর্ব করে বলত— আমরা তনয়দার ক্লাসের ছাত্র। ভাবটা যেন, বিশেষ যোগ্যতা না থাকলে তনয়দার ক্লাসে পড়া সম্ভব নয়। তবে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। তনয়বাবু ঢিলেঢালা ভাব পছন্দ করতেন না। কিভাবে বসতে হবে, দাঁড়াতে হবে, বই-খাতাপত্র রাখতে হবে, পরিষ্কার উচ্চারণে কথা বলতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি ছিল।

ছাত্রদের জন্য তনয়বাবু অশেষ শ্রম স্বীকার করতেন। বুদ্ধিতে ক্ষমতায় একের সঙ্গে অপরের তারতম্য থাকে, সেজন্যে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি আলাদা-ভাবে নজর রাখতেন। যে-সব ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় নিস্তেজ, তারা ধমক-ধামক গালমন্দ খেত, কিন্তু স্নেহ থেকে বঞ্চিত হত না। জগদানন্দবাবুর মতো বাইরেটা ছিল রুক্ষ, কিন্তু ভেতরটা আবার তেমনি নরম। ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহটা গদ্গদ ভাষায় মুখে প্রকাশ পেত না, কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় নিত্যপ্রবাহিত ছিল। পুরোনোদের নানা স্মৃতিচিহ্ন হাতের কাছে সযত্নে রেখে দিতেন। বহুদিন পরে কোনো ছেলে বেড়াতে এসে দেখা করতে গেল— চিনতে পারছেন তনয়দা? তনয়দা গম্ভীর মুখে বলতেন, দাঁড়াও দেখি চিনতে পারি কি না! ব'লে দেরাজ খুলে খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে ছেঁড়া-খোঁড়া একটা পাতলা খাতা বের করলেন। খাতাটি সামনে ধরে দিয়ে বললেন— এই দেখো— ভিড্ নট ওয়েন্ট লিখেছিলে — বলেই উচ্চকণ্ঠে হাসি। প্রাক্তন ছাত্রটি হয়তো তখন কোনো খ্যাতনামা সংস্থায় পদস্থ অফিসার। কিন্তু সে মুহূর্তে তনয়বাবুর চোখে সে ক্লাস ফাইভের ছাত্রটি। কৌতুকে হাস্যে স্নেহে শ্রদ্ধায় মিশে ছাত্র-মাস্টারের মুখে অতীতের স্মৃতির অপূর্ব দ্যুতি বিস্তার করত। ছাত্রদের তিনি যতখানি ভালোবেসেছেন, ছাত্ররাও তাঁকে ভালোবেসেছে ততখানি। রুক্ষ আবরণের অন্তরালে তাঁর স্নেহার্দ্র হৃদয়টিকে চিনতে তাদের বিলম্ব হয় নি।

ছোটোদের জগৎটাকে তনয়বাবু খুব ভালো করে চিনে নিয়েছিলেন। কিসে তাদের ভালো হবে, কিসে আনন্দ পাবে তাই নিয়ে সারাক্ষণ মাথা

ঘামাতেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাহিত্যসভা হয়। ছেলেমেয়েরা তাদের খুশিমত যে-কোনো বিষয়ে লিখে আনে, মাস্টারমশায়দের একবার দেখিয়ে নেয়, তার পরে সভায় পড়ে শোনায়। বহুকাল থেকে এ রীতি চলে আসছে। একবার তনয়বাবু এদের কিছু লেখা বেছে নিয়ে একটি বই করে নিজের খরচে তা ছাপিয়ে দিলেন। বইটির নাম দিয়েছিলেন— 'আমাদের লেখা'। নিজেদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে ছেলেমেয়েদের সে কী আনন্দ! জিনিসটা কর্তৃপক্ষেরও মনে ধরল, স্থির হল এখন থেকে পাঠ-ভবনের উদ্যোগেই ছেলেমেয়েদের লেখার এবং তাদের আঁকা ছবির একটি সংকলন প্রতি বৎসর পত্রিকাকারে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে। সেই থেকে প্রতি বৎসর নববর্ষ উৎসবের দিনে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। তনয়বাবুর দেওয়া 'আমাদের লেখা' নামটিকেই বহাল রাখা হয়েছে। এই অভিনব পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে তনয়বাবুরই কীর্তি। শান্তিনিকেতনের জীবনে এর মস্ত বড়ো একটা স্থান আছে।

এমন সর্বান্তঃকরণে শিক্ষক, এমন কায়মনোবাক্যে শিক্ষক জীবনে কমই দেখেছি। দেবধর্মের কথা কোনো কালে তাঁর মুখে শুনি নি, শিক্ষাদানকেই ধর্ম-কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি যথার্থই অনন্য-সাধারণ। আজীবন শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র পরীক্ষা পাসের জন্যে ছাত্র তৈরি করেন নি। যে বিদ্যা 'মেধয়া' কিংবা 'বহুনা শ্রুতেন' লভ্য সেই বিদ্যার কারবার তিনি করেন নি। যে জীবন্ত বিদ্যা প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর করে, সমৃদ্ধ করে— মনসা কর্মণা বাচা— সেই বিদ্যারই চর্চা করেছেন তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। এক কথায় শান্তিনিকেতন শিক্ষার মূল কথাটি তিনি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। এমন সদাজাগ্রত, সজীব মন সচরাচর দেখা যায় না। চৌষট্টি বৎসর বয়সেও উৎসাহে উদ্দীপনায় জীবনচাঞ্চল্যে চব্বিশ বৎসরের যুবককে হার মানাতে পারতেন। শিখবার জানবার কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা! বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কে কোথায় কী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার আধুনিকতম খবর তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মাইনের মোটা অংশ বই কেনাতেই ব্যয় হত।

শান্তিনিকেতনের সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ, এখানে দুটি-চারটি অতিমাত্রায় 'ছিটগ্রস্ত' মানুষ সব সময়েই দেখা গিয়েছে। তাঁরাই এ স্থানকে বিশেষ একটি

চরিত্র দিয়েছেন। ‘ছিটগ্রস্ত’ ব্যক্তি বলতে বুঝি— বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। এঁরা বাঁধা রাস্তায় চলেন না, বাঁধা গৎ আওড়ান না, এঁরা আর-পাঁচজনের মতো নন, একেবারে পঞ্চম। লোকে এঁদের ভালো করে বুঝতে পারে না ব'লেই বলে এঁদের মাথায় ছিট আছে। আমি তো অনেক সময় বলে থাকি যাঁর মাথায় ছিট নেই তাঁর মাথায় কিছুই নেই। তনয়বাবুর সর্বোত্তম গুণ— অতি ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, এমন মানুষের সঙ্গে প্রতি পদে মতান্তর ঘটবার আশঙ্কা থাকে। তনয়বাবুর সঙ্গে তর্ক না হয়েছে, ঝগড়া না হয়েছে এমন মানুষ শান্তিনিকেতনে কমই আছেন। হয়তো বা ক্ষণকালীন মনোমালিন্যও ঘটেছে কিন্তু কোথাও এতটুকু মলিনতা স্পর্শ করে নি।

তনয়বাবুর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁর ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেও প্রকাশ পেত। তর্ক করতেন, ঝগড়া করতেন, পরক্ষণেই আবার ভুলে যেতেন। এ যেন শরৎকালের মেঘ— এই বৃষ্টি এই রোদ। সকালবেলায় যাকে কটুভাষণে জর্জরিত করেছেন বিকালবেলায় মিষ্টান্নের পাত্র হাতে তারই দোরে হাজির, কেননা কটু কথা ব'লে সারাদিন নিজের মনেই অশান্তি ভোগ করেছেন। সকালবেলায় যে মেঘটুকু জমেছিল বিকালবেলায় তা নির্মল হাস্যে উড়িয়ে দিয়েছেন। যে ছেলেকে এই একটু আগে প্রচণ্ড গালি দিয়েছেন, অনতিকাল পরে তাকেই বসিয়ে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। জগদানন্দবাবুর মার খাওয়ার মতো তনয়বাবুর গাল খাওয়াটা ছেলেদের পক্ষে লোভনীয় ছিল। বাইরেটা এমন রুক্ষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে এমন স্নেহার্দ্র হৃদয় খুব কমই দেখেছি।

আমি নিজে শিক্ষক এবং শিক্ষকের সন্তান। শিক্ষকের মর্ম আমি অল্প-বিস্তর বুঝি। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আমার পিতার খ্যাতি এককালে বহু-বিস্তৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুকাল পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সাধ্যমত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। দেশের দূর প্রান্তে আমার পিতার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবির প্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার পিতার মধ্যে আমি শিক্ষকচরিত্রের যে মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি প্রথম পরিচয়ে ঠিক সেই চরিত্র-মহিমা তনয়বাবুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। তনয়বাবুর সঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছি, গল্প করেছি— কিন্তু একদিক থেকে তিনি যে আমার গুরুস্থানীয় সেই কথাটি কোনোদিন তাঁকে

বলা হয় নি। আগেই বলেছি তনয়বাবু ছিটগ্রস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি আজ সশরীরে উপস্থিত নেই বলেই এমন নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুটো প্রশংসার বাক্য উচ্চারণ করতে পারলাম। জীবদ্দশায় হলে বাকি জীবন আর আমার মুখদর্শন করতেন না; কারণ নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভালোবাসতেন না। কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে তেড়ে মারতে আসতেন।

মানুষকে ভালোবাসা যায়, শ্রদ্ধাভক্তি করা যায়, কিন্তু সত্যিকারের আপনার জন বলব তাঁকেই যাঁর সঙ্গে অনায়াসে ঝগড়া করা যায়। তনয়বাবু যখন চলে গেলেন তখন এই ভেবে আমার দুঃখ হয়েছিল যে যাঁর সঙ্গে পদে পদে মতান্তর ঘটতে পারত সে মানুষটি চলে গেলেন। শান্তিনিকেতন জীবনের ধার যেন খানিকটা কমে গেল। ঝাল নুনের অভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সেই স্বাদগন্ধ, সেই তারটুকু আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? কিছুদিন থেকেই শান্তিনিকেতনের উজ্জ্বল উচ্ছল মূর্তি কেমন যেন একটু মলিন এবং ম্রিয়মাণ হয়ে আসছিল। এখানে এসে যাঁদের কর্মরত দেখেছিলাম তাঁরা একে একে অবসর গ্রহণ করেছেন। হরিচরণবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দলালবাবু অবসর গ্রহণের পরেও তাঁদের নিজ নিজ স্থানটিতে নিত্য এসে বসতেন। হরিচরণবাবু পরলোকগত; লাইব্রেরি-গৃহের যে কক্ষটিতে বসে তিনি অভিধান প্রণয়নের কাজ করতেন, সেটি এখন শূন্য। ক্ষিতিমোহনবাবু এবং মাস্টারমশাই তখনো ছিলেন কিন্তু দুজনেই অশক্ত দেহে গৃহবন্দী। শান্তিনিকেতনের পথে চলতে গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন মুখের হাসিটুকু আর দেখতে পাই না। মল্লিকজি, কৃপালনীজি প্রভৃতি আরো দু-চারজন যাঁরা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা চলে গিয়েছেন স্থানান্তরে। এদিকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই তনয়বাবু চলে গেলেন লোকান্তরে। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব মনে হতে লাগল।

শেষ দিনের কথাটি আজও মনে আছে। আশ্রমবাসী অন্যান্যের সঙ্গে আমিও তনয়বাবুর শবানুগমন করেছিলাম এবং শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলাম। শ্মশানে এলেই মানুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিনা জানি না। আমি স্বভাবত সংসারবিরাগী মানুষ নই। তথাপি চৈত্রের দুঃসহ রৌদ্রতাপে খোয়াই-এর দগ্ধ মৃত্তিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন জানি না রবীন্দ্রনাথের

'খোয়াই' কবিতাটি আমার মনে পড়ে গেল। সেই যেখানে বলেছেন:
এইখানে বসেছি একটা কাজকে রূপ দিতে। সেই কতকাল আগে যাঁরা
তাঁর কাজে হাত মিলিয়েছিলেন, যাঁদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছিলেন,

"যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল দিনে আর আমার বাদল গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথ রাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—
তার পরে?"

সেই তার পরের যে জবাবটি কবি দিয়েছেন সে বড়ো মর্মান্তিক—

"তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ওই বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু,
রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।"

শুধু এই থাকবে? কই, মাঝখানে ঐ যেখানটাতে একটা কাজকে রূপ দিতে বসেছিলেন তার কথা তো কিছুই বললেন না? সে' কি থাকবে না, সে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি। সারা জীবন আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। বোধ করি কোনো হতাশ মুহূর্তে তাঁর মনে নৈরাশ্যের সুর বেজেছিল, তাই এমন মর্মান্তিক কথা উচ্চারণ করেছিলেন। মুহূর্তের দুর্বলতায় আমার দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। কারণ এ হতেই পারে না। কবির সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। আর ঐ যাঁরা

হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে, তাঁদের নিষ্ঠাও বৃথা যাবে না।

এঁদের দেহভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির ন্যায় নবতর রূপ নিয়ে শান্তিনিকেতনের জন্ম হবে, বহুবিধ সাময়িক বিঘ্ন অতিক্রম করে শান্তিনিকেতনের প্রতিভা আবার একদিন উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রকাশিত হবে।

প্রতিমা দেবী

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হিসাবে রথীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা আর রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হিসাবে প্রতিমা দেবী ছিলেন ঐ কাজে তাঁর সুযোগ্যা সহযোগিনী। শান্তিনিকেতন বলতে তখন লোকে জানত একটি বৃহৎ আশ্রম-পরিবার। ছাত্র-শিক্ষক মিলে একটি পরিবার হিসাবেই আশ্রম বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। নারীর কল্যাণহস্তের স্পর্শ না পেলে কোনো পরিবার বা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। বিদ্যালয়ের জন্মকালে আশ্রম-পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। আপন ছেলে রথীন্দ্রনাথও থাকতেন ছেলেদের সঙ্গে ছাত্রাবাসে। সব-ক'টি ছেলেকেই তিনি আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন, সাধ্যমত তাদের আদরযত্ন করেছেন। ছুটি-ছাটার দিনে নিজের হাতে খাবারদাবার করে সকলকে একসঙ্গে ডেকে খাওয়াতেন। ছেলেকে একলা ডেকে কখনো খাওয়ান নি। মৃণালিনী দেবী চলে যাবার পরে অভিভাবিকার কাজটি নিয়েছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী হেমলতা দেবী; তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলা দেবী। প্রতিমা দেবী যখন এলেন তখন আশ্রম-পরিবার অনেক বিস্তার লাভ করেছে, সেইসঙ্গে দায়িত্বভারও বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন, দেশ-বিদেশ থেকে খ্যাতনামা অতিথিরা আসছেন। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন একটা মস্ত বড়ো কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কাজটি প্রধানত প্রতিমা দেবীকেই সামলাতে হত। শিল্পী-পরিবারে লালিতা প্রতিমা দেবী ছিলেন শিল্পীসুলভ শোভন রুচির মানুষ। তাঁর অতিথি পরিচর্যাও ছিল একটি শিল্পকর্মের ন্যায় শোভন সুন্দর। অসামান্যা রূপসী, দেখতে যেমন মনোহরা, আলাপে ব্যবহারে তেমনি মনোরমা। বিদেশী অতিথিদের মুখে প্রায়ই শোনা যেত— What a gracious woman !

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে প্রতিমা দেবীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন-এর পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর বাড়ি মিলিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবার। পাঁচ নম্বর বাড়ির দৌহিত্রী হিসাবে প্রতিমা দেবী সে বাড়িতেই লালিতা, বর্ধিতা। পাঁচ নম্বরের বালিকা একদিন এলেন ছয় নম্বরের বধূ হয়ে। অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ—

সম্পর্ক-গৌরবে জোড়াসাঁকো পরিবারের মহিমময়ীদের মধ্যেও গরিমায় মহিমায় অতুলনীয়া বলতে হবে। এ ছাড়া রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন বিবাহ হল তখন প্রতিমা দেবী হলেন ঠাকুর-পরিবারে অপর এক ইতিহাসের নায়িকা। প্রতিমা দেবী ছিলেন বালবিধবা। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন— জোড়াসাঁকো পরিবারে সেই প্রথম বিধবা বিবাহ। অর্থাৎ ঐ পরিবারের পক্ষে সেদিন এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের উৎসাহে, রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো গৃহে বিচিত্রা ক্লাব স্থাপিত হল। ক্লাবের অনুষঙ্গ হিসাবে একটি গৃহ-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। নববধূ প্রতিমা হলেন সে বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। সেখানে পাঠচর্চার সঙ্গে নানাবিধ কলাচর্চার ব্যবস্থা ছিল। সে বিদ্যালয়ে তখনকার তরুণ শিল্পী নন্দলালের কাছে তিনি চিত্রবিদ্যার প্রথম পাঠ নিয়েছেন। রস যে পেয়েছিলেন তার প্রমাণ চিত্রকলার চর্চা তিনি পরেও ত্যাগ করেন নি, শান্তিনিকেতনে এসেও আচার্যের কাছে শিক্ষানবীশিও করেছেন। অবসর-বিনোদন হিসাবে ছবি আঁকার অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর আঁকা ছবির একটি অ্যালবাম শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় সেটি তিনি দেখে যান নি। মানুষটি যেমন সুন্দর, মনটি ছিল তেমনি সৌন্দর্যপিপাসু। সেজন্যে চারুকলা এবং কারুকলার প্রতি ছিল স্বাভাবিক আগ্রহ। নানাবিধ কারুকলায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে যখন প্রধানত রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শ্রীনিকেতনে শিল্পসদনের প্রতিষ্ঠা হয় তখন পরম উৎসাহে স্বামীর কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন— কখনো রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে, কখনো স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে। যখন যেখানে গিয়েছেন সেখান থেকেই নতুন কোনো কারুকলা শিখে এসেছেন এবং সম্ভব হলে শিল্পসদনের শিক্ষাসূচীতে তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্গদেশে— শুধু বঙ্গদেশ কেন, সারা ভারতেই কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনে এবং প্রচলনে শ্রীনিকেতনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু এরই মধ্যে লোকে ভুলতে বসেছে যে সে ভূমিকার প্রধান অংশীদার রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী।

শান্তিনিকেতনের অভিনয় এবং নৃত্যানুষ্ঠানাদিতে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল প্রচুর। মঞ্চসজ্জা এবং পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা ইত্যাদির দায়িত্ব থাকত

প্রধানত নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ করের উপর ন্যস্ত; তা হলেও এ-সব বিষয়ে প্রতিমা দেবীর মতামত তাঁরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। এ ছাড়া রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য-সংযোজন এবং নৃত্য-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। নৃত্য-প্রযোজনায় তাঁর শোভন রুচি এবং পরিমিতি-বোধ রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা অর্জন করেছে। নৃত্য সম্বন্ধে একখানা সুলিখিত গ্রন্থও রচনা করেছেন। লেখার হাত ছিল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লিখিত 'নির্বাণ' গ্রন্থখানি একাধারে 'বাবামশায়' এবং 'গুরুদেবের' প্রতি তাঁর সর্বান্তঃকরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

রথীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল প্রখর। নিত্যব্যবহার্য ক্ষুদ্রতম জিনিসটিতেও শোভনতম রুচির ছাপ থাকত। এঁদের দুজনের ঘর-সংসার যে দেখবার মতো ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। উত্তরায়ণের উদ্যান রথীন্দ্রনাথেরই রচনা কিন্তু সেই রুচি-রোচন রচনায় প্রতিমা দেবীর কোনো হাত ছিল না, এমন কথা কেউ বলবে না। স্বামীর সব কাজেই তিনি হাত মিলিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে আর-একটি বিষয়েও তাঁর খুব মিল ছিল। রথীন্দ্রনাথ যেমন সকল কাজের কাজী হয়েও থাকতেন সকলের পেছনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রতিমা দেবীও ছিলেন তেমনি নেপথ্যচারিণী। শান্তিনিকেতন জীবনের কেন্দ্রস্থলে থেকেও নিজেকে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্নই রেখেছেন। স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, দৌড়-ঝাঁপ ছুটাছুটি করে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মৃদুকণ্ঠে ইচ্ছাটি বিজ্ঞাপিত করতেন, তাতেই কাজ হত কারণ সকলেই তাঁকে মান্য করে চলতেন। আশ্রম-বাসী সকলের তিনি বৌঠান। আশ্রমের সঙ্গে ঐ ঘরোয়া সম্পর্কটির মর্যাদা তিনি আজীবন রক্ষা করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁর শুচি-শুভ্র, শোভন সুন্দর জীবনটিই ছিল শান্তিনিকেতন জীবনে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

গৃহকর্মের মধ্যে সব চাইতে বড়ো কাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনা করা, তাঁর সুখ-সুবিধার কথা ভাবা। রবীন্দ্রনাথ যতদিন শারীরিক দিক থেকে সক্ষম ছিলেন ততদিন তিনি কারো সেবা চান নি, চেয়েছেন সঙ্গ। ঐ সঙ্গটাই একটা মস্ত বড়ো কথা, মস্ত বড়ো শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের কাছে কাছে থাকাটাও ছিল সৌন্দর্যচর্চারই অঙ্গ। প্রতিমা দেবী নিজেই বলেছেন—বাবামশায় চাইতেন মেয়েরা কাজেকর্মে সাজে-পোশাকে পরিচ্ছন্ন হবে, সুন্দর হবে। লাবণ্যের চর্চা হবে নিত্যদিনের জীবনে একটা প্রধান কাজ।

শান্তিনিকেতনের এক যুগ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীর্ঘদিন গৃহসুখ ভোগের সুযোগ হয় নি। পত্নীকে হারিয়েছেন চল্লিশ বৎসর বয়সে। শিশু পুত্রকন্যাদের নিয়ে নিজের গৃহস্থালি নিজেই দেখেছেন। দীর্ঘ দিন পরে যেদিন পুত্রবধূ এলেন সেদিন আঁধার ঘরে আলো জ্বলল। বৌমাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন— তুমি আমার ঘরে তোমার নির্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ— আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুলবে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠছে।

কল্যাণীর আগমনে শূন্য ঘর যথার্থই ভরে উঠেছিল। ঘর বলতে শুধু আপন ঘর-সংসার নয়। সমগ্র শান্তিনিকেতন সংসার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সুবৃহৎ সংসার। সে সংসারের অন্দরমহল সামলাতে হয়েছে প্রতিমা দেবীকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজনদের নিত্য আনাগোনা। মধুরহাসিনী মধুরভাষিণী প্রতিমা দেবীর স্নেহ-মমতায় অতিথিপরায়ণতায় সকলে অভিভূত। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়কার্যসাধনকেই তিনি তাঁর প্রকৃত সেবা বলে মনে করতেন। প্রতিদানে রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছেন তাঁর অপরিমেয় স্নেহ। বহু চিঠিপত্রে সে স্নেহ অজস্রধারে বর্ষিত হয়েছে। 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ডের সমস্ত চিঠিই প্রতিমা দেবীকে লেখা। 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থটিও প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত।

কিন্তু সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়। ঘর আবার শূন্য হল। একে একে সকলেই গেলেন চলে। প্রতিমা দেবী উত্তরায়ণের এক কোণে একলা ঘরে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালিয়ে বসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অতি স্নেহের মা-মণি, আশ্রমবাসীর অতি প্রিয় বৌঠানকে শেষ দিকে দেখেছি একান্ত নিঃসঙ্গ নিঃসহায়। একদা জীবনের যে মহোৎসব তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তার আলোকমালা নির্বাপিত, তিনি তার স্মৃতিভারে বিড়ম্বিত। শান্তিনিকেতন তাঁকে চেনে না, তিনিও এই শান্তিনিকেতনকে চেনেন না। দেখলে মনে হত প্রতিমা দেবী নিজ বাসভূমে পরবাসী। সেই প্রতিমা দেবী যেদিন নিঃশব্দে চলে গেলেন সেদিন আজকের শান্তিনিকেতনবাসী অনেকেই জানেন নি যে তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এক যুগের ইতিহাস সাঙ্গ হল।

—

স্বীকৃতি

আলোকচিত্র ॥ প্রচ্ছদ : Raymond Burnier

'একযুগের শান্তিনিকেতন' 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গৃহ' : মহিমচন্দ্র ঠাকুর

'ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ' : পিনাকীন ত্রিবেদী

প্রচ্ছদলিপি ॥ জগদিন্দ্র ভৌমিক

শান্তিনিকেতনের এক যুগ • হীরেন্দ্রনাথ দত্ত